কোঙ্কণ পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA

Konkan Parva

(A Bengali Travelogue)

By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার,

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩০৯

প্রচ্ছদপট : সুভাষ সিংহ রায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :

শ্রীমন্মথনাথ পান

নবীন সরস্বতী প্রেস

১৭, ভীম ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

সোমনাথ থেকে আমরা আমেদাবাদে ফিরলুম সোমনাথ মেলে। ভোর-ছটায় এসে নামলুম আমেদাবাদে। ভেবেছিলুম যে এ যাত্রায় আমার ছুটি মিলবে এইখানেই। জনতা এক্সপ্রেস মিনিট কয়েক আগে ছেড়ে গেছে, দিল্লী মেল ছাড়বে ঘণ্টা দেড়েক পরে। আশা করেছিলুম যে এই ট্রেন ধরেই ফিরতে পারব। কিন্তু তা হল না। মামা আমার প্রস্তাব শুনেই বিরূপ হলেন, বললেন: সে কি, এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই স্বাতি কৌতুকের হাসি হাসল। আর মামা বললেন: কোথায় উঠবে, সেইখানে নিয়ে চল। তারপরে ফেরার কথা ভাবা যাবে।

কুলিরা ততক্ষণে আমাদের মালপত্র নামিয়ে ফেলেছিল। কাজেই তর্ক করবার অবসর ছিল না। বললুম: রিটায়ারিং রুমেই যাওয়া যাক। পাওয়া যাবে তো?

বলে কুলিদের দিকে আমি তাকালুম।

অবজ্ঞা ভরে একজন বলল: অনেক রিটায়ারিং রুম এখানে।

কিন্তু ওভার-ব্রিজ পার হয়ে যেতে হবে শুনে মামা বললেন: ভাল কথা নয় গোপাল, আগে তুমি জেনে এস ব্যাপারটা।

তবে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে একজন কুলি এগিয়ে এল আমাকে সাহায্য করতে। রিটায়ারিং রুমে না গিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাহিরে এনকোয়ারি অফিসে আমাকে নিয়ে এল। বলল: জিজ্ঞাসা করুন এইখানে।

ভদ্রলোক টেলিফোনে খবর নিয়ে বললেন: পাওয়া যাবে।

একখানা, না দুখানা?

দুখানাই পাওয়া যাবে।

বললুম : তাহলে অনুগ্রহ করে বলুন যে আমরা আসছি।

ফিরে গিয়ে মামাকে এই সংবাদ দিতেই তিনি বললেন : তবে তুমি ফিরে যেতে চাইছ কেন?

এর সঙ্গে আমার ফেরার প্রস্তাবের কী সম্বন্ধ আছে বুঝতে না পেরে আমি মামীর দিকে তাকালুম। তিনি বললেন : তুমি না থাকলে তোমার মামা কি আর এ সব ব্যবস্থা করতে পারতেন?

অন্য সময় হলে মামা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন। তিনি পারেন না, এমন কোন কাজ জগতে আছে বলে তিনি মানতে রাজী নন। কিন্তু স্বাতি সকৌতুকে বলে উঠল : গোপালদা সঙ্গে না থাকলে আমরা সবাই জলে পড়ে যাব।

কুলিরা মালপত্র মাথায় তুলছিল। তার পরিহাসে কর্ণপাত না করে আমি কুলিদের বললুম : চল।

ওভার ব্রিজের দিকে তারা অগ্রসর হল। আমরা অনুসরণ করলুম তাদের।

ওভার-ব্রিজ পার হবার সময়েই এই আমেদাবাদ স্টেশন সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে গেল। যে দিকটায় আমরা নেমেছিলুম, সে দিকটা পুরনো স্টেশন। মিটার গেজ লাইনের ট্রেন যাতায়াত করে এই ধার থেকে। দিল্লী রাজস্থান থেকে ট্রেন আসে, আসে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র থেকে। আবার ঐ দিকের ট্রেনও ছাড়ে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে।

ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে স্টেশনের অপর প্রান্তে নামলে বড় লাইনের প্ল্যাটফর্ম। ট্রেন আসে বম্বে থেকে, যায় ভিরমগমের দিকে। সম্প্রতি গান্ধীধাম থেকেও বড় লাইনের গাড়ি আসছে ভিরমগমের উপর দিয়ে। তার নাম সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস। রাত আটটায় ছেড়ে ভোর বেলায় এসে পৌঁছয় আমেদাবাদে। ওধারেই আমেদাবাদের নতুন স্টেশন। বিরাট ব্যাপার। ওয়েটিং হলে

কয়েক হাজার যাত্রী থাকতে পারে। বইএর দোকান, চা-কফির দোকান। একটি টুরিস্ট অফিসও আছে, তার দরজা বন্ধ। দোতলায় রিফ্রেসমেণ্ট রুম এক ধারে, অন্য ধারে রিটায়ারিং রুম। আমরা যে তেতলায় ঘর পেয়েছিলুম, তা জানলুম অফিস-ঘরে খোঁজ নেবার পরে।

উপরে যাতায়াতের জন্যে লিফ্‌ট্ ছিল, কিন্তু লিফ্‌ট্‌ম্যান ছিল উপরে। নিচের দরজা বন্ধ। কুলিরা কিন্তু নিচে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়ে বলল: আমরা ওপরে যাচ্ছি। লিফ্‌ট্‌ম্যান বোধহয় ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেব।

মামী পিছন ফিরে তাঁদের চাকর রামখেলাওনকে দেখতে পেলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন: ওরা আবার উধাও হয়ে না যায়।

আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলুম।

সিঁড়ির পাশেই রিটায়ারিং রুমের অফিস-ঘর। কোন মহিলা মেট্রন নয়, একজন পুরুষ বসে আছে। তার কাছেই টেলিফোন। জিজ্ঞাসা করল: আপনিই দুখানা ডবল বেড ঘর চেয়েছেন?

বললুম: হ্যাঁ।

ওপর তলায়।

বলে দুটো চাবি দিল একজন বেয়ারার হাতে। কুলিরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, আবার উঠতে লাগল।

নাম ঠিকানা ও টিকিট নম্বর ভরবার জন্যে খাতাটি যখন আমার দিকে এগিয়ে দিল, তখন আমি একটু মুশকিলে পড়লুম। এই কাজ করতে বসি, না কুলিদের সঙ্গে উপরে যাই। একটি মাত্র মুহূর্ত, তারপরেই স্বাতির কণ্ঠস্বর শুনলুম: আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি গোপালদা, তুমি এ দিকটা সামলাও।

সেও যে আমার পেছনে উঠে এসেছিল, আমি তা দেখতে পাই

নি। পিছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়ে শুধু নিশ্চিন্ত নয়, পুলকিত হলুম। স্বাতি হেসে বলল: লিফ্‌ট্‌ম্যানকেও জাগিয়ে দিয়েছি, সে নেমে গেছে। টিকিটের নম্বর লাগবে তো?

বললুম: হ্যাঁ।

বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দেব।

বলে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মামার কাছ থেকে টিকিট আর টাকা নিয়ে সে নিজেই নেমে এসেছিল। বলল: রিটায়ারিং রুম পাওয়া গেছে বলে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে তো চলবে না, শহরে কী দেখতে হবে তার খোঁজ-খবর নেবার কথা ভেবেছ?

আমি হেসে বললুম: সেই জন্যেই বুঝি নেমে এলে!

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল: রিটায়ারিং রুম মার খুব পছন্দ হয়েছে। আর বাবা বলছেন, এতদিন পরে গোপাল একটা ভাল জায়গায় তুলেছে।

স্টেশনের টুরিস্ট অফিসের খবর আমরা এইখানেই পেয়ে গেলুম। শুনলুম যে অফিস খুলতে এখনও দেরি আছে। শহর দেখবার ইচ্ছা থাকলে আমাদের লাল দরোয়াজায় যেতে হবে। স্টেশনের বাহিরেই পাওয়া যাবে ট্যাক্সি আর অটো রিক্সা।

শহর দেখবার ব্যবস্থার কথাও আমি জেনে নিলুম। সরকারী বাস ছাড়ে লাল দরোয়াজা থেকে। ডি লাক্স বাস। সকালে একবার, আর একবার বিকালে। অ্যাড্‌ভান্স টিকিট কাটবার ব্যবস্থা আছে। বাস ছাড়ে আটটায়, কিন্তু সাতটায় পৌঁছতে পারলে টিকিট পাবার আশা আছে। সমস্ত শহর দেখতে সময় লাগে ঘণ্টা চারেক।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: শবরমতী আশ্রমও কি দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর পেলুম: নিশ্চয়ই। মোটামুটি সবই দেখায় তারা।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারলে এ বেলাতেই সব দেখে নিতে পারবেন।

তাহলে আর দেরি কোরো না গোপালদা, চলে এস।

বলে স্বাতি আমাকে টেনেই আনল।

আমি বললুম: কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করলে মামা অসন্তুষ্ট হবেন।

হবেন না। এসো না তুমি।

বলে স্বাতি আমাকে অন্য ধারের রিফ্রেসমেণ্ট রুমে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ দেখে দমে গেল খানিকটা। বলল: কেন যে এমন দেরি করে এরা, তা বুঝি না।

বললুম: সরকারী ব্যবস্থা বলেই দেরি। নিচের চায়ের দোকানে দেখ, কেমন ভিড় সেখানে।

বলে উপর থেকে আমি নিচের দৃশ্য দেখালুম।

ঠিক এই সময়ে একটি বেয়ারাকে বাহিরে বেরোতে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম: চা পাওয়া যাবে?

বেয়ারাটি বলল: অল্প দেরি আছে।

স্বাতি বলল: আমাদেরও দেরি আছে।

বলে ঘরে পৌঁছে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। তারপর আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম।

প্রসন্ন মনে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। আমাদের ফিরতে দেখে বললেন: বুঝলে গোপাল, অনেকদিন পরে একটা ভদ্র জায়গায় তুলেছ।

স্বাতি বলল: পয়সাও নিয়েছে যথেষ্ট। একটি ঘরের ভাড়া আঠারো টাকা।

কিন্তু মামা তার জন্য চিন্তিত নন। বললেন: টাকার কি এখন আর কোন মূল্য আছে! তার বদলে যতটুকু পেলে ততটুকুই লাভ।

মামী ঘরে ছিলেন না, বোধহয় স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন।

তাই দেখে স্বাতি বলল : এখন আমাদের তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে বাবা, ডি লাক্স বাসে চেপে আমরা শহর দেখব।

এ প্রস্তাবে মামা খুশী হলেন বলে মনে হল না। বললেন : এ কি গোপালের ব্যবস্থা নাকি ?

বললুম : না। এ ব্যবস্থা স্বাতির।

তোমার মত কী ?

নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে গেলুম। আমি ভেবেছিলুম যে খেয়েদেয়ে দুপুরে বেরোলে এমন তাড়াহুড়ো করতে হবে না। কিন্তু দুপুরে ঘুমোবার ব্যবস্থা যে মামার বেশি পছন্দ হবে তা মনে ছিল না। আমাকে ইতস্তত করতে দেখেই স্বাতি বলে উঠল : গোপালদা বোধহয় বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে।

তাই নাকি !

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে বললেন : বাড়ি তো ফিরবেই, বাড়ি ফেরার জন্যে এমন তাড়া কেন !

এ যাত্রায় বেরোনোর গল্প আমার মনে পড়ে গেল। আমি কলকাতায় ছিলুম, আর মামারা ছিলেন দিল্লীতে। হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম পেলুম জয়পুর থেকে, পরিবারের বিপদ, শিগগির এস। টেলিগ্রাম করেছিলেন মামা। নিজের মামা নন, পাতানো মামা। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়ে এমন স্নেহ পেয়েছি যে পাতানো সম্বন্ধ আর ভাবতে পারি নি। উদ্বিগ্ন হয়ে যাত্রা করেছিলুম। সোজা এসে নেমেছিলুম জয়পুরে। স্বাতি আমাকে স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার পরে দেখেছিলুম যে কোন বিপদই নয়, তাঁদের একজন সঙ্গীর দরকার। দরকারটা মামার, মামীর কোন আগ্রহ ছিল না। কিছু আপত্তিও ছিল। কিন্তু মামার প্রয়োজনের কাছে সে আপত্তি টেঁকে নি।

সেই থেকে আমি সঙ্গে আছি। এক সঙ্গে রাজস্থান দেখলুম,

দেখলুম সৌরাষ্ট্র। তাঁরা বম্বে হয়ে ফিরবেন। বম্বে আমিও দেখি নি, কিন্তু বম্বে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। পাছে জো রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়েই আমি বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলুম।

জনার্দন রায়ের নাম জো রায়। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার পথে। মামীর পছন্দ হয়েছিল তাঁকে। স্বাতির সঙ্গে নাকি ভাল মানাবে। জো রায় বম্বেতে থাকেন, নিমন্ত্রণ করেছেন সবাইকে। বোম্বাই শহর দেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি, তাই আমার আর প্রয়োজন হবে না। আমেদাবাদ থেকেই আমি ফিরতে পারি ভেবেই এই প্রস্তাব করেছিলুম। কিন্তু মামাকে এ সব কথা বলতে পারলুম না। তিনি হয়তো ভুল বুঝতে পারেন। স্বাতি কী ভাববে তা জানি না। শুধু মামী খুশী হবেন। তাঁর কথা ভেবেই আমি ফিরে যেতে চেয়েছিলুম।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে মামা বললেন: জবাব দিচ্ছ না যে।

উপায় না দেখে আমি বললুম: এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছি, চাকরিটা যাবে বলে ভয় পাচ্ছি।

ও চাকরি গেলেই বাঁচি।

বলে মামা আবার পাইপের ধোঁয়া মুখে নিলেন। আর স্বাতি কটাক্ষে তাকাল আমার মুখের দিকে।

বললুম: চাকরিটা সামান্যই বটে, কিন্তু একটা গেলে আর একটা জোটানো যাবে না।

মামা বোধহয় আমার সামান্য চাকরির কথা ভেবে এ মন্তব্য করেন নি। তাই কতকটা লজ্জিত ভাবে বললেন: যথেষ্ট জুটবে। ওর চেয়ে ভাল কাজ করার যোগ্যতা তোমার আছে।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল: গোপালদা তাহলে যাচ্ছে না তো বাবা! স্নানটা আমি চট্ করে সেরে আসি। চা আসছে। এখন একটু তাড়াহুড়ো করলে দুপুরে আরাম করা যাবে।

তবে দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও না।

বলে মামা আমাকেই তাড়া দিলেন। আমি কোন কথা না বলে নিজের ব্যাগটি হাতে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলুম।

ঘরগুলি সত্যিই ভাল। পাশাপাশি দুখানি খাট। ডানলোপিলোর গদি ও বালিশ। পরিপাটি বিছানা। অত্যন্ত আধুনিক আসবাবপত্র। বাথ-রুমও ঝকঝকে। স্টেশন যে নতুন তৈরি হয়েছে, তা প্রতি পদক্ষেপেই বোঝা যাচ্ছে।

স্নান সেরে আমি যখন চুল আঁচড়াচ্ছিলুম, তখন স্বাতির গলা শুনলুম বাহিরে: তাড়াতাড়ি এস গোপালদা, চা এসে গেছে।

চা খাবার পরে মামা আর পাইপ ধরালেন না, স্বাতিও দেরি করল না। সাতটার পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলুম লাল দরোয়াজায়। এইখানে আমরা টুরিস্ট বাস পাব শহর দেখবার জন্যে।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আমি আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলুম। লাল দরোয়াজা নামের কোন বড় জায়গায় নামিয়ে দিলে চলবে না। যেখান থেকে টুরিস্ট বাস ছাড়ে, সেইখানেই নামাতে হবে। ঠিক জায়গাতেই সে আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল। পথের ধারে বাস স্ট্যাণ্ড, ফুটপাথের উপর সারি সারি ঘর। তারই একটি ঘরে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে বাস ছাড়বে আটটার সময়, কিন্তু জায়গা দুজনের আছে।

স্বাতি আমার পিছনে ছিল, এগিয়ে এসে বলল: দুজনের জায়গা পেলে তো চলবে না, আমরা চারজন।

ভদ্রলোক আমাকে কী উত্তর দিতেন জানি না, স্বাতিকে সমীহ করে বললেন: তবে আপনারা ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন। কোন ক্যান্সেলেসন হলে দিয়ে দেব।

ব্যাপারটা অনিশ্চিত। কিন্তু স্বাতি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল: বেশিক্ষণ অপেক্ষা তো করতে হবে না, দেখাই যাক।

বলে বেরিয়ে এসে মামা মামীকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে চলে এল। পাশেই একটি ঘর ওয়েটিং রুম। কিছু চেয়ার টেবিল আছে, সাজানো মন্দ নয়। এই ঘরটি বোধহয় টুরিস্ট বাসের যাত্রীদের জন্যই। সময় মতো খুলে দেয়, আবার বন্ধ করে দেয় বাস ছাড়বার পরে। টুরিস্ট বাসের যাত্রীরাই একে একে আসতে লাগলেন।

স্বাতি বোধহয় মজা দেখবার উদ্দেশ্যে বলল: দুখানা টিকিট পাওয়া গেছে মা, তোমরা দুজনে দেখে এস।

মামী একখানা চেয়ারে বসেছিলেন, বললেন: সে আবার কী কথা!

আর মামা কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : চেষ্টা করে দেখছি।

বলে বাহিরে বেরিয়ে আসছিলুম। স্বাতি বলল : তোমার দ্বারা হবে না গোপালদা, আমি দেখছি।

বলে সেও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

নানাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক খবর আমরা পেয়ে গেলুম। খান চারেক টুরিস্ট কোচ আছে, তার মধ্যে তিন নম্বরের কোচটি এয়ার কণ্ডিশণ্ড্, ভাড়া মাথা পিছু সাড়ে চার টাকা। অন্য তিনখানিতে ভাড়া সাড়ে তিন টাকা, কিন্তু সব দিন চলে না। রিজার্ভেসন করতে হয় চব্বিশ ঘণ্টা আগে। চার বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের ভাড়া লাগে না।

আমেদাবাদ শহরটি দেখাতে সময় লাগে চার ঘণ্টা। সকাল আটটা থেকে বারোটা, আবার আড়াইটে থেকে সাড়ে ছটা। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময় হল তিনটে থেকে সাতটা। স্বাতি সব শুনে বলল : এখন জায়গা না পেলে দুপুরের জন্যে টিকিট কাটা যাবে।

আমি বললুম : না, তা হতে পারে না।

কেন ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : মামা খুবই বিরক্ত হবেন। হয়তো বলবেন, দরকার নেই টুরিস্ট বাসের, তার চেয়ে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া কর।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : মন্দ কি, সেই ব্যবস্থাই করা যাবে।

আমি তার কৌতুকবোধের কারণ বুঝি। ট্যাক্সি নিলেই শহর দেখাবার ভার পড়বে আমার উপরে। নতুন শহর, এ শহরের কিছুই জানি না—এই তার ধারণা। কাজেই আমার বিপদ উপভোগ করবার সে যথেষ্ট সুযোগ পাবে। আমি তাই উৎসাহ দেখাবার

ভাণ করে বললুম: তবে আমরা অকারণে অপেক্ষা করছি কেন? একখানা ট্যাক্সি ধরেই বেরিয়ে পড়তে পারি!

স্বাতি বোধহয় খানিকটা আশ্চর্য হল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল—কোথাও কারও সঙ্গে আমি এই শহর সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি কি না। কিছু মনে করতে না পেরে চুপ করে রইল।

আর আমি বললুম: এস।

বলে ট্যাক্সির খোঁজে না গিয়ে এন্‌কোয়ারি অফিসের সেই ভদ্রলোকের সামনে এসে উপস্থিত হলুম। ভদ্রলোক মুখ তুলেই বললেন: ওয়েটিং রুমেই আছেন তো আপনারা! আমি খবর দেব।

স্বাতি আর একবার তার ঘড়ির দিকে তাকাল। আর আমাকে হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে দেখে বলল: আর কয়েকটা মিনিট অপেক্ষাই কর না!

আমি বললুম: অপেক্ষা না করে একটা কাজ করা যাক।

কী?

কারও কাছে বাড়তি টিকিট আছে কিনা, একটু খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।

বাড়তি টিকিট থাকবে কেন?

আছে কিনা দেখাই যাক না।

বলে আমরা আবার ওয়েটিং রুমে ফিরে এলুম। আর আমি সগৌরবে হিন্দীতে ঘোষণা করলুম যে দুজন যাত্রী না এলেই আমরা টিকিট পাব। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে একটুও বিলম্ব হল না। একটি গুজরাতী পরিবারের দুটি মহিলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেই বলে ফেললেন যে তাঁরা ছখানা টিকিট কিনেছিলেন, কিন্তু দুজন আসতে পারেন নি। এই পরিবারের সঙ্গে কোন পুরুষ আছে কিনা দেখতে গিয়েই এক ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। পকেট থেকে দুখানা টিকিট বার করে তিনি বললেন: এই নিন।

আমি বললুম: অনেক ধন্যবাদ। আপনি দয়া করে একবার আসুন আমার সঙ্গে।

বলে তাঁকে অফিসে নিয়ে এলুম। আর মামার কাছে টাকা নিয়ে স্বাতি আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু অফিসের ভদ্রলোক বললেন: না, টিকিট ট্রান্সফার হবে না।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন: আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিলে ভাল ছিল।

বলে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর টিকিটের দিকে হাত বাড়াতেই উত্তর পেলেন: এ দুখানা আপনি রেখে যান, আমি রিফাণ্ডের চেষ্টা করব।

কিন্তু এসব কখন করবেন তা বোঝবার আগেই দেখলুম যে এক মহিলা কিছু কাগজপত্র হাতে করে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সামান্য কিছু কথাবার্তা বলেই আমাদের চারখানা টিকিট দিয়ে দিলেন। প্রফুল্ল মনে আমরা ফিরে এলুম। মনে হল যে গুজরাতী ভদ্রলোকও তাঁর রিফাণ্ড পেয়ে গেলেন। ফেরার পরে তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখেই এই কথা মনে হল।

এর পরে বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল না। টুরিস্ট বাস এসে গেছে বলে রব উঠল। সকলের সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে এসে বাসে উঠলুম। বসবার জায়গার নির্দেশ দেবার জন্যে লোক ছিল। কেন জানি না, আমরা একেবারে সামনের দিকে সীট পেলুম ড্রাইভারের পিছনে। একখানি করে কার্ড পাওয়া গেল, তাতে দর্শনীয় বস্তুর নাম আছে। একটি মেয়ে উঠে দরজার কাছেই বসল। এটি গাইডের জায়গা। রেডিও, মাইক প্রভৃতি সরঞ্জাম আছে। অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাস ছাড়ল ঠিক আটটার সময়েই।

গাইড মেয়েটি আমাদের অভ্যর্থনা করল দুটি ভাষায়—ইংরাজী ও গুজরাতীতে। মাইকের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট, কিন্তু

কথার দিকে মন দিলে পথের দিকে চোখ রাখা কঠিন হচ্ছে। ভদ্রা ফোর্টের কথা কী বলল তা বোঝবার আগেই সিদি সৈয়দ মসজিদের কথা এসে গেল। মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলল?

কথার দিকে আমি মন রেখেছিলুম, আবার চোখও রেখেছিলুম পথের দিকে। অপরূপ এখানকার পাথরের জালি শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টাও করেছিলুম। মনে হল যে কিছু দেখতেও পেয়েছি। একটা দেয়ালের গায়ে অর্ধ বৃত্তাকার জালি, পাথরের সূক্ষ্ম কাজ, যেমন আগ্রায় বা ফতেপুর সিক্রিতে আমরা দেখেছি। কিন্তু এমন সূক্ষ্ম বোধহয় নয়, আর এমন জানালার মতোও নয়। এক নজরে মনে হল যে একটা পাম গাছকে যেন আগাছায় জড়িয়ে ধরেছে।

আমার উত্তর না পেয়ে মামা বললেন: কী বলছে বল তো?

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল: এর নাম পাম অ্যাণ্ড প্যারাসাইট ডিজাইন। এই জানালার কাজের প্রতীক নিউইয়র্ক ও কেন্‌সিংটন জাদুঘরে রাখা আছে।

মামা আমার পাশে বসে নিজে শোনবার চেষ্টা না করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আর মেয়েটি ইংরেজী শেষ করে গুজরাতী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করতেই আমি বললুম: এই এলাকার নাম হল লাল দরোয়াজা। বাজার যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই এই সিদি সৈয়দ মসজিদ। এই মসজিদে দেখবার জিনিস হল পাথরের জালির জানালা।

মামা বললেন: কই, কিছু দেখতে পেলুম না তো!

তখন আমি নিজের হাতের কার্ডখানার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। দেখলুম যে কম করেও ছাব্বিশটি জায়গার নাম আছে তাতে। কিন্তু বাস দাঁড়াবে গোটা পাঁচেক জায়গায়। কোথাও দশ মিনিট, কোথাও বা পনর কুড়ি মিনিট সময় দাঁড়াবে। অন্য সব জায়গা বাসে বসেই দেখতে হবে। মামাকে এই কথা

বলতেই তিনি বললেন : তবে আর কি, বাসে বসেই গোটা শহরটা দেখা হয়ে যাবে।

তিনি যে খুশী হন নি এই ব্যবস্থায়, সেই কথাটিই বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আর শেষ পর্যন্ত না দেখে কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না ভেবে আমি নীরবে রইলুম। আর ভাবতে লাগলুম ভাদর দুর্গের কথা। পরে আমি একখানা মানচিত্র দেখে এই শহরের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলুম। সবরমতী নদীর ধারে এই দুর্গের গেট, অন্য ধারে লাল দরোয়াজা। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই আমরা একটি বিরাট ময়দান দেখেছি। বাগান সেটি। খুব উঁচু বাড়িও দেখেছি। একজন বলেছিল যে সেটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এইখানেই বোধহয় ভদ্রা বা ভাদর দুর্গ। কাছেই বাজার হাট জমজমাট এলাকা।

এই দুর্গ এলাকার অপর প্রান্তে আজম খানের প্রাসাদ ও মসজিদ। সবরমতী নদীর তীরে মানিক বুর্জ। সেখানেই এলিস ব্রিজ। তিন দরোয়াজা, জামি মসজিদ আর আহমদ শাহ ও রাণীদের কবরও বেশি দূরে নয়। আজম খানের প্রাসাদ থেকে স্টেশনের দিকে যেতে এই সব দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমাদের টুরিস্ট বাস এলিস ব্রিজের উপরে উঠে পড়ল। সবরমতী নদী পার হয়ে পশ্চিম ধারে যাবে। নদীর দুধারেই শহর। প্রশস্ত পুল, কিন্তু নদীতে জল নেই সর্বত্র। শুকনো বালির উপরে স্থানে স্থানে সব্জির চাষ হচ্ছে, আর নানা রঙের বিচিত্র বেশ-ভূষায় মেয়ে-পুরুষদের দেখা যাচ্ছে জলের ধারে।

আমাদের গাইড মেয়েটি তখন এলিস ব্রিজের কথা বলছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্যে এখন এই সবরমতী নদীর উপরে একাধিক ব্রিজ। কিন্তু এই পুলের সংখ্যা কটি তা শুনতে পেলুম না। মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কী বলছে গোপাল ?

বললুম : পুলের কথা।

পুলের আবার কথা কী ?

মেয়েটি তখন ইংরেজী কথা শেষ করে গুজরাতী ভাষায় কথা কইছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম : সবরমতী নদীর উপরে এই রকমের পুল কটি আছে, তাই বলছিল।

কটি বলল ?

তা শুনতে পেলুম না।

স্বাতি আমার পেছনে বসেছিল। এইবার তার হাসি শুনতে পেলুম সে হেসেছে কেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তাই পিছনে ফিরে তাকে দেখবার চেষ্টা করলুম না।

যে মানচিত্রটি আমি দেখেছিলুম, তা বোধহয় পুরনো মানচিত্র। তাতে এলিস ব্রিজ আছে, আর আছে রেলের পুল। কিন্তু আর একটা জিনিস আছে, যা মনে হল একটা দুর্গের দেওয়াল। উত্তরে শাপুর গেট, দিল্লী গেট ও দরিয়াপুর গেট, পূর্বে প্রেমভাই গেট, কালুপুর গেট ও সরঙ্গপুর গেট। এই দুটি গেট দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলে রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। দক্ষিণে রাজপুর গেট, আস্টোরিয়া গেট ও জামালপুর গেট। খানপুর গেট ও ভাদর গেট পশ্চিমে সবরমতী নদীর ধারে। আর এলিস ব্রিজের দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন।

এই মানচিত্রটি আগে দেখা থাকলে খুবই সুবিধে হত। অনেক কিছু নিজেই বুঝতে পারতুম। গাইড মেয়েটি আমার পাশেই আছে। দুজনের মাঝখানে শুধু যাতায়াতের পথ। যখন চুপ করে থাকে, তখন কিছু জিজ্ঞাসা করাও হয়তো চলে। কিন্তু সৌজন্য-বিরুদ্ধ হতে পারে ভেবে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা আমি করলুম না।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

তাঁর হাতেও একখানা কার্ড ছিল। কিন্তু তিনি পকেট থেকে চশমা বার করে সেই কার্ড পড়বার কষ্ট স্বীকার করলেন ন

আমি সেই কার্ড চোখের সামনেই খুলে রেখেছিলুম। অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশনটি পেরিয়ে এসেছি কিনা জানি না। এর পরে গুজরাত বিদ্যাপীঠ ও সবরমতী হরিজন আশ্রম। সেখানে আমাদের বাস পনর মিনিট দাঁড়াবে। মামাকে আমি এই খবর দিলুম।

মামা বললেন : হরিজন আশ্রমে আবার নামবার কী দরকার?

আমি বললুম : এখন তো সেই আশ্রম একটি তীর্থস্থান।

মামা আমার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে বললেন : ওঃ, ভুলে গিয়েছিলুম সেই কথা।

পিছন থেকে স্বাতি আর একবার হেসে উঠল। এ হাসির আমি কোন জবাব দিলুম না।

পথে যেতে যেতেই আমরা গুজরাত বিদ্যাপীঠ গান্ধীভবন দেখতে পেলুম। গাইড মেয়েটি আমাদের চিনিয়ে দিল। বলল : মহাত্মা গান্ধী এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গুজরাতের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম এটি।

নদীর ওপারের মতো এপারের বসতি ঘন নয়। দূরে দূরে বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত পথে জনস্রোত চলছে না। নদীর অনেকটা পথ অতিক্রম করে আমরা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে এসে পৌঁছলুম। এক জায়গায় এসে আমাদের বাস থামল। মেয়েটি বলল : এই হল গান্ধীজীর হরিজন আশ্রম। এইখানে আমরা পনর মিনিটের জন্য নামব।

বলে সে-ই আগে দরজা খুলে নেমে পড়ল। আমরা নামলুম তার পরে, আর তাকে অনুসরণ করেই আশ্রমের ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

বাঁ দিকের নূতন গৃহটির দিকে আমরা এগোলুম না, আমরা পুরনো কুটীরগুলির দিকেই এগিয়ে গেলুম। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই দেখতে পেলুম সবরমতী নদী। নদীর ধারে পাকা বাঁধ দেওয়া আছে বলে দূর থেকে দেখতে পাই নি। কাছে গিয়ে সেই

সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলুম। নদীর পরপারে আমেদাবাদ শহর, এপারেও ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে। কিন্তু বাসের সকল যাত্রী গাইডকে অনুসরণ করে একটি সুরক্ষিত কুটীরের সামনে চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে শুনলুম যে মহাত্মাজী বাস করতেন এই কুটীরে। তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র সেখানে সযত্নে সাজানো আছে। এক নজরে এই সব দেখে আমরা সেই নূতন গৃহটিতে চলে এলুম। এখানে জুতো খুলে ভিতরটা দেখতে হয়। মহাত্মাজীর জীবনের নানা চিত্র দেওয়ালে টাঙানো আছে, আর আছে তাঁর গ্রন্থের প্রদর্শনী। কিন্তু এসব ভাল করে দেখবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। পনর মিনিটের মধ্যেই সবাইকে বাসে গিয়ে উঠতে হবে। এ রকম দেখায় শুধু দেখাই হয়। মন ভরে না।

ফেরার পথে আমার মন সেই মহাপুরুষের ভাবনায় ডুবে গেল। পোরবন্দরের এক গুজরাতী বৈশ্য পরিবারে মহাত্মাজীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা অক্টোবর। আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্মের আট বছর পরে। তাঁর বাপ পিতামহ ছিলেন পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান। তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কস্তুর বাঈএর সঙ্গে। তাঁর পিতাকে হারান ষোল বছর বয়সে। বছর তিনেক পরে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। কিন্তু দুটো বছরও দেশে থাকতে পারলেন না। মামলার কাজে সেই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন, জীবনের কুড়িটি বছর তাঁর সেখানেই কাটল। কিন্তু সুখে নয়, শান্তিতে নয়, সেখানেই তাঁর জীবনযুদ্ধের শুরু হল। ভারতীয়দের অসম্মান ও দুর্দশা দেখলেন নিজের চোখে, আড়ালে কাঁদলেন তাদের জন্যে, আর প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়াতে শেখালেন। সত্যাগ্রহ করলেন, সত্যাগ্রহ শেখালেন, আর সত্যাগ্রহের বাণী নিয়ে দেশে ফিরলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে উজ্জ্বলতম তারকার জন্ম হল।

ওয়ার্ধার সেবাগ্রামে তাঁর একটি কুটীর নির্মিত হল। দিল্লীর হরিজন বস্তীতে আর একটি কুটীর। আর এই আমেদাবাদের কোচরাব পল্লীতে আর একটি কুটীর। সেই কুটীরই পরবর্ত্তীকালে এই সবরমতী আশ্রমে উঠে এসেছিল। কিন্তু মহাত্মাজীর জীবনের সাড়ে ছ বছর কেটেছে ইংরেজের জেলে—ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

মামা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : গোপাল কী ভাবছ বল তো ?

আমি চমকে উঠেছিলুম এই প্রশ্ন শুনে, তারপরে সামলে নিয়ে বললুম : এই আশ্রমটা ভাল করে দেখা হল না।

আবার কী দেখবে ?

বললুম : শুনেছিলুম এই আশ্রমটি এখন ভারি কর্মব্যস্ত স্থান। অম্বর চরকা, কাগজ ও নানা রকম কুটীরশিল্পের কাজ হচ্ছে। কিন্তু সে সব কোন্ দিকে তা দেখতে পেলুম না।

তা দেখে কী করবে ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আর আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেলুম না। যে মানুষটি তাঁর জীবন দিয়ে নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই আদর্শ এখন কী ভাবে রূপায়িত হচ্ছে, তাই দেখবার বাসনা ছিল। কিন্তু মামা নীরবে থাকতে পারলেন না, বললেন : বুঝলে গোপাল, তুমি রাগই কর, আর দুঃখই পাও, একটা সত্যি কথা আমি বলবই।

আমি কিছু না বলে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন : তোমার গান্ধীজীকে এদেশের সরকার জোর করে রাষ্ট্রপিতা করেছে, যেমন হিন্দী ভাষাকে সবার উপরে চাপাচ্ছে গায়ের জোরে। তা না হলে যে মানুষটি তাঁকে রাষ্ট্রপিতার সম্মান দিতে চেয়েছিল, সে মানুষটির আলোয় আর সবাই ম্লান হয়ে যেত।

একটু থেমে বললেন : নেতাজীর কথা মনে পড়ে ? নিজের প্রাণ দিয়ে ভারতের মুক্তির জন্যে লড়ছিলেন যে মানুষ, তিনিই বিদেশ থেকে বলেছিলেন, ফাদার অব দি নেশন, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, সাহায্য কর আমাদের। দেশের মুক্তির জন্যে আমরা বাইরে থেকে লড়ছি। এ লড়াইয়ে আমরা যেন হেরে না যাই। কিন্তু—না থাক। তোমরা তখন বোধহয় নিতান্তই শিশু ছিলে, সেসব কথা তোমরা কিছুই জান না।

সত্যিই আমরা আমাদের শৈশবে গান্ধীজীকে হারিয়েছি। এক দিন শুনলাম যে আততায়ীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। সবাইকে কাঁদতে দেখে আমরাও কাঁদলাম। কিন্তু কেন তাঁকে প্রাণ হারাতে হল, সেকথা বোঝবার বয়স তখনও আমাদের হয় নি। নেতাজীর মৃত্যুও আমাদের কাছে আজও রহস্যময় হয়ে আছে।

পিছন থেকে স্বাতি চুপি চুপি বলল : গোপালদা খুব দুঃখ পেয়েছে।

সত্যিই দুঃখ পাবার মতো কথা। আমার মনে হল যে আজও আমরা মহাত্মাজীকে চিনতে পারি নি। তাঁর জীবনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে না দেখলে বোধহয় তাঁকে চেনা সম্ভব নয়। আলবার্ট আয়েনস্টাইন ঠিকই বুঝেছিলেন যে আগামী যুগের মানুষেরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এ রকম একজন রক্তমাংসের মানুষ এ পৃথিবীর উপরে পা ফেলে হেঁটেছিলেন।

আমাদের টুরিস্ট বাস তখন একই পথে অনেক দূর ফিরে এসেছে।

৩

সবরমতী নদীর পশ্চিম পারে একেবারে উত্তরের দিকে গান্ধীজীর হরিজন আশ্রম। আর কাঙ্কারিয়া তালাওএর নিকট বালবাটিকা নদীর পূর্বপারে একেবারে দক্ষিণের দিকে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ গাইড আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল। নদীর ওপারে সরখেজ রোজায় পনর মিনিট দাঁড়াবার কথা ছিল। কিন্তু রাস্তা মেরামত হচ্ছিল বলে সেদিকে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তার ফলে আমরা গীতা মন্দির দেখেছিলুম। বাসে বসে যা দেখেছিলুম তার পরম্পরা মনে নেই। কিন্তু বাড়িগুলোর সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

গুজরাতে গান্ধীজীর পরেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম। তাঁর নামে সর্দার ব্রিজ, আর সর্দার বল্লভভাই স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। সর্দারজীর নামেও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তারপরে অ্যাটিরা নামে একটি বিরাট বাড়ি দেখলুম। এ. টি. আই. আর. এ—আমেদাবাদ টেক্স্‌টাইল ইণ্ডাস্ট্রিস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন। একে একে সচিবালয় গুজরাত কলেজ এম. জে. লাইব্রেরি টাউন হল ভি. এস. হাসপাতালও দেখলুম।

সবরমতী নদীর পশ্চিম পারেই কোচরাব গান্ধী আশ্রম ও সরখেজ রোজা—দক্ষিণ পশ্চিমে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হয়। সরখেজ রোজার পথ বন্ধ শুনেই মামা বললেন: সে আবার কী?

আমি ভেবেছিলুম যে কোন উত্তর দেব না, কিন্তু মামা তা দিলেন না। বললেন: গোপাল আজ বড় চুপচাপ আছ, ব্যাপার কী বল তো?

পিছন থেকে স্বাতি বলে উঠল: গোপালদার মন আজ খুব খারাপ।

কেন?

বলে মামা পিছনের দিকে তাকালেন। আর বিজ্ঞের মতো স্বাতি জবাব দিল: গোপালদা ভেবেছিল, আমেদাবাদেই ছুটি পেয়ে যাবে, লাফাতে লাফাতে গিয়ে বাড়ি ফেরার গাড়িতে উঠবে।

মামা বললেন: বাড়িতে ওর আছে কে, যে বাড়ি ফেরার জন্যে এমন তাড়া?

পিছন ফিরে আমি স্বাতির মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম। মনে হল, তার মুখের কথার সঙ্গে চোখের দৃষ্টির কোন মিল নেই। মুখে তার কৌতুকের আমেজ লেগে আছে, কিন্তু দৃষ্টিতে বেদনার আভাস। সহসা সে এ কথার উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দিলেন মামী, বললেন: তোমাদের মতো তো নয়, ওর চাকরি আছে। সময় মতো ফেরার কথা ওর ভাবতে হবে বৈকি।

মামীর মনের কথা আমি বুঝতে পারি। তিনি জো রায়ের কথা ভেবেই আমাকে বিদায় দিতে চাইছেন। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারলেন না। অন্তত আমার সামনে তিনি বলবেন না, বলবেন আড়ালে।

পথ দিয়ে যেতে যেতেই আমরা টেগোর মেমোরিয়াল হল দেখলুম। আশ্চর্য মানুষ আমাদের রবীন্দ্রনাথ। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানা স্থানে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সঙ্গীত নৃত্য নাটকের অনুরাগ যাদেরই আছে, তারাই স্থাপন করেছে রবীন্দ্রভবন। একটি রবীন্দ্রভবন প্রতিষ্ঠা না করলে যেন সংস্কৃতির ব্যাপারে তারা পিছিয়ে আছে বলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

এবারে আমাদের টুরিস্ট বাস একটি গেটের সামনে সবাইকে নামিয়ে দিল। গাইড মেয়েটি তার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এ পথে আর ফিরতে হবে না, বাস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে

বালবাটিকার সামনে। এই গেট দিয়ে ঢুকলে জাদুঘর ও চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বালবাটিকার গেটে পৌঁছে যাব।

মামা বসে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন: কতটা হাঁটতে হবে সে খবর নিয়েছ কি?

স্বাতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল: তা অনেকটা হাঁটতে হবে বৈকি।

মামা বললেন: তাহলে তোমরাই হাঁটতে যাও, আমি গাড়িতে বসে থাকি।

কিন্তু মামী পড়লেন মুশকিলে, বললেন: বেড়াতে এসেও হাঁটতে চাও না, তোমাকে নিয়ে আর পারি নে।

মামা বললেন: তোমাকে হাঁটতে তো বারণ করি নি। শুধু জাদুঘর তো নয়, চিড়িয়াখানাটাও হেঁটে পার হতে হবে। দুটো বাঁদর আর তিনটে বক দেখবার জন্যে এই দুপুর রোদে আমি হাঁটতে রাজী নই।

দুপুর নয়, রোদেরও তেজ হয় নি এখন। হাঁটতে আমাদের ভাল লাগবে বলে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু মামী উঠলেন না। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত বললেন: তাহলে তোমরাই যাও।

বলে মামার সঙ্গেই বসে রইলেন।

আমরা নেমে পড়লুম অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে, আর বাস আমাদের ফেলে সামনের দিকে চলে গেল।

স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল যাত্রীদের সঙ্গে। বোধহয় টিকিট কাটল ভিতরে যাবার জন্যে। তারপরে আমাকে ডাকল: দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চলে এস।

জানি না কেন আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, চমকে উঠে তার কাছে চলে এলুম।

স্বাতি চলতে চলতে প্রশ্ন করল: হঠাৎ তোমার ফিরে যাবার শখ হল কেন বল তো?

তখন আমি সহজ হয়ে গেছি। বললুম : অনেক দিন তোমাদের জ্বালাতন করলুম তো, এই বারে নিষ্কৃতি দিতে চাইছি।

স্বাতি বলল : উঁহু, মতলবটা এমন সাধু নয়। বাবাও বিশ্বাস করেন নি তোমাকে।

তবে কী মনে এয়েছে বল তো ?

স্বাতি আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল : ভয়।

ভয় ! ভয় কিসের ? কাকে ভয় ?

কেন, যে তোমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে গুম্ করে দেবে বলেছে বম্বেতে ! মনে নেই ?

স্বাতির কথায় আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। বললুম : কই, এমন কথা তো কেউ বলে নি !

এবারে আমার মুখের দিকে চেয়ে স্বাতি হেসে ফেলল। নিঃশব্দ হাসি, মনের নির্মল আলোয় প্রসন্ন। কৌতুক আছে, কণ্টক নেই। এই হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাসতে পারলে আনন্দও আছে। আমি তাই পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারি নি। বললুম : না, টোপর কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছে আমাকে।

কিন্তু স্বাতি দমল না। বলল : কার জন্যে টোপর ?

বললুম : নিজের টোপর তো নিজেকে কিনতে নেই, তাই আমাকে ধরেছে।

স্বাতি বলল : আর কনে জোগাড় করবে বুঝি হালদার মশাই ?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : হুঁ, তার জন্যে বায়না নিয়েছে আগেই।

স্বাতিও গম্ভীর ভাবে বলল : আমাকে তাহলে ভাংচি দেবার ভার দিতে বোলো।

গল্প করতে করতেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম। সময় কম বলে যাত্রীরাও দেরি করছিলেন না কোথাও। তবু কিছু দেখছিলেন

এদিকে সেদিকে চেয়ে। কিন্তু স্বাতিকে নির্বিকার দেখে জিজ্ঞাসা করলুম : কিছু দেখবে না ?

দেখছি তো সব।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল সকৌতুকে।

বললুম : বুঝেছি।

স্বাতি বলল : বুঝবেই তো। কিন্তু এমন দেরিতে যে বুঝবে তা আমি বুঝি নি।

বলে আগের মত হাসতে লাগল।

আজ আমি বারে বারে হেরে যাচ্ছি স্বাতির কাছে। আর কেন হেরে যাচ্ছি, তাও জানি। বম্বের কথাই আমার বারে বারে মনে আসছে। আমেদাবাদ থেকে আমরা বম্বে যাব, দিন কতক থাকতে হবে সেখানে। আর আমি নিশ্চয়ই জানি যে মামী জো রায়কে খবর দিতে বলবেন। আর জো রায়ই সাড়ম্বরে বম্বে দেখাবার ভার নেবেন। মামীর চোখে জো রায় একজন কৃতী লোক। তাঁকে আমি হিংসে করি না। কিন্তু তাঁর পাশে আমি দাঁড়াতেও চাই না। স্বাতির ক্যামেরায় কোন অস্বাভাবিক ছবি উঠবে না জানি ; কিন্তু সমাজের ক্যামেরায় যে ছবি দেখবেন সকলে, তারই ভয়ে আমি পিছিয়ে আসছি। পিছিয়ে আসাই সম্মানের। দারিদ্র্য অসম্মানের জিনিস নয়, দারিদ্র্য লুকোবার চেষ্টাই অসম্মানের। মনের দিক থেকে ধনীরাই তো দরিদ্র বেশি। একদিন আমরাও ধনীকে করুণার চোখে দেখব, এমন দিন কি এ দেশে আসবে না!

পাশ থেকে স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : তোমাকে নিয়ে ভারি বিপদ হয়েছে আমার।

চমকে উঠে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। আর স্বাতি হেসে বলল : গটমট করে যে বেরিয়ে যাচ্ছ, সব কিছু দেখা হয়ে গেল তোমার ?

তার কথা শুনে আমি থমকে দাঁড়ালুম। আর স্বাতি বলল: সবাইকে আসতে দাও।

বলে একটুখানি ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

আমি আমার ভুল বুঝতে পারলুম। জাদুঘর আর চিড়িয়াখানা দেখে এমনি করে বেরিয়ে যাওয়া চলে না। যারা দেখতে দেখতে আসছে, তাদের সঙ্গেই বেরোতে হবে। তা না হলে মামী সন্দেহ করবেন স্বাতিকে। আমার সে কথা মনে ছিলনা, তাই স্বাতির সতর্কতা দেখে বিস্মিত হলুম।

স্বাতি বলল: তোমার বুদ্ধি দেখে আমি আশ্চর্য হই গোপালদা। জো রায়ের ভয়ে তুমি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছ। তাকে তোমার ভয় কিসের।

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না।

স্বাতি বলল: জো রায় তার ঠিকানা দিতে ভুলে গেছে। আর আমাদের খবর সে কেমন করে পাবে!

কিন্তু তাঁর ফার্মের নাম তো আমরা জানি।

কে খবর দেবে তাকে? তুমি? তাই দিও।

তারপরেই প্রশ্ন করে বসল: আমাকে কি তুমি বিশ্বাস কর না গোপালদা?

সে কি কথা।

তবে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার না কেন?

আমি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম তার কথায়। বললুম: সত্যিই তো।

স্থির দৃষ্টিতে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি সেই দৃষ্টিতে কী দেখলুম জানি না, আমার মনের দিগন্ত সহসা প্রসারিত হয়ে গেল। আলোর উজ্জ্বল সেই দিগন্ত প্রসন্ন উদারতায় ভরা। নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি পেয়ে আমি বললুম: ভুল করেছি আমি।

স্বাতি হেসে বলল : চল এইবারে।

যাত্রীদের দু-একজন তখন গেট দিয়ে বেরোচ্ছিল, আমরাও বেরিয়ে পড়লুম।

পথ এখানে খুব প্রশস্ত, অনেক গাড়িঘোড়া এখানে একসঙ্গে জমা হতে পারে। আমাদের টুরিস্ট বাসটিও দেখতে পেলুম। একটুখানি ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দূরে, কিন্তু ভিতরে কোন যাত্রী নেই। বালবাটিকার গেটও দেখতে পাওয়া গেল সামনে। সারি সারি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। দেরি না করে আমরা সেই গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম। আর দুখানা টিকিট কেটে ঢুকে পড়লুম ভিতরে।

বালবাটিকা মানে ছেলেদের বাগান—চিল্‌ড্রেন্স পার্ক। ছেলে-মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানা আয়োজন সেখানে। প্রথমেই দেখলুম দুখানা ছোট গাড়ি, একটি হরিণে টানবে, আর একটি ছাগলে। উর্দিপরা গাড়োয়ান আছে দাঁড়িয়ে। টিকিট কেটে এই সব গাড়িতে উঠতে হবে। পাহাড়ের মতো জায়গায় এই বাগানটি অবস্থিত বলে কখনও উঠতে হচ্ছে, নামতে হচ্ছে কখনও। ছোট ছোট ঘরের ভিতরে নানা মজার জিনিস সাজানো।

এগিয়ে যেতে যেতে স্বাতি বলল : বাবা মা বোধ হয় এই বাগানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এ কথা বলতে না বলতেই স্বাতি আবার বলল : ঐ তো, আসছেন ঐ দিক থেকে।

বলে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

কাছে পৌঁছতেই মামী বললেন : অনেক দেরি হল তোমাদের। তাড়াতাড়ি দেখে এস, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসছি।

মামা বললেন : সোজা এগিয়ে যাও। কয়েকখানা আয়না দেখে খুশী হবে তোমরা।

বলে আর অপেক্ষা করলেন না।

দু ধারে দেখতে দেখতেই আমরা সেই আয়নার ঘরে পৌঁছে গেলুম। পাশাপাশি কয়েকখানা আয়না রাখা আছে, আর তার সামনে দাঁড়ালে না হেসে থাকা যায় না। নিজের চেহারা দেখেই হেসে আকুল হতে হয়। কোনটায় সরু লম্বা চেহারা দেখায় তাল গাছের মতো। কোনটায় বা ফুটবলের মতো গোল থ্যাবড়া চেহারা।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা বাগানের আর এক প্রান্তে এলুম। সেখানে জলখাবারের ক্যান্টিন আছে একটি। এক জায়গা থেকে নিচে কাঙ্কারিয়া তালাও দেখা যাচ্ছে। এই লেকের সৌন্দর্যের কথা আমি শুনেছিলুম। সন্ধ্যা বেলায় অনেক লোক এখানে বেড়াতে আসে, নৌকোয় বেড়ানোর ব্যবস্থা আছে। আর মাঝখানে একটি সুন্দর বাগান। কিন্তু এখন এই লেকের সে সৌন্দর্য আর নেই। লেকের জল বার করে দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে চারিদিক। তারপরে আবার নতুন করে সাজানো হবে।

এখানে আমাদের কুড়ি মিনিট সময়। কিন্তু মনে হল যে সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম বাসের কাছে। কিন্তু এখান থেকে বাস শহরের দিকে না গিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হল। শাহ আলম রোজার পাশ দিয়ে পৌঁছে গেলুম চাণ্ডোলা লেকে। দেখবার কিছু নেই বলে বাস ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

ফেরার পথে আমরা স্টেশনের কাছে সরদারপুর শেকিং টাওয়ার দেখলুম। এর নাম ঝুলতা মিনার। সিদি বসির মসজিদ সংলগ্ন এই মিনারে টিকিট কেটে উপরে উঠতে হয়। এখানে নামবার আগেই গাইড আমাদের এই অসাধারণ মিনার দুটির কথা বলেছিল। একটি মিনারে উঠে বারান্দায় একটু দোলা দিলেই অন্য মিনারটি দোলে। একজনের দোলাতেই দোলে। তার জন্যে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল : ঠিক আছে গোপালদা, তুমি, একটির ওপরে ওঠ, আমি উঠব অন্যটিতে। তুমি একবার দুলিও আর আমিও দোলাব একবার। তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।'

আমরা চারখানা টিকিট কেটেছিলুম। তারপরে জেনেছিলুম যে উপরে না উঠলে এই টিকিটের দরকার নেই। মামা ও মামী উপরে উঠবেন না, কাজেই তাঁদের জন্যে টিকিট কাটার দরকার ছিল না। অন্য যাত্রীকে সেই টিকিট দিয়ে দেওয়া হল।

সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা তখনও মিনারের চূড়ায় পৌঁছতে পারি নি, সমস্ত মিনারটা দুলে উঠল। যারা আগে উঠেছে, তারাই দুলিয়েছে। দুজন মহিলা আমার পিছনে উঠছিলেন, তাঁরা বসে পড়লেন। নিচু প্যারাপেট, দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। অল্প সময়েই সব জানা হয়ে গেল। আমরা নিচে নেমে এলুম।

যাত্রীদের অনেকে নিচে দাঁড়িয়ে নানারকমের কথা বলছিলেন। কেউ বললেন, ভূমিকম্প থেকে বাঁচাবার জন্যেই এই রকম মিনার তৈরি হয়েছিল। আবার স্থানীয় কোন লোক বললেন যে গোমতিপুরে রাজপুর বিবির মসজিদে এই রকম আর এক জোড় মিনার আছে। তিনতলা মিনার, কিন্তু একটার দুটো তলা ভেঙে গেছে। ভেঙে পড়ে নি। কৌতূহলী লোকেরা নাকি তা ভেঙে বোঝবার চেষ্টা করেছিল, ব্যাপারটা কী!

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যিই দোলে নাকি?

স্বাতি বলল : বেশ ভয় করে।

যত সব ছেলেমানুষি!

বলে মামা পথের দিকে এগোলেন।

এখান থেকে হাতী সিংএর মন্দিরে যাবার পথে আমরা সিভিল হাসপাতাল আর শাহিবাগ এলাকা দেখতে পেয়েছিলুম। শাহিবাগ প্রাসাদ এখন গুজরাতের রাজভবন। আর দিল্লী গেটের বাহিরে

হাতী সিংএর মন্দির। টুরিস্ট বাস এখানে দশ মিনিট দাঁড়ায়। রাস্তার ধারে বাস দাঁড়াতেই আমরা সবাই নেমে পড়লুম ও রাস্তা পেরিয়ে মন্দিরের এলাকায় ঢুকে পড়লুম।

স্বাতি বলে উঠল : এ যে দিলওয়ারার মন্দির দেখছি।

আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির দেখে আসবার পরে এই কথাই মনে হয়। সাদা মার্বল পাথরের এই মন্দিরটিতে একই রকমের কারুকার্য। গাইডের কাছে জানলুম যে এই মন্দিরের তিপ্পান্নটি উঁচু শিখর আছে। জৈনমন্দির, চব্বিশজন তীর্থঙ্করেরই মূর্তি আছে ভিতরে। স্বাতি বলল : একখানা ছবি নিতে হবে।

কিন্তু সামনের ছবি নেওয়া যাবে না, সূর্য বিরূপ। তাই পিছনের দিকের ছবি নিতে হল তাকে। নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : এ মন্দিরটি কে তৈরি করেছে গোপালদা ?

বললুম : হাতী সিং।

হাতী সিং কে ?

বললুম : আমি তো গাইড নই, তোমাদের গাইডকে জিজ্ঞাসা কর।

কিন্তু কোথায় গাইড। সে বোধহয় তখন গাড়িতে গিয়ে বসেছে।

এখান থেকেই আমাদের ফেরার পালা। কংগ্রেস ভবনের দিকে আমরা তাকালুম না, দেখলুম না গান্ধী মজুর সেবালয়। মামা জিজ্ঞাসা করলেন : আমেদাবাদ দেখা হয়ে গেল ?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

কিন্তু মামার মুখ দেখে মনে হল যে তিনি এই শহর দেখে কোন তৃপ্তি পান নি। তার কারণ আমি অনুমান করতে পারি। এই সব জায়গার সঙ্গে অনেক পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের অনেক ভাঙা-গড়ার কথা। পুরনো কথা না জানলে

নতুন কথাও অর্থহীন হয়। অনেক জায়গা দেখা হল, কিন্তু অনেক কথা জানা হল না বলেই মামা বিমর্ষ হয়েছেন।

পিছনের যাত্রীদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন : ঠাণ্ডা জল আরও আছে?

বাসের একজন লোক অনেকক্ষণ আগে আমাদের ঠাণ্ডা জল খাইয়েছিল। প্লাস্টিকের অনেকগুলি বোতল ছিল সামনের দিকের একটা খোলের মধ্যে। প্লাস্টিকের গেলাসে সব যাত্রীদের সে জল খাইয়েছে, আর একটি করে টফি। লোকটি আবার এসে এক বোতল জল আর গেলাস নিয়ে পিছনে চলে গেল।

মামা এসব কথায় কান দেন নি। বললেন : এমন চুপ করে থাকলে চলবে না গোপাল, শহর দেখাবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

পিছন থেকে স্বাতি বলে উঠল : একটু খোসামোদ করতে হবে বাবা, দর বাড়াচ্ছে গোপালদা।

মামা বললেন : তা একটু করতে হবে বৈকি। দেবতার কাছে কিছু চাইতে হলেও দুটি বস্তুর দরকার—খোসামোদ আর ভেট। মন্ত্র পড়ে ভোগ নিবেদন কর। গোপাল তো একটিতেই তুষ্ট।

আমি এই পরিহাসের কোন উত্তর দিতে পারলুম না। দুপুরের আহারের পর যে তাঁকে আমেদাবাদের ইতিহাস শোনাতে হবে তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভেরাবলের পথে অধ্যাপক যোশীর কাছে যা শুনেছি, তা যথেষ্ট নয়। আরও কিছু তথ্য আমার জেনে নেওয়া দরকার। আর তা এখনই জেনে না নিলে স্বাতির কাছে আমাকে অপদস্থ হতে হবে।

হঠাৎ একটা ফন্দি এল মনে। টুরিস্ট বাস লাল দরোয়াজায় আমাদের নামিয়ে দিতেই আমি বললুম : এখন স্টেশনে ফিরবেন তো?

বেলা তখন ঠিক বারোটা। তাই মামী উত্তর দিলেন: খাবার সময় হয়েছে তো।

কিন্তু মামা বললেন: তুমি কি অন্য কোথাও যাবে ভাবছ?

এইখানে একটু কাজ ছিল আমার।

স্বাতি সন্দেহের চোখে তাকাল আমার দিকে। তাই তাড়াতাড়ি বললুম: বেশি দেরি হবে না আমার। আপনাদের স্নান আহ্নিক শেষ হবার আগেই আমি এসে পৌঁছে যাব।

কিন্তু স্বাতির সন্দেহ তাতে দূর হল না। বলল: গোপালদার নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।

তা তো আছেই।

বলে মামা একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লেন। মামী ও স্বাতিকে আমি তুলে দিলুম। মামী বললেন: বেশি দেরি কোরো না যেন, তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে থাকবে।

আমি বললুম: না, আমার একটুও দেরি হবে না।

স্টেশনে যেতে হবে শুনেই ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪

আমি ভেবেছিলুম যে এখানকার টুরিস্ট অফিস থেকে কিছু পুঁথিপত্র চটপট সংগ্রহ করে নেব, আর স্টেশনের পথেই তা পড়ে ফেলব। বাসের এন্‌কোয়ারি অফিসে জিজ্ঞাসা করেই টুরিস্ট অফিসের খোঁজ পেলুম। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিস-বাড়িতেই গুজরাত রাজ্যের টুরিস্ট অফিস, এখান থেকে দূরে নয় একটুও। মিউনিসিপাল অফিসেও আমেদাবাদের টুরিস্ট অফিস আছে, সে জায়গাতেও কিছু পাওয়া সম্ভব।

আমি আর দেরি করলুম না। লম্বা পা ফেলে চলে গেলুম এয়ার লাইন্সের অফিসে। দোতলায় টুরিস্ট অফিসটি চমৎকার সাজানো। একজন তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেই অনেক কথা জেনে নিলুম। তাঁর কাছে যা ছিল, তাও পেয়ে গেলুম বিনা মূল্যে।

তার পরে একখানা অটো রিক্সা ধরে চলে এলুম মিউনিসিপাল অফিসে। নিচেই অফিস। একজন মহিলা খুব সাহায্য করলেন। তাঁর কাছেও বিনা মূল্যের পুস্তিকা পেয়ে গেলুম।

আমেদাবাদে অটো রিক্সার ছড়াছড়ি। একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না। চটপট আরএকখানা রিক্সা ধরে স্টেশনে এসে গেলুম। পথে আমি কোন দিকে তাকাই নি, যেসব কাগজপত্র পেয়েছিলুম তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলুম তৎপর ভাবে। অন্য কোন কথা নয়, আমেদাবাদের ইতিহাস আর শহরের ঐতিহাসিক তথ্য। অন্য জায়গার কথা ধীরেসুস্থে পড়ে নেব।

কিন্তু স্টেশনে লিফ্‌টের সামনে এসে মনে হল যে এই সব কাগজপত্র নিয়ে নিজেদের ঘরে যাওয়া উচিত হবে না। স্বাতি

তখনই আমাকে আক্রমণ করবে, ব্যর্থ করে দেবে আমার বাহাদুরী নেবার চেষ্টা। তাই তেতলায় না গিয়ে আমি দোতলায় উঠে রিটায়ারিং রুমের অফিস-ঘরে কাগজপত্রগুলি গচ্ছিত রাখলুম। বললুম: পরে এসে নিয়ে যাব।

আর তারপরে তেতলায় উঠবার আগে অন্য ধারের রিফ্রেশমেণ্ট রুম একবার ঘুরে দেখে এলুম।

স্নান সেরে মামা বোধহয় আমার অপেক্ষাই করছিলেন। বললেন: যাক, ফিরেছ তাহলে!

কেন, আমি কি ফিরব না ভেবেছিলেন?

প্রায় তাই। তোমার মর্জি বোঝা তো আমার কর্ম নয়।

দূর থেকে স্বাতি বলল: কোন্ রাজ্য জয় করে এলেন, তা জিজ্ঞেস করলেন না বাবা!

মামা বললেন: সে কথা কি আর বলবে!

সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরে মামী বেরিয়ে এলেন, বললেন: আর দেরি নয়, চল খেতে।

বললুম: রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ভাল মাছ রেঁধেছে আজ। বলে এসেছি রাখতে।

আহারের পর ফিরে এসে আমি পাশের ঘরে চলে যাব ভেবেছিলুম। কিন্তু মামা বলে উঠলেন: ওধারে যাচ্ছ কেন?

ঠিকই সন্দেহ করেছিলুম আমি। একখানা আরাম চেয়ারে বসে পাইপ ধরিয়েই তিনি বললেন: গোপাল না বললে কোনও জায়গার হালচাল ঠিক বোঝা যায় না।

স্বাতি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল: আর কী চাই গোপালদা, শুরু কর এইবারে।

মামী বিছানায় বসলেন, আর স্বাতি নিজে আমাদের কাছে এসে বসল। পুরনো কথা শোনবার আগ্রহ তার কম নয়, কিন্তু কথায় আগ্রহ সে প্রকাশ করবে না। বললুম:

আমেদাবাদের কথা জানতে হলে হরাপ্পা সভ্যতার কথাও জানতে হবে।

সে তো ইতিহাসের আগের কথা।

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু স্বাতি বলে উঠল: তারও আগের কথা বলবে না? বেদ উপনিষদ বা রামায়ণ মহাভারতের কথা?

বললুম: ভৃগুকচ্ছের কথায় সে কথাও বলব।

খাবার পরে মামা বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেন না, বললেন: যা বলবার, তুমি তাড়াতাড়ি বল।

বললুম: আমেদাবাদ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে লোথাল নামে একটি জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে ভারত স্বাধীন হবার বছর সাতেক পরে। জানা গেছে যে মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হবার অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত হরাপ্পা সভ্যতা এই লোথালে বর্তমান ছিল। শুধু লোথালে নয়, নানা জায়গায় এই সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবের দু জায়গায়, রাজস্থানের প্রায় কুড়ি জায়গায় আর এই গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের প্রায় পঞ্চাশ জায়গায়। কিন্তু এক লোথাল দেখেই আমরা বলতে পারি যে সিন্ধুর সভ্যতা এদেশে বর্তমান ছিল খ্রীষ্টের জন্মের ছ শো বছর আগে পর্যন্ত।

মামা খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন: মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার নাম আমি শুনেছি, কিন্তু লোথাল নাম এই প্রথম শুনলুম।

বললুম: গুজরাতী ভাষায় লোথ মানে মৃত। তার অর্থ হল এই যে মহেঞ্জোদারোর মানে যা, লোথালের মানেও তাই। এই মৃত শহরটি দেখতে এখন অনেক টুরিস্ট সেদিকে যায়। মাটি খুঁজে একটি বন্দর বেরিয়েছে—জাহাজ ভেড়াবার ডক।

মামা বললেন: সমুদ্রের ধারে নাকি?

বললুম: না। এর ধারে কাছেও এখন সমুদ্র নেই। তবে মনে হয় যে এই সবরমতী নদীর মোহনার কাছে এই বন্দরটি ছিল।

সমুদ্রগামী জাহাজ নদী বেয়ে এই বন্দরে এসে ভিড়ত। ইটের তৈরি ডক ইয়ার্ডটি সাত শো দশ ফুট লম্বা, আর চওড়া এক শো ষোল ফুট, আর দেওয়ালের উচ্চতা হবে চোদ্দ ফুট। এই বন্দর থেকে যে মিশর মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আর কী পাওয়া গেছে?

বললুম: মাটি খুঁড়ে পথ ঘাট দোকান বাজার ঘর বাড়ি, এমন কি কবর খুঁড়ে জোড়া মৃতদেহও পাওয়া গেছে।

জোড়া মৃতদেহ কেন?

সতীদাহের মতো ব্যবস্থা ছিল কি না জানা যায় নি। তবু এটা অনুমান করা গেছে যে কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর পিতা ছিল। পথ ঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা ছিল। ঘরের সঙ্গে বাথরূম, জল নিকাশের নালা, নানা যন্ত্রপাতি, সিলমোহর। সব কিছু বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার।

মামা বললেন: তবে তুমি আমেদাবাদ শহরের কথাই বল, যা দেখলুম তারই কথা।

বললুম: শহরের নাম আমেদাবাদ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে মুসলমানদের আগে এখানে কিছু ছিল না, তাহলে খুব ভুল হবে। এক সময় এই শহরটি ছিল ভীল রাজাদের অধীন, আর তখন তার নাম ছিল আশাবন। আশাবন নামটি এখনও এই শহর থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দস্তুর খানের মসজিদের কাছে একটি উঁচু টিলা আছে এই নামে। ভীল সর্দার আশার দুর্গ ছিল এইখানে। আশা ভীলের নামেই এই জায়গার নাম হয়েছিল আশাবন।

এদিকেও ভীলদের বাস আছে নাকি?

বললুম: শুধু ভীল নয়, ডাঙ্গি মোদিয়া প্রভৃতি নামের আদিবাসীও আছে।

মামা বললেন : তারপর ?

বললুম : তারপর এই ভীলদের পরাস্ত করে রাজা কর্ণদেব এই শহর অধিকার করেন দশম শতাব্দীতে। তখন তার নাম হয় কর্ণবতী। অনহিলবাড় রাজাদের আমলে এই স্থানটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তারও পরে বোধহয় রাজনগর নাম হয়েছিল। আমেদাবাদ নামও নতুন নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আহমদ শাহ যখন এই শহর অধিকার করেন, তখন এর নাম হয় আহমদাবাদ। সেই আমলের অনেক কীর্তি আজও এখানে দর্শনীয় হয়ে আছে।

মামা বললেন : সত্যি নাকি ?

বললুম : সে কথা পরে বলব। আগে ইতিহাসের কথা বলে নিই। আহমদ শাহর ঠাকুরদা মুজফ্ফর খাঁ ছিলেন গুজরাতের শাসনকর্তা। তাঁর ছেলে তাতার খাঁ বিদ্রোহী হয়ে বাপকে আশাবনে বন্দী করে মুহম্মদ শাহ নামে নিজেই শাসনকর্তা হন। কিন্তু কিছু কাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর মুজফ্ফর খাঁ আবার সিংহাসনে বসেন। আহমদ শাহ এঁরই নাতি। রাজপুত ও মালবের রাজাকে পরাজিত করে ইনিই সমগ্র গুজরাত অধিকার করেন। আর তাঁর সময়েই আমেদাবাদ স্বাধীন গুজরাতের রাজধানী হয়।

স্বাতি বলল : তারপর ?

আমি বললুম : তার পরের কথা সংক্ষেপে বলছি। এই বংশের শ্রেষ্ঠ হলেন মামুদ বেগড়া। ইতিহাসে বাহাদুর শাহর নাম আমরা পড়েছি। দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ নয়, হুমায়ুনের সঙ্গে যিনি লড়েছিলেন সেই বাহাদুর শাহ। অল্প কিছু দিনের জন্যে হুমায়ুন কেড়ে নিয়েছিলেন এই আমেদাবাদ। তার পরে আকবর আবার অধিকার করে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। জাহাঙ্গীর এই শহরের নাম কী দিয়েছিলেন জান তো ?

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: জানি নে।

বললুম: গর্দাবাগ। বাদশাহ হবার আগে তিনি এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। আর তাঁর বদনাম ছিল যে নূরজাহান বেগমই সব কাজ চালাতেন।

কিন্তু জাহাঙ্গীর গর্দাবাগ কেন বলতেন?

বললুম: গর্দা মানে তো ধুলো। বোধহয় ধুলোর রাজ্য ছিল এই শহর। কিন্তু ইংরেজ রাজদূত টমাস রো এসে অন্য কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে it was a goodly city as large as London, the handsomest town in Hindustan, perhaps the world. এ ঘটনা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: বল কি গোপাল!

বললুম: তা না হলে নূরজাহান বেগমকে নিয়ে জাহাঙ্গীরই বা আসবেন কেন? আর তাঁদের পর মমতাজ মহলকে নিয়ে শাজাহানও এখানে আসতেন না! আজ যে শাহীবাগ দেখলেন ওটি শাজাহানের তৈরি, বাদশাহ হবার পরে আবার তিনি এখানে এসেছিলেন। শাহীবাগে শুনেছি দুটি প্রাসাদ আছে। আর সুড়ঙ্গ পথে এই দুটি প্রাসাদ নাকি সেকালে যুক্ত ছিল। কিন্তু আর একটি কথা না বললে এই শাহীবাগের কথা বলাই হবে না।

স্বাতি কৌতূহল নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললুম: ইংরেজের আমলে কমিশনাররা এই শাহীবাগে বাস করতেন, আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতে কয়েক বছর কাটিয়েছেন। তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, বিলেত যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে ছিলেন, আর তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে এই প্রাসাদটিই স্থান পেয়েছে।

স্বাতি বিশ্বাস করল না আমার কথা, বলল: এ তোমার তৈরি গল্প।

আমি বললুম : আমার তৈরি নয়। এই কথা আমি বই পড়ে বলছি।

মামা বললেন : তারপর ?

বললুম : টমাস রো'কে জাহাঙ্গীর বাদশাহ বাণিজ্য ও বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন, আর ঠিক দু শো বছর পরে বরোদার গায়কোয়াড় ইংরেজের হাতে এই আমেদাবাদ ছেড়ে দিয়ে দাভয় নামে একটি পরগণা লাভ করেন। মোগলদের কাছ থেকে মারাঠারা কেড়ে নিয়েছিল আমেদাবাদ। পুনার পেশোয়া নিজের অংশ পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিতেই গাইকোয়াড় তা ইংরেজকে দিয়ে দিলেন। আমেদাবাদে উত্থানপতন চলছিল। ইংরেজের হাতে পড়বার পর থেকে ক্রমান্বয়ে এর উন্নতি হয়েছে।

মামা হাই তুললেন একটা। আর তাই দেখে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করবার জন্যে বললুম : এক দিন বাণিজ্যের প্রয়োজনে জন্ম হয়েছিল লোথালের। সেই প্রাগৈতিহাসিক বন্দর বিলুপ্ত হবার পরে আমেদাবাদ জেগে উঠেছিল। লোথালের মতো প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি হয় এখানে, বিদ্যুৎচালিত প্রথম কাপড়ের কল বসেছে এইখানে। কিন্তু রাজধানী যেমন স্থায়ী হয় নি, তেমনি আমেদাবাদ আর গুজরাতের রাজধানী থাকবে না।

কেন ?

বলে মামা আমার দিকে চাইলেন।

বললুম : স্বাধীন ভারতে গুজরাত রাজ্যের জন্ম হয়েছে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। আর আমেদাবাদ থেকে গান্ধীনগরে রাজধানী স্থানান্তরের কাজ পুরোদমে চলছে।

গান্ধীনগর আবার কোথায় ?

বললুম : এখান থেকে পনর মাইল দূরে সবরমতী নদীর তীরে নূতন শহর তৈরি হচ্ছে। সেক্রেটারিয়েটের নাম হবে সর্দার ভবন। এই রাজধানী তৈরির জন্যে খরচ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা।

আমেদাবাদের কী হবে?

আমেদাবাদ আমেদাবাদই থাকবে। আমেদাবাদকে চিরকালই লোকে কারখানার শহর বলত, তাই টুরিস্টদের কাছে এর কোন আকর্ষণ ছিল না। গুজরাত সরকার সেই ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করছেন। এমন একটি ঐতিহাসিক শহরকে লোকে ভুল বুঝবে তা হতে পারে না।

মামা বললেন: কিন্তু ভুল তো বুঝবেই। এই যে চার ঘণ্টা ধরে ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালো, তাতে এর কিছুই তো বোঝা গেল না।

বলে তিনি অ্যাশ ট্রেতে তাঁর পাইপ ঠুকে ঠুকে ছাই ঝাড়তে লাগলেন।

বললুম: এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কবে কে কেন নির্মাণ করেছিলেন, তা না জানলে এখানকার গৌরবের দিনগুলি বোঝা যাবে না।

স্বাতি তাড়াতাড়ি বলল: এখন এ কথা থাক গোপালদা, বিকেলে চা খেতে খেতে এ সব শুনব।

বলে সে উঠে দাঁড়াল।

বোধহয় আমার জন্যেই মামী এতক্ষণ শুতে পারছিলেন না। এইবারে বললেন: তুমি আর বেরিয়ো না স্বাতি, এই ঘরেই একটু বিশ্রাম কর।

মামা বললেন: গোপালও একটু ঘুমিয়ে নাও।

আচ্ছা।

বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

৫

মামার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি পাশের ঘরে ঘুমোতে গেলুম না। নিচে গিয়ে টুরিস্ট অফিসের কাগজপত্রগুলি সংগ্রহ করে আনলুম। তারপর খাটে শুয়ে মনোযোগ দিয়ে সেগুলি পড়ে ফেললুম, আর ঘুমোবার আগে লুকিয়ে রাখলুম সযত্নে। আমি জানতুম যে সুযোগ পেলেই স্বাতি এসে আমাকে দেখে যাবে। একটু আগে যেসব কথা শোনালুম, সেসব কোথায় সংগ্রহ করেছি তা জানবার চেষ্টাও সে করবে। কিন্তু চায়ের টেবিলে তাকে আরও চমকে দেব বলে আমি বদ্ধপরিকর হয়ে রইলুম।

আমি বোধহয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম। বিকেল বেলায় স্বাতি আমাকে ঠেলে তুলল। বলল: এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলেই চলবে বুঝি?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

স্বাতি হেসে বলল: বাবা জিজ্ঞেস করছেন, আমরা কি আমেদাবাদেই থাকব?

বললুম: হুকুম হলেই যাত্রা করব।

নাও, আর সময় নষ্ট কোরো না। চোখে মুখে জল দিয়ে চলে এস। চা আসছে।

বলে স্বাতি বেরিয়ে গেল।

আমি যখন তাদের ঘরে এলুম, তখন সে আমার কথাই বলছিল মামা মামীকে: কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম গোপালদার। ডাকাডাকিতে ঘুমই ভাঙল না।

তারপরেই যেন চমকে উঠল আমার পায়ের শব্দ শুনে, বলল: যাক, বাঁচা গেল। যাবার কথা এবারে গোপালদাই ভাববে।

মামা বললেন : গোপাল অসহযোগ করেছে—ননকো-অপারেশন। ওকে ফিরতে দেওয়া হয় নি বলে আমাদের ফেরার কথাও ভাববে না। তাই না?

আমি লজ্জা পেয়ে বললুম : ফেরা তো নয়, এগিয়ে যাবার কথা। আজ রাতেই যাত্রা করবেন না নিশ্চয়ই!

মামা বললেন : এমন সুন্দর ঘর৷ পাওয়া গেছে, একটা রাত না হয় থাকাই গেল। কী বল?

বলে তিনি মামীর দিকে তাকালেন।

কিন্তু স্বাতি বলল : আজ রাতের গাড়িতে উঠলে কাল সকালেই আমরা বম্বে পৌঁছতে পারতাম।

আর আমি বললুম : আর কাল সকালের গাড়িতে উঠলে সব দেখতে দেখতে যেতে পারতুম। ইচ্ছে হলে—

বলে থেমে গেলুম আমি।

আর মামা তখনই জিজ্ঞাসা করলেন : আরও কোথাও নামবার মতলব আছে নাকি?

বললুম : মতলব নেই। তবে নামবার মতো জায়গা আছে। বরোদা সুরাত—

স্বাতি বলল : তবু ভাল যে ভৃগুকচ্ছের নাম কর নি।

বললুম : তাহলে ডাকোরের নামও করতে হয়।

মামা বললেন : দাঁড়াও দাঁড়াও, এক সঙ্গে অত নাম করলে সব গুলিয়ে যাবে। আগে আমেদাবাদের কথাই শেষ কর। চা আসছে তো?

স্বাতি উত্তর দিল : আসছে।

মামা পাইপ ধরাচ্ছিলেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখে নেবার পরে বললেন : মুসলমান আমলের আগে এখানে হিন্দু রাজত্ব ছিল বলেছিলে। সে যুগের কী দেখবার আছে তাই বল।

বুঝতে পারলুম যে আজ রাতে এইখানেই থাকতে হবে.

বেড়াতে বেরোবারও বোধহয় কারও ইচ্ছা নেই। তাই কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বললুম: আজ সকালে আমরা যে জায়গায় গিয়েছিলুম, তার নাম লাল দরোয়াজা, দরজাটি ভদ্র কেল্লার। ভদ্র নাম শুনেই বোঝা যায় যে এটি হিন্দু নাম। এখানেই আছে ভদ্রকালীর মন্দির। অনিহালবাড় পাটনেও ছিল এই নামের একটি দুর্গ, তাই এটিকে হিন্দু রাজার তৈরি বলেই মনে হয়। কিন্তু আহমদ শাহ এই দুর্গ জয় করে নানা উন্নতি সাধন করেছিলেন বলেই বোধহয় অনেকের ধারণা যে দুর্গটি তাঁরই তৈরি।

মামা বললেন: মেনে নিলুম তোমার যুক্তি। এবারে আর কিছু আছে কিনা বল।

স্বাতি ভেবেছিল বোধহয় আর কিছু বলতে পারব না। তাই বলল: হিন্দু রাজাদের আর কিছু না থাকলে মুসলমান সুলতানদের কথাই বল।

বললুম: মাতা ভবানীর কথা বলবার পরে আহমদ শাহর কথা বলব।

কোন দেবীর নাম নাকি?

বলে মামী আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: না, মাতা ভবানী একটি কূপের নাম, এরা বাপী বা বাওলি বলে। কিন্তু এ জিনিস নিজের চোখে না দেখলে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।

কেন?

শুনেছি যে আমেদাবাদের এ একটা বৈশিষ্ট্য। এ রকম বাওলি এ দেশের আর কোথাও নেই। আমেদাবাদের নাম যখন কর্ণবতী, তখন এখানে কয়না শোলাঙ্কি নামে চালুক্য রাজা ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর দিকে তিনি এই বাওলি নির্মাণ করেছিলেন।

মামা বললেন: তোমার কথা একটু ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে গোপাল, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

ঠিক এই সময়ে দরজায় টোকা দিয়ে বেয়ারা ঘরে এল। তার হাতে চায়ের ট্রে। স্বাতি হাত বাড়িয়ে বলল : এই টেবিলে দাও।

আর আমাকে বলল : তুমি বলে যাও গোপালদা।

বললুম : বাওলির ভিতরে বাহান্নটা সিঁড়ি দিয়ে জলের ধার পর্যন্ত নেমে যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বসবার জায়গাও নাকি আছে। প্রবেশপথে সুন্দর স্থাপত্য, আর মাথার ওপরে গম্বুজের ছাদ। এ জিনিস না দেখলে কি বোঝানো যায়!

মামা বললেন : তবে দেখালে না কেন!

মামী বললেন : দেখাবে কখন! তোমরা তো ঘুমিয়েই তুপুরটা কাটালে!

মামা পাইপ নামিয়ে রেখে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। বললেন : তাহলে তার পরের কথা বল।

স্বাতি বলল : সংক্ষেপে বল গোপালদা, চা খেয়েই আমরা বেরোব।

বললুম : আহমদ শাহ্ এই ভদ্রকিলার ভিতরে নিজের প্রার্থনার জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এই তুর্গ জয় বা নির্মাণের বছর তিন পরে, মানে ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্গের ভিতরে প্রাসাদটি কিন্তু তু শো বছর পরে আজম খান তৈরি করেন।

স্বাতি বলল : কোন্ প্রাসাদ দেখি নি তো?

বললুম : প্রাসাদে এখন পোস্ট অফিস হয়েছে। জানলায় পাথরের জালির যে মসজিদটি আমরা দেখলুম, তার নাম সিদি সৈয়দের মসজিদ। আহমদ শাহর একজন দাস এই মসজিদটি তৈরি করে।

দাসের এত পয়সা?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : বলতে ভুলে গেছি, মাতা ভবানীর বাওলির কাছে আরও একটি সুন্দর বাওলি আছে, তার নাম দাদাহরির বাওলি।

দরিয়াপুর গেট থেকে আধ মাইল দূরে আসরভা রেল স্টেশনের কাছেই এই দুইটি বাওলি। সুলতানের একজন দাইএর স্বামীর নাম দাদাহরি। সেখানে গেলে দেখা যাবে যে তার রৌজা আছে, মসজিদ আছে, আর আছে সেই বাওলি।

আমার হাতেও চায়ের পেয়ালা এসেছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে আমি বললুম: আহমদ শাহর মসজিদের পশ্চিমে আছে মানিক বুর্জ। মানিক পীরের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। নগরের চারিদিকে যে প্রাচীর, সেই প্রাচীর তিনি তুলতে দেবেন না। যোগবলে মজবুত দেওয়ালেও ফাটল ধরিয়ে দিলেন। তারপর নাকি তাঁকে খাঁচায় বন্ধ করে এই প্রাচীর তৈরি সম্পূর্ণ হয়, আর তারই স্মৃতির জন্যে আহমদ শাহ এই বুর্জ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানিক পীরের নাম আমেদাবাদ থেকে কোন দিন মুছে যাবে না।

কেন?

বললুম: শহরের মাঝখানে হল মানিক চক। আহমদ শাহ ও রাণীদের সমাধি দেখতে হলে জামি মসজিদ বা তিন দরোয়াজা দেখতে হলে এই মানিক চকে যেতেই হবে। আমেদাবাদের জমজমাট জায়গা ছিল এই মানিক চক।

মামা বললেন: তুমি আবার তিন দরজা কোথায় পেলে?

বললুম: রাস্তার ওপরে পাশাপাশি তিনটি গেট, এই গেট পেরিয়ে ভদ্রকিলার বহিরাঙ্গন। আহমদ শাহই এটি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এই দরজার ওপর থেকে শোভাযাত্রা দেখতেন।

স্বাতি তার ঘড়ির দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে ঘরে বসে সময় নষ্ট না করে সে বেরোবার কথা ভাবছে। তাই আহমদ শাহর কথা শেষ করে মামুদ বেগড়ার কথা বললুম। তাঁর কীর্তি আছে সরখেজে।

স্বাতি বলল : সরখেজে তো আমাদের যাওয়া 'হল না, রাস্তা খারাপ। সেখানে কী দেখবার আছে বল তো ?

বললুম : এলিস ব্রিজের ওপর দিয়ে সবরমতী নদী পার হও। পুল পেরোবার আগে উত্তরে মানিক বুর্জ দেখ, আর দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার একটা বসা মূর্তি আছে বাগানে। তারপরে আধ মাইল চওড়া নদী পার হয়ে দক্ষিণের পথ ধর। মনে থাকলে দক্ষিণের দিকে চেয়ে দেখো—পুরনো পুল দেখতে পাবে—প্রায় এক শো বছর আগে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল সেই পুল। রেলের পুল ছিল, গাড়িঘোড়ার জন্যেও পুল ছিল। কিন্তু সেসব দেখবার জন্যে দাঁড়াবার দরকার নেই। মাইল আড়াই গিয়ে আজম ও মুয়াজ্জমের কবর দেখতে পাওয়া যাবে। এই দুজন শিল্পী খোরাসান থেকে এখানে এসে সরখেজ নির্মাণ করেছিল।

স্বাতি তাড়া দেবার জন্যে বলল : তারপর ?

বললুম তারপর সরখেজ। সেখানে পৌঁছবার আগে দুটি টাওয়ার ফুট তিরিশেক উঁচু। দুটি খিলেনের নিচে দিয়ে সরখেজের অঙ্গনে পৌঁছতে হবে। বাঁ দিকে মামুদ বেগড়া ও তার ছেলেদের সমাধি। আর জলাশয়ের ধারে রাণী রাজাবাঈএর আর একটি সুন্দর সমাধি।

মামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : মামুদ বেগড়ার রাণী নাকি ?

বললুম : তাই মনে হয়। আমেদাবাদে বেগম কথাটির প্রচলন নেই। অথচ রাণী কথার ছড়াছড়ি। রাণী সিপ্রির মসজিদও একটি দর্শনীয় স্থান। এই রাণীর নাম ছিল রাণী অসনি, মামুদ বেগড়ার রাণী। অসনি নামটি অশ্বিনী বা ঐ ধরণের কিছু কিনা, তা বলতে পারব না। এ ছাড়াও মির্জাপুর নামে এক পাড়ায় রাণীর মসজিদ আছে।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : তুমি সরখেজের কথাই আগে শেষ কর :

বললুম : ডান দিকে শেখ আহমদ খত্রি গঞ্জ বকস্‌ নামে এক সাধুর সমাধি, সুলতান আহমদের গুরু ছিলেন তিনি। আনহিল্‌-বাড়ায় থাকতেন, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এইখানে। সমাধির সঙ্গে লাগোয়া একটি মসজিদ আছে। মামুদ বেগড়ার বড় কীর্তি হল একটি বিরাট পুষ্করিণী, তার চারি ধার বাঁধানো। তার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তৈরি করেছিলেন নিজের প্রাসাদ ও বেগমদের হারেম। এই জায়গায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল হিন্দু স্থাপত্যের প্রাধান্য।

কী রকম ?

বলে মামা সোজা হয়ে বসলেন।

আমি বললুম : মুসলমানেরা হিন্দুকীর্তি নষ্ট করেছে অনেক। কিন্তু সেসব ফেলে দিতে পারে নি। নিজেদের মসজিদে বা বাসগৃহে এনে ব্যবহার করেছে ভাল ভাল পাথরের টুকরো। আর আমেদাবাদের স্থাপত্য একেবারে নতুন ধরণের জিনিস, হিন্দু নয়, আবার খাঁটি মুসলমানও নয়। এর নতুন নাম হয়েছিল ইণ্ডো-সেরাসিনিক। হিন্দু স্থপতিরাই নির্মাণ করেছিল বলে বোধহয় এই নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

স্বাতি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বলল : তাড়াতাড়ি বেরোতে না পারলে আর কিছু দেখা যাবে না।

মামী বললেন : দেখবে আর কী ?

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : আর কিছু দেখবার নেই গোপালদা ?

বললুম : আছে। পিঁজরাপোল আছে, পরবদিস আছে।

মামা বললেন : সে আবার কী ?

বললুম : জন্তু-জানোয়ারের থাকবার জায়গা, আর জৈনদের পাখি খাওয়াবার জায়গা।

স্বাতি বলল : তুমি তৈরি হয়ে নাও মা। গোপালদার কথা আর শেষ হবে না।

বলে নিজেও তৈরি হতে গেল মামীর সঙ্গে। কিন্তু মামা মোটেই ব্যস্ত হলেন না। বললেন: তোমার গল্প শুনতেই ভাল লাগছে।

আমি বললুম: কাঙ্কারিয়া তালাও নিয়েও একটা গল্প আছে।

বল।

বললুম: কাঁকর থেকে কাঙ্কারিয়া। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কুতব উদ্দীন এই তালাও খনন করছিলেন, আর বাগান তৈরি করবেন তার ধারে। প্রায় গোলাকার হবে, চৌত্রিশ কোণা, পরিধি হবে এক মাইল। সুলতানের গুরু শাহ আলম এলেন এই তালাও খোঁড়া দেখতে। কিন্তু কাঁকর ফুটল তাঁর পায়ে। আর কথা কী, সঙ্গে সঙ্গে এর নাম হয়ে গেল কাঙ্কারিয়া তালাও।

বেশ গল্প!

বলে মামা তাঁর নেবা পাইপ ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন।

আমি ভেবেছিলুম যে হয়তো কোন দর্শনীয় স্থানে যেতে হবে। কিন্তু মামী রাজী হলেন না। বললেন: অবেলায় আর কবর-টবর দেখতে হবে না। তার চেয়ে বাজারে চল।

মামা গম্ভীরভাবে বললেন: তুমি কোন কাজের নও গোপাল। এত বড় কলের শহর আমেদাবাদ! আর তুমি শাড়ির দোকানের কথা বললে না।

বলে হাসতে হাসতেই তিনি উঠে পড়লেন।

স্বাতি হাসল, কিন্তু আপত্তি করল না কোন। বেয়ারাকে চায়ের পয়সা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

৬

শাড়ির বাজার নাকি রিলিফ রোডে ভাল—কৃষ্ণা থিয়েটারের কাছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা এইখানে এসে নামলুম। কয়েকটা দোকানেও ঢুকে দেখলুম। কিন্তু নিরাশ হলেন মামী। তাঁর পছন্দ মতো কোন জিনিসই পাওয়া গেল না। স্বাতি আগেই বলেছিল: শাড়ি হল কলকাতায় নিউ মার্কেট আর বালিগঞ্জ। কলকাতার লোক যে কেন বাইরে শাড়ি দেখে তা বুঝি না।

উত্তরে মামী বলেছিলেন: এই তোমাদের দোষ। কলকাতার বাইরে কি মানুষ নেই, না তাদের কোন পছন্দ নেই।

স্বাতি বলেছিল: আছে। কিন্তু সে পছন্দ আমাদের মতো নয়।

প্রথমটায় মামী এ কথা মেনে নেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। হেঁটে হেঁটে কয়েকটি দোকানে ঢুকে বেরিয়ে আসবার পরে বলেছিলেন: চল।

মামা আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন: চল তাহলে।

কিন্তু কোথায়!

দিনের আলো আর নেই, বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে চারিদিকে। এখন আর শহর দেখার সময় নেই, এখন কোথাও বিশ্রামের জন্যে বসতে পারা যায়। কিন্তু সে রকম কোন জায়গার কথা আমার জানা ছিল না। সমুদ্র নেই যে সমুদ্রের ধারে যাব, বড় কোন মন্দির নেই যে আরতি দেখতে নিয়ে যাব মামীকে। লাল দরোয়াজার কাছে মিউনিসিপ্যাল পার্কে যেতে ইচ্ছে হল না, ইচ্ছে হল না সবরমতীর ধারে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে যেতে। সকালে আমরা বালবাটিকাও দেখে এসেছি, কাঙ্কারিয়া লেকের মায়া এখন

নেই। আমি তাই যাবার জায়গা ভেবে না পেয়ে স্বাতির দিকে তাকালুম। স্বাতি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরে বলল: স্টেশনেই ফিরতে হবে।

ভারি শরীর নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে মামা বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন তাই চল। ফেরার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।

স্বাতি বলল: ফেরার ব্যবস্থা নয় বাবা, এগোবার ব্যবস্থা। গোপালদা সোজা বম্বে নিয়ে যাবে, না নামতে বলবে মাঝপথে, তা এখনও বলে নি।

মামা বললেন: তবে স্টেশনে ফিরে সেই কথাই স্থির করা যাক। একখানা ট্যাক্সি ধর না গোপাল।

কিন্তু ট্যাক্সি নেই, অটোরিক্সাই ছুটোছুটি করছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলল: দুখানা অটোরিক্সাই ধরা যাক।

বলে দুখানা দাঁড় করিয়ে ফেলল। আর মামা মামীকে একখানায় তুলে দিয়ে নিজে উঠল আর একখানায়। বলল: এস গোপালদা।

কাজটা ভাল হল কিনা ভেবে দেখবার সময় ছিল না। আমি উঠতে স্বাতি বলল: সোজা স্টেশনে চল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে স্বাতি বলল: তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করবার জন্যে এই ব্যবস্থা করলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: আমার সঙ্গে পরামর্শ!

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে স্বাতি বলল: হুঁ।

পথে তখন জনস্রোত চলেছে। দু ধারের দোকানপাট খোলা, আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। দু ধারের ফুটপাথ ধরে লোক চলছে, পথে যানবাহন। গাড়ি ছুটিয়ে চলবার উপায় নেই, ঘন ঘন থামতে হচ্ছে ভিড়ের জন্যে। মামা মামীর গাড়ি খানিকটা এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বললুম: বল কী বলবে।

স্বাতি বলল : সোজা বম্বে যাবে, না পথে নামবে কোথাও ?

হেসে বললুম : এই পরামর্শ!

স্বাতি বলল : হাসি নয় গোপালদা, আমি খুব সীরিয়াস।

তা তো বুঝতেই পারছি।

কিন্তু স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : না, বুঝতে পার নি। তুমি দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ কেন তা বুঝতে পেরেছি। চাকরির ব্যাপারটা তোমার আসল কথা না হলেও খানিকটা বিবেচনার কথা। আর কটা দিন আমাদের সঙ্গে নিরাপদে কাটাতে পারবে বল তো ?

বম্বে পৌঁছলে আর নিরাপদ ভাবতে পারব না।

তামাসা নয়, বম্বের দায়িত্ব আমার ওপরে ছেড়ে দাও। তোমার হাতে যদি সত্যিই সময় কম তো পথে কোথাও নামব না, সোজা বম্বে চলে যাব।

বললুম : তবে তাই কর।

স্বাতি বলল : তবে বরোদা সুরাত, আর কী বলেছিলে, সে সব জায়গা দেখার সুযোগ বোধহয় আর পাওয়া যাবে না।

বললুম : ক্ষতি নেই তাতে। বরং সুযোগ হলে পুনা শহরটা দেখে নেওয়া যাবে।

তোমার চাকরির কী হবে ?

হেসে বললুম : যেতে যেতেও থেকে যাবে। সরকারী চাকরি হলে তো যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, বেসরকারী চাকরির হালও খারাপ হয়েছে। আমার জায়গায় হাজার লোক পাবে, কিন্তু কাজ করবে এমন লোক হয় তো পাবে না। চাকরিতে আজকাল কাজ না করারই চেষ্টা, কাজ চাইলেই ধর্মঘট।

স্বাতি বলল : গত পুজোয় বিপদে পড়েছিলে নাকি ?

তা পড়েছিলুম বৈকি। কিন্তু তার জন্যে আপসোস করি নি। গোটা দক্ষিণ ভারতটাই শুধু দেখা হয় নি। জমার খাতায় যা জমা

পড়েছে তাই ভাঙিয়ে অনেক দিন খেতে পারব। তেমনি এ যাত্রাতেও জমা পড়ছে অনেক।

স্বাতি বলল: তোমার চাকরি গেলে বাবা খুশী হন বলছেন, কিন্তু আমি হই না।

কেন?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, বলল: কেন, তা তুমি জান। আর—

বল।

না, থাক এসব কথা।

বলে সে বাকি পথটুকুতে একটি কথাও বলল না। স্টেশনে এসে যখন সে নামল, তখন তার মুখ দেখে মনে হল যে বিষম বিরাগে সে গম্ভীর হয়ে আছে। মামী তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না।

মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ট্রেনের খোঁজখবর নিয়েই কি ওপরে উঠবে?

স্বাতি উত্তর দিল, বলল: টাইম টেবল দেখে ঠিক করব।

টাইম টেবল দেখেই আমরা বম্বে যাবার ব্যবস্থা করলুম। সকাল সাড়ে ছটায় ছাড়ে গুজরাত এক্সপ্রেস, আর বম্বে পৌঁছয় বিকেল পাঁচটার পর। মামার পছন্দ হল এই ট্রেন। বললেন: এতেই চল। একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, কিন্তু উপায় নেই। দেরিতে পৌঁছলে আবার অন্য হাঙ্গামা।

কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি। বেড়াতে বেরিয়ে ভোর বেলায় ওঠার কোন কষ্ট নেই। সময় মতোই ঘুম ভেঙে যায়, তৈরি হয়ে নেওয়া যায় সময় মতো। আর বেরিয়ে পড়লে

সকালে বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে যায়। দেরিতে যাত্রা করলে আনন্দ প্রতিহত হয় অনেক পরিমাণে।

মামী বললেন: ঘরের মধ্যে চায়ের হাঙ্গামা আর কোরো না। গাড়িতে চা নিও। নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবে।

আমরা তাই করলুম। দিনের গাড়িতে রিজার্ভেসনের দরকার আমাদের ছিল না। কিন্তু স্বাতি আমাদের আশ্চর্য করে দিল। মামার কাছ থেকে টাকা নিয়ে টিকিট কাটতে গিয়ে দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট আর তিনখানা থার্ড ক্লাস টিকিট কেটে বসল। বাধা দিয়েছিলুম আমি। কিন্তু সে মানে নি, বলেছিল: অকারণে পয়সা খরচ কেন করাবে? ওঁরা বুড়ো মানুষ, হয়তো দুপুরে একটু গড়াবেন। তাই বলে আমাদের কী দরকার?

আমি বললুম: মামী খুব রাগ করবেন।

উত্তর না দিয়ে স্বাতি এমন একটা ভঙ্গি করল যে আমি আর কিছু বলবার সাহস পেলুম না।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমেদাবাদ থেকেই এই ট্রেন ছাড়ে। মালপত্র তুলে দিয়ে মামা মামীকে স্বাতি তুলে দিল। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইল নিচে। তারপরেই হঠাৎ তার ব্যাগ খুলে বলল: তোমাদের টিকিট দুখানা রাখো বাবা।

বলে ফার্স্ট ক্লাসের দুখানা টিকিট বার করে মামার হাতে দিল।

মামা খুব সহজভাবে বললেন: তোমরা বুঝি থার্ড ক্লাসে উঠবে?

স্বাতিও তেমনি সহজভাবে বলল: দিনের গাড়িতে শুধু শুধু কেন বাজে খরচ করি!

বলে মামীর দিকে একবার তাকাল।

মামী প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেন নি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝবার পরে প্রবল আপত্তি জানালেন। বললেন: এ কী অলক্ষুণে কথা! না না, এই গাড়িতে এস, বদলে নাও তোমার টিকিট।

কিন্তু-মামা হেসে বললেন : তাড়াতাড়ি উঠে পড় তোমরা, নইলে জায়গা পাবে না গাড়িতে।

স্বাতি আর এক মুহূর্ত দেরি করল না, বলল : এস রাম-খেলাওন।

বলে, আমার দিকে একবার তাকিয়ে এগিয়ে গেল একটা থার্ড ক্লাস গাড়ির দিকে।

তাকে অনুসরণ করে আমি একটা গাড়িতে উঠলুম। রাম-খেলাওন উঠল আমাদের পরে। ভিড় আছে, কিন্তু বসবার জায়গাও পাওয়া গেল। আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। গত বছর আমরা তিরুপতি থেকে মাদ্রাজে যাচ্ছিলুম রেনিগুণ্টা স্টেশনেও স্বাতি ঠিক এই রকম করেছিল। মামা মামীকে ফার্স্ট ক্লাসে তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে উঠেছিল থার্ড ক্লাসে সেদিন তার যুক্তি অন্য রকম ছিল। থার্ড ক্লাসে উঠে আমি নাকি যাত্রীদের সঙ্গে ভাব করি, অনেক জানবার কথা জেনে নিই তাদের কাছে। আর সেই সব কথা তাদের বলে বাহাদুরী নিই। তাই সে আমার সঙ্গে উঠেছিল আমার কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্যে। এবারে অন্য কারণে উঠল। এবারে সে পয়সা বাঁচাবে। কিন্তু স্বাতি আমাকে চুপ করে থাকতে দিল না। বলল : রাগ করলে নাকি ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : রাগ করব কেন ?

মুখ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে!

বলে সে হাসল। এ হাসি তার দুষ্টুমীতে ভরা। দৃষ্টিতেও হাসি। বাক্-চাতুরীর খেলা দেখাবার জন্যে যেন তৈরি হচ্ছে, এমনি ভাব! বললুম : আমার মুখখানাই অমনি!

স্বাতি বলল : তোমার মুখখানা তুমি এক-আধবার দেখ, আমরা দেখি সারাক্ষণ। কাজেই ও যুক্তি মানতে পারি নে।

তার পরেই বলল : চায়ের জন্যে যদি মন খারাপ হয়ে থাকে তো ব্যবস্থা করতে পারি। এই বেয়ারা, এই গাড়িতে আমরা।

বলে প্ল্যাটফর্মের এক বেয়ারাকে ডাকল।

আমি বুঝতে পারলুম যে চায়ের ব্যবস্থাও সে আগে করেছিল। মামা মামীর চা ফার্স্ট ক্লাসে দিয়ে আমাদের খুঁজছিল। জানলার ধারে বসে স্বাতি তাকে দেখতে পেয়েছে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল—টোস্ট আর চা। কোলের উপরে ট্রে নিয়ে স্বাতি বলল : এইবারে মেজাজ প্রসন্ন হবে তো ?

বললুম : না হয়ে আর উপায় কী।

চা খেতে খেতেই স্বাতি বলল : তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনার দরকার ছিল।

বললুম : বল।

স্বাতি বলল : গত বারের দক্ষিণ ভারত নিয়ে তো তোমার চারখানা বই হচ্ছে—অন্ধ্র তামিল কেরল আর কর্ণাট। দিল্লী ভ্রমণ নিয়েও হয়তো একখানা হবে। এবারের এই ভ্রমণে কী হবে বল তো ?

তার আলোচনার বিষয় জেনে আমি হেসে ফেললুম।

স্বাতি ধমক দিয়ে বলল : হাসি নয় গোপালদা, একটু সীরিয়াস হতে শেখ।

প্রচুর গাম্ভীর্য সংগ্রহ করে বললুম : আচ্ছা।

স্বাতি বলল : রাজস্থানের ওপরে একখানা বই হতে পারে, আর একখানা সৌরাষ্ট্র বা গুজরাতের ওপরে। তবে যাই কর, সোমনাথের মন্দিরের সামনে সে বই শেষ কোরো—সেই গরবা নাচের গান দিয়ে।

বললুম : আচ্ছা।

স্বাতি বলল : তাহলে তোমার অসুবিধে হবে একটা। তৃতীয় বই আরম্ভ হবে আমেদাবাদ থেকে। আমেদাবাদ থেকে বম্বে

বা পুনা পর্যন্ত গিয়ে তুমি গুজরাত বলতে পারবে না, মহারাষ্ট্র বলতেও পারবে না। কী নাম দেবে বইএর?

ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়েই আমি বললুম: খুবই চিন্তার বিষয়।

স্বাতি বলল: তামাসা করে উড়িয়ে দিতে পারবে না গোপালদা, ভারি বিপদে পড়বে। আমেদাবাদের কথা না থাকলে সৌরাষ্ট্র বা গুজরাতের কথা অসম্পূর্ণ থাকবে, আবার আমেদাবাদের কথা দিয়ে মহারাষ্ট্রের কথা লিখলে পাঠক চটে যাবে।

তবে তুমিই একটা নাম ঠিক করে দাও।

পারছি না বলেই তো তোমাকে বলছি। কাল রাত থেকে অনেক ভেবেছি।

বললুম: আরব সাগর কিংবা পশ্চিমঘাট নাম দেওয়া যেতে পারে। বিন্ধ্য নামটাও মন্দ নয়।

স্বাতি বলল: নাম ভাল হলেই তো হবে না। বিষয়বস্তুর সঙ্গে মেলা চাই।

তবে এক কাজ করা যাক।

কী?

আমেদাবাদের প্রসঙ্গটা আগেই বলে ফেলি, আর মহারাষ্ট্র শুরু করি বম্বে থেকে।

কিন্তু আমেদাবাদের প্রসঙ্গ আগে বলবে কী করে?

ফ্ল্যাশ ব্যাকে বলা তো চালু আছে, ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডে বলব।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল: উঁহু। ভ্রমণ-কাহিনীতে ওসব চালাকি চলবে না। ওসব মারপ্যাঁচ দেখিয়ো উপন্যাসে।

বললুম: তুমিই একটা উপায় বল।

স্বাতি বলল: একটু দাঁড়াও। গাড়ি ছাড়ে নি এখনও, ট্রেটা নামিয়ে দিতে পারলে প্ল্যাটা ঢুকে যায়। বাইরে বেয়ারা ঘুরঘুর করছে। এই বেয়ারা!

বলে চায়ের পেয়ালা শেষ করে সব কিছু সাজিয়ে রাখল।

অবিলম্বে বেয়ারা এসে উপস্থিত হল। ট্রেটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল : পয়সা ও গাড়িতে নিও।

পেয়ে গেছি।

বলে সে চলে গেল।

স্বাতি বলল : ওকে পয়সা না দিয়ে ও গাড়িতে কেন নিতে বললাম জানো? তা না হলে ত্ব জায়গাতেই পয়সা নিত।

বললুম : খুব সেয়ানা হয়েছ। যার ঘর করবে—

স্বাতি সোজা হয়ে বসল, আর আমি অতর্কিতে থেমে গেলুম।

ট্রেনের ঘন্টা পড়েছিল কিনা শুনতে পাই নি। এইবারে গার্ডের বাঁশি শুনতে পেলুম। তার পরে ইঞ্জিনের বাঁশি। পরক্ষণেই ট্রেন দুলে উঠল একটুখানি। এইবারে চলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্ল্যাটফর্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই আমরা আমেদাবাদের বাইরে চলে যাব।

পাশের এক ভদ্রলোক যে গভীর মনোযোগে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন, এতক্ষণ আমরা তা দেখতে পাই নি। নিজেদের নিয়েই আমরা ব্যস্ত ছিলুম। আর ট্রেন ছাড়বার পরে গাড়ির যাত্রীদের দিকে তাকাতে গিয়েই এই দৃশ্য দেখতে পেলুম। স্বাতি একটু থমকে গেল। বলল : দেখলে, কী ভুল হয়ে গেল

ভুল আবার কী হল ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : কাগজপত্র কিছুই কেনা হল না, এত সময় কাটবে কী করে ?

আমি হেসে বললুম : গল্প করেই সময় ভাল কাটবে।

স্বাতি বলল : অসম্ভব।

অসম্ভব কেন ?

কোনও জিনিসেরই বেশি ভাল নয়। ভাল শিল্পীরা তাই শেষ করার কায়দাটাই আগে শেখে।

আমি বললুম : তবে আমাদের এবারের ভ্রমণও শেষ হওয়া দরকার। আমরা যথেষ্ট ঘুরেছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছ?

এখনও করছি না। তবে তার আর দেরি নেই।

স্বাতি হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল : বম্বে দেখতে আমাদের ক'দিন লাগবে বল তো?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম : কলকাতা দেখতে কদিন লাগে?

তার সঙ্গে বম্বের সম্বন্ধ কী?

বললুম : সম্বন্ধ আছে বৈকি। বড় বড় শহর এক দিনেও দেখা যায়, আবার এক মাসেও দেখে শেষ করা যায় না।

স্বাতি বলল : এলিফেণ্টা আমাদের দেখতে হবে।

আর মালাবার হিল।

অ্যাকোয়েরিয়মও নিশ্চয়ই দেখব।

আর—

বলে আমি সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : আপনারা কি টুরিস্ট?

ইংরেজীতে প্রশ্ন। ইংরেজীতেই আমি জবাব দিলুম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : এর আগে আপনারা বম্বে দেখেন নি বুঝি?

আমি বললুম : না।

ভদ্রলোক বললেন : শহরটি আপনাদের ভাল লাগবে। কিন্তু যতই ভাল লাগুক, বম্বে থেকেই দেশে ফিরবেন না।

আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালুম। আর তিনি তাই দেখে উৎসাহিত হয়ে বললেন : চৌওলে কোম্পানীর জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে গোয়ায় চলে যাবেন। কোঙ্কণ উপকূল দেখতে দেখতে যাবেন, আর গোয়ার

রাজধানী পানাজী দেখে ভ্রমণ সার্থক হয়েছে বলে স্বীকার করবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কত সময় লাগবে?

ভদ্রলোক বললেন: কত আর সময়! যেতে আসতে দুদিন, আর দু-একটা দিন সেখানে থাকবেন।

পরম কৌতূহলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর তার আগ্রহ দেখে আমি তাঁকে বললুম: ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: আজ সন্ধ্যে বেলায় বম্বে পৌঁছবেন তো! কাল সারা দিনে শহরটা দেখে নিন। আর এক ফাঁকে ফেরি হোয়াফে গিয়ে গোয়ার টিকিট কিনে রাখুন। পরদিন সকাল দশটায় জাহাজ ছাড়বে, আর ভোর বেলায় চোখ মেলে দেখবেন যে পানাজীর মাণ্ডবী নদীর কূলে পথের ধারেই জাহাজ ভিড়েছে। জাহাজ থেকে নেমেই হোটেল, আর টুরিস্ট হস্টেল।

স্বাতি বলল: তারপর?

ভদ্রলোক বললেন: ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ুন শহর দেখতে। টুরিস্ট বাস আছে। টুরিস্ট হস্টেলের রিসেপসনিস্টই ব্যবস্থা করে দেবে। দুদিনে সমস্ত গোয়া রাজ্য আপনার দেখা হয়ে যাবে। সমুদ্র নদী পাহাড় দেখবেন একই জায়গায়, পুরনো মন্দির আর চার্চ দেখবেন, মারাঠী আর কোঙ্কণীদের দেখবেন। সমুদ্রের মাছ আর গোয়ানিজদের রান্না খাবেন। আর—

বলুন।

যদি পানের অভ্যাস থাকে তো কাজু থেকে তৈরি ফেনির লোভে গোয়া থেকে সহসা ফিরতেই চাইবেন না।

স্বাতি করুণ ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: কী হল?

স্বাতি বলল: জাহাজে চড়তে বাবা রাজী হবেন না।

আমরা বাঙলায় এই কথা বলেছিলুম। ভদ্রলোক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন অসুবিধা আছে?

অসুবিধার কথা আমি তাঁকে বললুম। তিনি বললেন: তবে অন্য পথে যান। বম্বে থেকে পুনা গিয়ে রাত আটটার ভাস্কো এক্সপ্রেস ধরুন। দুপুর বেলায় মারগাও পৌঁছবেন। একখানা ট্যাক্সি ধরে পোণ্ডার পুরনো মন্দিরগুলো দেখতে দেখতে ওল্ড্ গোয়ার ওপর দিয়ে পানাজী পৌঁছে যাবেন। কিন্তু আমি বলব, জাহাজে গেলে সেই আনন্দের কথা আপনাদের চিরকাল মনে থাকবে। অদ্ভুত সুন্দর এই কোঙ্কণ উপকূল।

উজ্জ্বল চোখে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি বললুম: কী হল?

স্বাতি বলল: কোঙ্কণ কথাটা শুনতেও ভাল।

মানে?

তোমার বইএর একটা নাম চাই তো! কোঙ্কণ নামটা মন্দ হবে না।

কিন্তু সেখানে যাওয়া না হলে?

স্বাতি বলল: যেতেই হবে।

তার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। আর স্বাতি আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বলল: আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

বললুম: অবিশ্বাস করতেও পারছি না।

স্বাতি বলল: তোমার কোঙ্কণ পর্ব তাহলে গোয়াতেই শেষ কোরো।

আমাদের বাঙলা কথা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন।

৭

আমার মনে হল যে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নিজেরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে অন্যায় করে ফেলেছি। এই অসৌজন্যের একটা কৈফিয়ৎ দেবার অভিপ্রায়ে বললুম: আপনার পরামর্শই আমরা ভেবে দেখছিলুম। যদি সম্ভব হয় তো গোয়া দেখেই দেশে ফিরব।

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: না না, এর মধ্যে আর যদির কথা রাখবেন না। বম্বেতে সময় নষ্ট না করে গোয়া অবশ্য দেখে যাবেন।

গোয়া সম্বন্ধে ভদ্রলোক এমন উৎসাহী কেন, তা জানবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: গোয়া আপনাব দেশ নাকি?

সহাস্যে ভদ্রলোক বললেন: গোয়াকে নিজের দেশ বলে দখল করবার চেষ্টায় আছি।

মানে?

বলে পরম কৌতূহলে আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালুম। আর ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরে বসে বললেন: গোয়া এখন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। অথচ সেখানকার অধিবাসীদের অর্ধেক হল মারাঠী। আমরা তাই গোয়াকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আন্দোলন করছি।

বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই ভদ্রলোক নিজে মহারাষ্ট্রী এবং তাঁর বাড়ি বোধহয় ঐ অঞ্চলে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলে জিজ্ঞাসা করলুম: তাতে বাধা কিসের?

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: এই দেখুন, কত চট করে ব্যাপারটা আপনি বুঝে ফেললেন। মারাঠীদের দাবী যে ন্যায্য তা

মানতে চাইছে না কোঙ্কনীরা। তারা বলছে, গোয়া তাদের। আরে বাবা, কোঙ্কণ তো মহারাষ্ট্রের উপকূলের নাম—গুজরাত থেকে গোয়া পর্যন্ত উপকূল। তবে গোটা মহারাষ্ট্রটাই বল্ না তোদের দেশ!

আমি বললুম: ঠিক কথা।

ভদ্রলোক বললেন: আর ভারত সরকারের আক্কেল দেখুন! বরোদা রাজ্যটা দিয়ে দিল গুজরাতকে! এ কোনও বিচার হল! বরোদার গায়কোয়াড় হল মারাঠা রাজা, আমরা তাঁর রাজ্যের প্রজা। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি নিজেদের গুজরাতী বলবে!

সত্যিই তো!

দেখুন, কত তাড়াতাড়ি আপনি এ কথা বুঝে ফেললেন! কিন্তু দেশের সরকার বুঝল না, বুঝল না নেতারা।

তার পরেই বললেন: নেতাদের কথা আর বলবেন না। যখন যেদিকে হাওয়া, তখন সেই দিকেই তারা ঝুঁকছে। একবার এ দিকে, একবার ও দিকে। আসলে তারা নিজেদের স্বার্থের দিকেই ঝুঁকছে। দেশের জন্যে কোন মাথাব্যথাই তাদের নেই।

স্বাতি বলল: গায়কোয়াড় কি মারাঠা রাজা?

ভদ্রলোক বললেন: তার বাপ চোদ্দপুরুষ হল মারাঠা। ইতিহাসে পড়েন নি আপনারা?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: সব কথা মনে নেই।

ভদ্রলোক বললেন: আমারও কি ছাই মনে আছে। তবে মোটামুটি বলতে পারি। মোগল আমলেই মারাঠাদের অভ্যুদয় বলতে হবে। তখন প্রায় সুরাত থেকে গোয়া পর্যন্ত মারাঠারা অধিকার করেছে, আর দক্ষিণ ভারতে বেলারি ভেলোর জিঞ্জি ও তাঞ্জোরে মারাঠারা কর আদায় করছে। দেখতে দেখতেই তারা

ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়াল। উত্তরে গোয়ালিয়র, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্বে উড়িষ্যা পর্যন্ত, আর গোয়ার দক্ষিণ অঞ্চলও অধিকার করেছিল তারা। মারাঠাদের পাঁচটি প্রধান শক্তি হল সিন্ধিয়া হোলকার ভোঁসলা পেশোয়া ও গায়কোয়াড়। এদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি।

ভদ্রলোক বললেন: পুনা থেকে আমরা পিলাজী গায়কোয়াড়ের সঙ্গে এদেশে এসেছিলাম। সে প্রায় আড়াই শো বছর আগেকার কথা। পিলাজী ছিলেন মারাঠা সেনাপতির সৈন্যাধ্যক্ষ মুতালিক। তাপ্তি নদীর সাত মাইল দক্ষিণে সোনগড়ের নাম শুনেছেন?

বললুম: না।

ছোট জায়গা। কিন্তু পিলাজী মাহী নদীর দক্ষিণে তখনকার গুজরাতের কয়েকটা জেলা যুদ্ধে জয় করে এই সোনগড়ে জাঁকিয়ে বসেন, আর সেই সব জেলা থেকে চৌথা আদায় করতে আরম্ভ করেন। পিলাজী সেই সময়েই সমস্ত গুজরাত জয় করতে পারতেন, কিন্তু পেশোয়া তাঁকে বারণ করেন। পেশোয়া তখন মারাঠাদের প্রধান ছিলেন।

তারপর?

তারপর হল তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ। সে প্রায় দু শো বছর আগের কথা। তারপরেই মারাঠা শক্তি ভেঙে পাঁচ ভাগ হয়ে গেল। পিলাজীর পুত্র দনাজী গায়কোয়াড় সোনগড় থেকে বরোদায় এসে রাজধানী স্থাপন করলেন, আর নিজে হলেন স্বাধীন রাজা।

ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: আমেদাবাদ যে তখন মারাঠাদের অধিকারে ছিল, তা বোধহয় জানেন?

কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বললেন: শহরের অর্ধেক ছিল পেশোয়ার, আর বাকি অর্ধেক গায়কোয়াড়ের।

পেশোয়া তাঁর নিজের অংশ গায়কোয়াড়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন পাঁচ লাখ টাকায়। আর পেশোয়ার কাছে ইংরেজ বোধহয় কিছু টাকা পেত। গায়কোয়াড় সে টাকাও শোধ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গায়কোয়াড় ইংরেজকে দিয়ে দিলেন আমেদাবাদ, আর তার বদলে দাভয় পরগণাটা পেলেন ইংরেজের কাছে।

ভদ্রলোক থামলেন খানিক্ষণের জন্যে, তারপর প্রশ্ন করলেন: এইবারে আপনারাই বলুন, বরোদা মারাঠা রাজ্য, না গুজরাতী?

আমি অসংশয়ে গুজরাতী বলতে পারতুম, কিন্তু ভদ্রলোক আঘাত পাবেন বলে বললুম না। ইংরেজ অধিকার করে কয়েক শো বছর রাজত্ব করেছে, কিন্তু ভারত ভারতই আছে, ইংলণ্ড হয় নি। দেশের রাজা বদল হয়, কিন্তু দেশ বদলায় না। পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসন কায়েম হয়েছে, কিন্তু তাই বলে দেশটা কোন দিন পাকিস্তান হবে না, বাঙলা দেশই থাকবে।

স্বাতি বাঙলায় বলল: মারাঠা বললে কিন্তু তোমার খুব সুবিধা হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কী রকম?

স্বাতি বলল: তোমার এ পর্বকে তা হলে মহারাষ্ট্র পর্ব বলা যেতে পারে।

স্বাতির কথা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক কৌতূহল আছে, কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

ভদ্রলোক যেন একটু বিচলিত হলেন, বললেন: হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু—

বলুন।

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক আরও বিব্রত হলেন, বললেন : মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে আপনাদের—

বলে তিনি থামলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: বম্বে বা পুনায় খোঁজ করতে হবে। এ দিকে —

বলে তিনি আবার থামলেন।

তাঁর দ্বিধা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এ দিকে মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে না। বরোদার রাজা গায়কোয়াড় হয়তো মারাঠা ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা নিঃসন্দেহে গুজরাতী। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে হয়তো কোন সময় মারাঠাদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু এখন বোধহয় আর নেই। তাই তাঁকে খানিকটা স্বস্তি দেবার জন্যে বললুম : বুঝেছি।

বুঝেছেন তো! তা বুঝবেন বৈকি! এমন কোন কঠিন কথা নয় তো!

আমি বললুম : এবারে এ দিকে কী দেখবার আছে, তাই বলুন।

ভদ্রলোক এবারে সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : কী দেখতে চান? তীর্থস্থান?

আমি বললুম : কাছে পিঠে কোন বড় তীর্থস্থান আছে?

আছে বৈকি।

বলে তিনি ডাকোরের কথা বললেন : তীর্থস্থান দেখতে চান তো আনন্দে নেমে পড়ুন। আনন্দের নাম শুনেছেন তো? আমুল মাখনের ও দুধের নাম? আমূল কোঅপারেটিভ হল আনন্দে। এত বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান ভারতে আর নেই। কিন্তু আমি আপনাকে ডাকোরের কথা বলছি। আনন্দ জংশন আপনারা আটটার আগেই পৌঁছবেন, আর ডাকোরের গাড়ি প্রায় পৌনে দশটায়, ঘণ্টাখানেকেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।

তারপর?

তারপরে ধীরেসুস্থে মন্দির দর্শন করে বিকেল চারটের গাড়ি

ধরে আনন্দে ফিরবেন। সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার' ট্রেনে চলে আসবেন বরোদায়। রাত নটার আগেই বরোদায় পৌঁছে যাবেন।

স্বাতি বলল : ডাকোরের নাম শুনেছ গোপালদা?

শুনেছি।

শুনেছ!

বলে অপরিসীম বিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললুম : বাঙলা দেশে শুনি নি, কোন ভ্রমণ-কাহিনীতেও পড়ি নি। এদেশে এসেই এ নাম প্রথম শুনেছি।

তার পরে কোথায় কার কাছে শুনেছি, সে কথাও বললুম।

বেট দ্বারকা থেকে ফেরার পরে মামা মামীর সঙ্গে স্টেশনে ফিরে গেলেন। সঙ্গে ছিল জো রায়। আমি রামখেলাওনকে সঙ্গে নিয়ে ওখার বাজারে গিয়েছিলুম রাতের আহার সংগ্রহে। সেই বাজারে দেখা হয়েছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আমাকে ডাকোরের গল্প বলেছিলেন। দ্বারকার রণছোড়জী নাকি নকল, আসল রণছোড়জী আছেন ডাকোরে। এই আসল নকলের গল্পও শুনিয়েছিলেন আমাকে।

এ কথা শুনে স্বাতি বলল : কই, আমাদের তো এসব কথা বল নি!

বললুম : নানান কথা বলার জন্যেই তো আমার বদনাম।

স্বাতি বলল : নামবে নাকি আনন্দে?

বললুম : তার কী উপায় আছে!

উপায় আছে। কিন্তু—

স্বাতি ভাবল এক মুহূর্ত, তার পরে বলল : থাক সে উপায়ের কথা। আমাদের এখনও অনেক জায়গা দেখবার আছে। তার চেয়ে ডাকোরে কী দেখবার আছে সেই কথা জেনে নেওয়া যাক।

ভদ্রলোক আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললুম : এ

যাত্রায় আমাদের ডাকোর দর্শন ভাগ্যে নেই। বরং সেখানকার মন্দিরের কথা আপনি কিছু বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: বৈষ্ণবদের তীর্থ। সব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরাই এই তীর্থে আসেন। প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে বেশ বড় মন্দির। মন্দিরের গায়ে ভাল কারুকার্যও আছে। নিকটে ঘাট বাঁধানো গোমতী সরোবর। বহু যাত্রী প্রতি দিন এই সরোবরে স্নান করে রণছোড়জীর দর্শন করে। তার পরে ত্রিকমজী বিষ্ণু ও ডঙ্কনাথ মহাদেব দর্শন করে ফিরে আসে।

স্বাতি আমাকে বাঙলায় বলল: এই লাইনের খবর এঁর কাছেই জেনে নেওয়া যাক।

আমি যেন তার কথা শুনতে পাই নি, এই ভাবে বললুম: আনন্দের পরেই বোধহয় বরোদা?

ভদ্রলোক বললেন: বরোদায় না নামলে শহরের সম্বন্ধে কোন ধারণা আপনাদের হবে না। মস্ত বড় শহর।

বললুম: আমেদাবাদের চেয়েও বড়?

ভদ্রলোক বললেন: আমেদাবাদ তো কলের শহর। কাপড়ের কলগুলো তুলে দিলেই আমাদের সব গেল। কিন্তু বরোদার তা নয়। গায়কোয়াড় তাঁর রাজধানীটি মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। রাজবাড়ি দেখতে চান, দেখুন লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস, মকরপুরা নজরবাগ ও প্রতাপবিলাস প্যালেস। পোরবন্দরে গান্ধীজীর কীর্তিমন্দির দেখেছেন। বরোদায় দেখুন রাজাদের কীর্তিমন্দির— তাঁদের সমাধিস্থান। সমাধিস্থান শুনে তা না দেখলে বলব, ভুল করেছেন। বড় বড় শিল্পীর হাতের কাজ দেখবেন ভিতরে।

অধ্যাপক যোশীর কথা আমার মনে পড়ল। তিনিও আমাকে এই কথা বলেছিলেন। বাঙালী শিল্পী নন্দলাল বসুর হাতের কাজ আছে ভিতরে। আরও দুজন বাঙালীর নাম বরোদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল বরোদা।

গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল বিলেতে। তিনি তাঁকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে এনে চাকরি দিয়েছিলেন। আর ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, বরোদার দেওয়ান ছিলেন তিনি। বরোদার সঙ্গে বাঙালীর সেদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

এই প্রসঙ্গেই আমার আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। সয়াজি রাও গায়কোয়াড়ের কন্যা ইন্দিরা দেবী বাপ-মায়ের অনুমতি না নিয়েই বিবাহ করেছিলেন কুচবিহারের রাজকুমার জিতেন্দ্র নারায়ণকে। বড় ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর জিতেন্দ্র নারায়ণ রাজা হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর পুত্র মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়েছে। খেলার জগতে তিনি সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সহযাত্রী ভদ্রলোক বললেন: বরোদায় আপনাদের থাকবার অসুবিধা হবে না। স্টেশনের উপরেই রিটায়ারিং রুম আর রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে, শহর দেখবার জন্যে অটো রিক্সা আর ট্যাক্সি পাবেন। প্রশস্ত পথঘাট ও সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি হল বরোদার বৈশিষ্ট্য। সয়াজি গার্ডেনের ভিতরে বরোদার চিড়িয়াখানা জাদুঘর ও চিত্রশালা একেবারে স্টেশনেরই গায়ে। শহরের মাঝখান দিয়েই বয়ে গেছে বিশ্বামিত্রি নদী। নয়া মন্দির দেখে সুর সাগর লেকের ধারে চলে যাবেন। শহরের মধ্যেই এ সব জায়গা:

স্বাতি বলল: নয়া মন্দির কোন্ দেবতার?

ভদ্রলোক বলে উঠলেন: না না, কোন দেবতার মন্দির নয়। নয়া মন্দির একটা বাড়ির নাম, এর মধ্যে কোর্ট-কাছারি বসে।

আমি হেসে বললুম: আর কি দেখব?

ভদ্রলোক বললেন: সুর সাগর থেকে ফেরার পথে পুরনো সিটির মধ্যে ঢুকে পড়বেন। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। দুটি সরল রেখা যেন পরস্পরকে ছেদ করেছে একটি বিন্দুতে—চারটি পথ ঘন বসতি ও

দোকানপাটে সারাক্ষণ জমজমাট হয়ে আছে। এই চারটি পথের শেষ প্রান্তে বড় বড় গেট আছে। পুরাকালে নাকি শত্রুর ভয়ে রাতে এই সব গেট বন্ধ করে শহর রক্ষা করবার ব্যবস্থা ছিল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার প্রশ্ন বুঝতে পেরে বললুম : বরোদায় নামতে হলে ব্রোচেও বোধহয় নামতে হয়?

ভদ্রলোক বোধহয় অনুমান করেছিলেন আমার কথা। বললেন : ব্রোচে কী দেখবেন? তার চেয়ে সময় পেলে সুরাতে একবার নামবেন।

প্রফেসার যোশী আমাকে ব্রোচের কথা বলেছিলেন সবিস্তারে। অতি প্রাচীন পৌরাণিক শহর ব্রোচ। কিন্তু এবারের সহযাত্রী এক কথায় ব্রোচকে নাকচ করে দিয়ে সুরাতের কথা শোনালেন। বললেন : সুরাতে গিয়ে সিল্ক আর ব্রোকেড তৈরি দেখবেন। আর তাপী নদীর পুলের উপরে দাঁড়িয়ে ইংরেজ বা পর্তুগীজদের ভাঙা দুর্গ আর কারখানা দেখবেন। এক সময় সুরাত খুব বড় বন্দর ছিল। মুসলমানরা এইখান থেকেই মক্কা যেত হজ করতে। ইংরেজরা তাই এ জায়গার নাম দিয়েছিলেন গেটওয়ে টু মক্কা।

হঠাৎ কী মনে হতেই ভদ্রলোক একবার হাতের ঘড়ি দেখলেন, তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আসছি।

বলে বাথ-রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

স্বাতি বলল : তুমি কী একটা জায়গার নাম বললে?

বললুম : ব্রোচ বা ভৃগুকচ্ছ। ভৃগু মুনির নামে ভৃগুপুর বা ভৃগুক্ষেত্রও বলে। গুজরাতের উত্তরে এক কচ্ছ আছে, তাই নর্মদা নদীর সঙ্গমে এই প্রাচীন বন্দরের নাম ভৃগুকচ্ছ। এই নাম থেকেই ভরুকচ্ছ ভরোচ বা ব্রোচ হয়েছে। পেরিপ্লাস-এর উল্লেখ আছে বরু গজ নামে। টেলেমি বলেছেন বারি গজ। স্ট্র্যাবোর বৃত্তান্তে বার্গোসোর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সবই যে ভৃগুকচ্ছেরই বিভিন্ন নাম তাতে সন্দেহ নেই।

একটুখানি মুচকি হেসে স্বাতি বলল : তারপর?

তার এই হাসির অর্থ আমার কাছে খুব স্পষ্ট। বললুম : শুনলেই তো, এখন এখানে কিছু দেখবার নেই।

স্বাতি বলল : কিন্তু শোনবার মতো আরও অনেক কথা আছে।

বললুম : সে সব অবান্তর কথা।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : বাবা থাকলে বলতেন যে এই সব অবান্তর কথা শোনাও বলেই সঙ্গী হিসেবে তোমার অনেক দাম।

তারপরেই বলল : রাগ না করে ভৃগু মুনির গল্প বল।

বললুম : ঋগ্বেদে পাওয়া যায় যে ভৃগু মুনিই পৃথিবীতে অগ্নি এনেছিলেন। ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি জন্মেছেন।

তাঁরই আশ্রম ছিল এইখানে। একদিন আঠারো হাজার শিশু সঙ্গে করে তিনি সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলেন। নর্মদা যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তারই কাছে আশ্রম স্থাপন করলেন। শিশুরা যাতে সুখে থাকতে পারে তার জন্যে বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে তিনি ভৃগুকচ্ছের পত্তন করেন। সেখানকার দশাশ্বমেধ ঘাটে বলি রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। মহাভারতের যুগে হিড়িম্বার বাস ছিল এইখানে। এইখানেই তাঁর সঙ্গে ভীমের বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র ঘটোৎকচও এইখানে বাস করত।

স্বাতি বলল : তারপর ?

বললুম : মুনশী সাহেব মনে করেন যে এইখানেই ছিল কার্তবীর্য অর্জুনের মাহিষ্মতী পুরী। কথাটা অসম্ভব নয়। নর্মদার তীরেই এই পুরী ছিল। নর্মদার উৎস মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক তীর্থের নিকটে, আর এইখানে তার সমুদ্রসঙ্গম। গঙ্গার মতো নর্মদাও পবিত্র নদী। গ্রামে বা যদি বা অরণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা।

অধ্যাপক যোশী আমাকে ভৃগুকচ্ছের ইতিহাসও শুনিয়েছিলেন। প্লিনি বলেছেন যে এই বন্দরে ভারতের লক্ষ্মী বাঁধা ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের কোটি কোটি টাকা ভারত এই বন্দরে টেনে আনত। আনত কাবুল থেকে, ব্যাবিলন থেকেও। ভারতের পশ্চিম উপকূলে তখন তিনটি বন্দর ছিল—সুর্পারক ভৃগুকচ্ছ ও প্রভাস। পরবর্তী কালে এই বন্দর অশোকের সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল। মৌর্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে। বরাহমিহিরের লেখায় ভৃগুকচ্ছের উল্লেখ আছে, আছে হিউ এন চাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে। সেখানে তখন দশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। তারপর আরবরা এল, এল অনহিলবাড়ার সোলাঙ্কিরা। একে একে মুসলমান ও ইংরেজও এল।

আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক তখন বাথ-রুম থেকে ফিরছিলেন দেখে আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলুম। আর কথা নয়, এখন একটু নীরবে থাকব।

স্বাতি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে সেও জানলার বাইরে তাকিয়ে বাহিরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

এক্সপ্রেস ট্রেন অবিশ্রাম ছুটছে। বড় বড় কয়েকটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে বিকেল বেলায় পৌছবে বম্বে। গাড়িতেই যেতে হবে, গাড়িতেই কাটাতে হবে সারা দুপুর। সেজন্যে তৈরি হয়েই আমরা এই গাড়িতে উঠেছি। অনেক যাত্রী তখন ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজেছেন। একটা কোণায় রামখেলাওনকে দেখলুম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ভারি সুখী মানুষ সে। মুখে কথা নেই, কাজ করে নিঃশব্দে। কোন কৌতূহল নেই, উৎসাহ নেই কিছুতেই। সুযোগ পেলেই সে ঘুমোয়, দিন রাত্রির ভেদাভেদ নেই। সত্যিই সুখী মানুষ। তাই আমরাও তার কথা বেমালুম ভুলে যাই।

৮

বম্বে পৌঁছবার অনেক আগেই মনে হল যে গ্রামের এলাকা শেষ করে আমরা শহরতলীতে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু এই শহরতলীও যেন শেষ হতে চায় না। সহসা আমার একজন মারাঠা ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সেবার নাগপুর থেকে প্রথম কলকাতায় আসছিলেন। ট্রেনে হঠাৎ মন্তব্য করলেন, কলকাতা এত ছোট শহর!

চমকে উঠেছিলেন অনেকে, বলেছিলেন, সে কী কথা!

ভদ্রলোক বলেছিলেন, তাই তো দেখছি! গ্রামের এলাকা শেষ হতেই হাওড়া স্টেশন।

কথাটা মিথ্যা নয়। বম্বের লোকেরা এ কথা বলতে পারে। কিন্তু ব্যাণ্ডেলের দিক থেকে এলে হয়তো তিনি এ কথা বলতেন না, বলতেন না শিয়ালদহের দিক থেকে এলেও। লোকালয় ঘন না হলেও সেসব দিক ঠিক গ্রামের মতো মনে হয় না। সেদিন আমি বম্বে না দেখেই বলেছিলুম, বম্বে শুধু লম্বাতেই বেড়েছে, কলকাতার মতো হাড়ে মাসে বাড়েনি।

মানচিত্র দেখে আমি এই কথা বলেছিলুম। এবারে নিজের চোখে সব দেখছি। অনেকক্ষণ থেকে আমরা বসতি দেখতে পাচ্ছি, ছোট স্টেশনগুলি পার হয়ে যাচ্ছি একটার পরে আর একটা। ইলেকট্রিক ট্রেন চলছে বহু যাত্রী নিয়ে। কলকাতার মতো দুধারেই যাত্রী চলছে। বিকেল পাঁচটার পরে আমরা বম্বে সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌঁছলুম।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় উঠবে এখানে?

আমি বললুম: রিটায়ারিং রুমে কি উঠবেন না?

জনকয়েক হোটেলের গাইড এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে চেয়ে মামা বললেন : রেলের সংস্রব আর ভাল লাগছে না। দুদিন এসব ভুলে থাকতে দাও।

মামী আপত্তি করলেন না। আপত্তি করল না স্বাতিও। ভাল হোটেলে যে খরচ কম পড়বে না, আমি তা জানি। তাই আমি কোনও কথাই বললুম না। গাইডদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মামা নিজেই একটা হোটেল ঠিক করলেন। চার্চ গেট স্টেশনের একটা ভাল হোটেলে গিয়ে আমরা উঠলুম।

হোটেল মামীর পছন্দ হল, কিন্তু খরচের বহর জেনে স্বীকার করলেন যে রেলের সুবিধা অনেক বেশি। রেলের রিটায়ারিং রুমের ভাড়া অনেক বেড়েছে, খাবার দামও আর কম নেই। কিন্তু হোটেলের খরচের যেন কোন নিয়মকানুন নেই।

মামা নিজে ব্যবস্থা করেছেন বলে এ কথা মেনে নিলেন না, বললেন : এমন আরাম কি আর পেতে?

মামী বললেন : তাই বলে পয়সার হরিলুঠ দিতে তো বেরোই নি!

মামা বললেন : ঠিক আছে, দুদিন কম থাকলেই হবে। এখানে কী দেখাবে গোপাল?

বলে মামা আমাদের প্রসঙ্গান্তরে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন।

মামী একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিলেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে বললুম : সকলের আগে মিস্টার রায়কে খুঁজে বার করব।

মামা বসতে যাচ্ছিলেন, বললেন : মিস্টার রায় আবার কে?

বললুম : জো রায়।

তাকে আবার কী দরকার?

বলে তিনি চুপ করে বসে পড়লেন।

আমি বললুম : দিল্লীর কথা মনে নেই! রাণাবাবুকে পেয়ে আমাদের কত সুবিধা হয়েছিল।

মামা বললেন : সে তো সেধে আমাদের শহর দেখাবার ভার নিয়েছিল!

জো রায়ও নেবে।

হুঁ।

বলে মামা পকেট থেকে তামাকের পাউচ আর পাইপ বার করলেন।

আমি একটু দূরে ছিলুম, আর স্বাতিকে কাছাকাছি দেখে খুব সাবধানে বললুম : ভাল সঙ্গী পেলে কে না দেখাতে চায়!

স্বাতিও উত্তর দিতে দেরি করল না। অত্যন্ত সন্তর্পণে বলল : তুমি কি সঙ্গী পাও নি?

আগের মতো অস্পষ্ট ভাবে বললুম : সঙ্গী যদি সঙ্গিনী হয়, তাহলে সেই সঙ্গ আরও মধুর, তেমনি সঙ্গিনীর বেলাতেও। রাণার সঙ্গে তোমাকে বড় খুশি খুশি দেখাত।

দেখাবেই তো। সে তো আমাদের ইতিহাস পড়াত না, চোখ মেলে দেখতে বলত।

চোখ মেললেই কি সব কিছু দেখা যায়! বিশ্বের সবচেয়ে বড় সত্যটিই চোখ মেলে দেখা যায় না। মন দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হয়।

কথাটা বোধহয় আমি জোরেই বলেছিলুম। তাই মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কী কথা হচ্ছে?

বললুম : স্বাতির ধারণা যে চোখ মেলেই সব দেখা যায়, শোনবার কিছু দরকার নেই।

মামা বললেন : উঁহু, গীতায় যেন কী বলেছে! শ্রবণ মনন—

বললুম : নিদিধ্যাসন।

স্বাতি বলে উঠল : তার মানে?

মামা বললেন : প্রথমে শুনতে হবে, তার পরে ভাবতে হবে, তার পরে—

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : যা শুনেছি তারই ধ্যান করতে হবে। শ্রবণেই তোমার এমন আপত্তি, সত্যদর্শন তোমার কী ভাবে হবে জানি নে!

দরকার নেই আমার সত্যদর্শনের।

বলে স্বাতি নিজের কাজে ব্যস্ত হল।

মামী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যিই ছেলেটার খবর নেবে নাকি?

বললুম : নিশ্চয়ই নেব।

বলে আমি বেরোবার উদ্যোগ করতেই মামা বললেন : তুমি চললে কোথায়?

বললুম : টেলিফোনে একটু চেষ্টা করে দেখি।

মামা বললেন : দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে যাও। দুদিকেই ফাঁকে পড়বে, তা হয় না।

মামা আমাকে বাধা না দিলেও আমি বেরোতে পারতুম না। হোটেলের বেয়ারা তখন চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। তার জন্যেই আমাকে থাকতে হল। আর মামার কথা শুনে আমি ফিরে এসে বসে পড়লুম।

মামা বললেন : গোপালকে চা তাড়াতাড়ি দাও, ওর এখন অনেক কাজ। জো রায়কে না পেলে তো ওকেই শহর দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে!

স্বাতিও কাছে এসে বসে বলল : গোপালদা আজ আমার ওপরে খুব চটেছে।

মামা বললেন : কেন?

গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গোপালদা ভাব জমাতে চাইছিল—যত সব বাজে গল্প। কোথায় ভৃগু মুনির আশ্রম, আর

কোথায় হিড়িম্বার বন—এ যুগে এ সব কথা কারও ভাল লাগে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে সব আবার কোথায়?

মামী তাড়াতাড়ি চা করছিলেন। তাঁর হাত চালানো দেখেই বুঝতে পেরেছি যে আমার প্রস্তাব তাঁর ভাল লেগেছে। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে আমি জো রায়ের খোঁজ করি, তাই তিনি চাইছেন। তাই বললুম: থাক সে সব কথা।

আরে থাকবে কেন! মুখ বুজে তো চা খাবে না, খেতে খেতেই বল।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। কিন্তু আমি তা দেখেও কোন উত্তর দিলুম না। বললুম: ব্রোচ নামের একটা স্টেশনের ওপর দিয়ে আমরা এসেছি। পুরাকালে এর নাম ছিল ভৃগু-কচ্ছ। আর তার নিকটেই ছিল কার্তবীর্য অর্জুনের মাহিষ্মতী পুরী।

প্রমাণ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

পরম পুলকে স্বাতি বলে উঠল: আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছিলে তো, সামলাও এবারে। প্রমাণ না দিলে কোন কথা আমরা মানব না।

আমি বললুম: কিসের প্রমাণ? ভৃগুকচ্ছ এইখানে ছিল তার প্রমাণ, না মাহিষ্মতী পুরীর?

স্বাতি বলল: দুটোরই প্রমাণ চাই।

বললুম: তাহালে তো খুব সুবিধেই হল।

কেন?

জমদগ্নির সঙ্গে এই অর্জুনের যুদ্ধের কথাতেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। দুজনে কাছাকাছি না থাকলে এই যুদ্ধ হত না।

মামা বললেন: এ সব কাজের কথা নয় গোপাল, তুমি গোড়া থেকেই শুরু কর।

বললুম: নর্মদা যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, সেই সঙ্গমের কাছে ভৃগুমুনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এসে আশ্রম করলেন। ভৃগুর এক পুত্রের নাম ঋচীক, জমদগ্নি তাঁর পুত্র, পরশুরাম জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র। এ দিকে হৈহয়-রাজ কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য অর্জুন তখন পরাক্রান্ত রাজা। নর্মদার তীরে মাহিষ্মতী পুরীতে তাঁর রাজধানী। দত্তাত্রেয় মুনির বরে কার্তবীর্যের সহস্র বাহু হয়েছিল। রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে কার্তবীর্যের যুদ্ধের কথা আছে রামায়ণে।

মামা বললেন: তুমি কি আমাদের রামায়ণে সে গল্প পড়ে নিতে বলছ নাকি?

লজ্জিত ভাবে বললুম: তা নয়। খুব দেরি হয়ে যাবে বলে—

বাধা দিয়ে মামা বললেন: এখানে কি আমরা রাজ্য জয় করতে এসেছি যে এক দণ্ড বসে গল্প করবার উপায় নেই!

আমি করুণ ভাবে তাকালুম মামীর মুখের দিকে। তিনি বললেন: ছেলেটার খবর নিয়ে আসত আগে—

খবর কেন, একেবারে ধরেই নিয়ে আসবে। তোমার জন্যে তো এখনও অফিসে বসে আছে! বল গোপাল, ধীরেসুস্থে বল। কোন তাড়া নেই আমাদের।

বলে মামা আবার পাইপের ধোঁয়া মুখে নিলেন।

বললুম: রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। এই নর্মদাতীরে শিব পূজায় বসে দেখলেন যে নদীর জল উজানে বইছে। ব্যাপার কী? তাঁর মন্ত্রীরা খবর আনল যে হৈহয়-রাজ অর্জুন নর্মদায় নেমে তাঁর রাণীদের সঙ্গে জলকেলি করছেন। কিন্তু জল উজানে যাবে কেন? মন্ত্রীরা বলল, রাজার এক হাজার হাত, সেই হাত দিয়ে নর্মদার স্রোত আটকে রেখেছেন। রাবণ বললেন, ঠিক আছে, এঁরই সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধ হল। কার্তবীর্য অর্জুন রাবণকে এক হাজার হাতে বন্দী করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মন্ত্রীরা হায় হায় করে ছুটোছুটি করতে

লাগলেন। শেষ পর্যন্ত রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য মুনি স্বর্গ থেকে এসে রাবণের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন।

মামা বললেন: এ তো ত্রেতা যুগের ঘটনা!

আমি বললুম: ঠিক বলেছেন। পুলস্ত্য ভৃগু এঁরা হলেন সত্য যুগের লোক। সেই জন্যেই বলছিলাম, তখন ছিলেন বিশ্বামিত্র জমদগ্নি। বিশ্বামিত্র হলেন জমদগ্নির মামা. কিন্তু বয়সে সমান। প্রথম জীবনে রাজা ছিলেন তিনি, আর কামধেনুর জন্যে লড়াই করেছিলেন বুড়ো বশিষ্ঠের সঙ্গে। এ দিকে কার্তবীর্য অর্জুন ও জমদগ্নির কামধেনুর জন্য প্রবল লড়াই করেছিলেন। মৃগয়া করতে এসে তিনিও এই কামধেনুর আপ্যায়ন করার শক্তি দেখে তাকে হরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেরা তখন বাড়ি ছিল না, জমদগ্নি মারা পড়েছিলেন যুদ্ধে। আর বাড়ি ফিরে পরশুরাম যখন সেই খবর পেলেন, তখন তাঁর মূর্তি দেখে কে! কুঠার নিয়ে একা বেরোলেন যুদ্ধে। কার্তবীর্যের এক হাজার হাত কেটে তাকে বধ করলেন। তাতেই শান্ত হলেন না, পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় নির্মূল করবার জন্যে একুশ বার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন।

মামা বললেন: তারপর?

বললুম: এই জন্যেই বলছিলুম যে ভৃগুকচ্ছের কাছেই ছিল মাহিষ্মতী পুরী—দুটি জায়গাই নর্মদা নদীর তীরে।

মামী বললেন: তুমি আর একটু চা খাবে গোপাল?

চায়ের পেয়ালাটা আমি শেষ করে রেখে দিচ্ছিলুম। মামা বললেন: খাবে বৈকি।

খানিকটা ইতস্তত করে আমি পেয়ালাটা এগিয়ে দিলুম। আর মামী আরও খানিকটা চা ঢেলে দিলেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কোন কথা বলল না। কিন্তু মামা বললেন: এইবারে হিড়িম্বার কথা বল।

আমি বললুম: দ্বাপরে বোধহয় এই অঞ্চল গভীর বনে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাক্ষসেরা বাস করত এইখানে। জতুগৃহ দাহের পর পঞ্চ পাণ্ডব এখানে এসে তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মহাভারতে সেই গল্প আছে।

মামা বললেন: মহাভারতে তো সবই আছে। কিন্তু সেখানা তো আমরা মুখস্ত করে রাখি নি।

বলতে পারলুম না যে আমিও তা মুখস্ত করে রাখি নি। সংক্ষেপে সেই গল্প বললুম: জতুগৃহ দাহ হয়েছিল বারণাবতে। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে বারণাবত একটি প্রাচীন নগর, এখন আমরা প্রয়াগ বলি সেই জায়গাকে। দুর্যোধন যে এই জতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছে, বিদুর তা জানতেন। এবং তিনি তাঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। বিদায় দেবার সময় ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আর সুড়ঙ্গ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন জতুগৃহ থেকে পালাবার জন্যে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: জতুগৃহ কী গোপালদা?

বললুম: লাক্ষা দিয়ে তৈরি এক রকমের বাড়ি। আগুন লাগলে আর রক্ষা নেই, পুড়ে মরতে হবে। যাই হোক, পঞ্চ পাণ্ডব তো পালিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু পালাবার সময় যখন এক বনে বিশ্রাম করছেন, তখন এল অন্য বিপদ। মানুষের গন্ধ পেয়ে হিড়িম্ব রাক্ষস তার বোন হিড়িম্বাকে বলল, আজ নরমাংসে আমাদের ফিস্ট হবে, তুমি গিয়ে ওদের মেরে নিয়ে এস।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: কী যা-তা বলছ গোপালদা! কোথায় প্রয়াগ, আর কোথায় এই ভৃগুকচ্ছ!

আমি বললুম: অনেকে তো জতুগৃহ বলেন উত্তর কাশীতে, আর হিড়িম্ব বন—

বিরক্ত ভাবে মামী বললেন: তোমরা কি গল্প করেই সময় কাটাবে?

আমি উঠে পড়তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু মামার কথা শুনে বসে পড়লুম। তিনি বললেন : গল্পটা শেষ করে যাও।

বললুম : দূর থেকে হিড়িম্বা ভীমকে দেখতে পেল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার সুপুরুষ, জেগে পাহারা দিচ্ছে তাদের ঘুমন্ত পরিবারকে। ভাইএর কথা হিড়িম্বার ভুল হয়ে গেল। সুন্দরী মেয়ের রূপ ধারণ করে সেজেগুজে এল ভীমের কাছে।

মামী বললেন : এ তো আমাদের জানা গল্প !

বললুম : মহাভারতের গল্প তো সবারই জানা। এ না হয় অন্য সময় বলব।

মামা বললেন : আবার অন্য সময় কেন, শেষ করেই যাও না !

মামার আদেশে বাকী গল্পটা আমাকে বলতে হল : হিড়িম্বা ভীমের কাছে গিয়ে ভাইএর মতলবের কথা অকপটে স্বীকার করেছিল। আর ঠিক এই সময়েই বোনের দোর দেখে হিড়িম্ব নিজে এসে উপস্থিত হল। তারপরে যুদ্ধ হল দুজনে। হিড়িম্ব নিহত হল। ভীম হিড়িম্বাকেও মারতে চেয়েছিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, স্ত্রী হত্যা মহাপাপ। আর কুন্তীকে রাজী করে হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করে ফেলল।

বলে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। জো রায়ের খবর আমাকে নিতে হবে দেরি করলে অফিসে আর তাকে পাব না। তাই হন হন করে ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে চললুম।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আমাকে থামতে হল। পিছনে স্বাতির ডাক শুনেই থামলুম। কাছে এসে সে বলল : একটা কথা তোমাকে বলতে এলাম।

বললুম : বল।

স্বাতি বলল : মাকে খুশী করতে চাও বাধা দেব না। কিন্তু সবাইকে অসুখী করার অধিকার তোমার নেই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু স্বাতি আর কোন কথা না বলে ফিরে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ, তারপরে ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

৯

জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দ্বারকা থেকে আমরা ওখা যাচ্ছিলুম। যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় মামারা উঠেছিলেন, সাহেবী পোশাকে জো রায় সেই গাড়িতেই বসে ছিলো। অযাচিত ভাবে সে সাহায্য করেছিল বলে মামা তাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ধন্যবাদের চেয়ে আমি বেশি পেয়েছিলুম। সেই পাওয়ার কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। সবাইকে তুলে দিয়ে আমি নিজের থার্ড ক্লাস গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিলুম। মামা ডেকে বললেন, গোপাল, এ গাড়িতেই এস।

আমি দাঁড়াতুম না, কিন্তু জো রায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। জো রায় জিজ্ঞাসা করল : আপনার লোক বুঝি ?

এই লোক শব্দটির মানে বড় স্পষ্ট। রামখেলাওন মামার লোক, আমিও ঐ রকম কিছু। হয়তো বাজার সরকার, কিংবা জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা। জমিদারের সঙ্গে প্রভেদটা বড় বেশি। আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম তা জানি। মামা কী জবাব দেন, সেই কথা জানবার আগ্রহ ছিল। সেই কথাটি জানা হলে আমার ভবিষ্যৎটাও বুঝি জানা হয়ে যাবে। জানলার সামনে থেকে আমি সরে গিয়েছিলুম। মামা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁর উত্তর শুনতে পেলুম। এতটুকু দেরি না করে স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমার ভাগ্‌নে।

তার পরেই স্বাতিকে বললেন : ধরে আন্‌ তো মা, ওর চাল চালিয়াতি যেন অন্যকে দেখায়।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যেন মামা

আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি স্নেহ দিয়ে ফেললেন। সেইটুকু ঢাকবার জন্যেই বোধহয় বাহিরের এই রূঢ়তা।

এই গাড়িতেই জো রায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা ফার্মের বড় অফিসার। হেড কোয়ার্টার্স বম্বেতে, কাজের এলাকা সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ। বিলেত ঘুরে এসে পিতৃদত্ত জনার্দন নাম হয়েছে জো। কথায় ও কাজে এখন পুরোদস্তুর সাহেব। মিঠাপুরে তার কাজ ছিল, কিন্তু নামতে পারল না। আমাদের সঙ্গেই ওখা গেল, ওখা থেকে বেট দ্বারকা। ফেরার পরেও তার মিঠাপুরে নামা হল না। আমাদের সঙ্গে সেও সোমনাথ দেখত, কিন্তু স্বাতির কথায় তা হল না। ভদ্রলোককে নেমে যেতেই হল।

জো রায়কে মামীর ভাল লেগেছিল। চুপিচুপি মামাকে বলেছিলেন, বেশ ছেলেটি, তাই না?

গম্ভীরভাবে মামা বলেছিলেন: হুঁ।

এত বড় চাকরি, অথচ অহংকার নেই এতটুকু!

হুঁ।

তারপর মামী পরামর্শ দিয়েছি[illegible]টা লিখে রাখ, সেই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

মামা তাতেও বলেছিলেন, হুঁ।

গাড়িতে রাতের আহারের পর জো রায় বলেছিল, সোমনাথ তার দেখা হয়নি।

মামী তখনই প্রস্তাব করেছিলেন, বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত দুটো কচলে জো রায় বলেছিল, আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হয়ে বলেছিলেন, তা বটে। তুমি তো আমার ছেলেরই মতো।

আর মামীকে খুশী করবার জন্যে আমি বলেছিলুম, আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমি যাব পাশের গাড়িতে।

কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গিয়েছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না?

মামী রুখে উঠে বলেছিলেন, একসঙ্গে যদি দেখতে পারা যায় তো পরে দেখবে কেন?

আর স্বাতি উত্তর দিয়েছিল, কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে।

তার এই উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পায় নি, বরং আরও নম্র ও মিষ্টি মনে হয়েছিল তার কণ্ঠস্বর।

জো রায় ব্যস্ত ভাবে বলেছিল, সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এদিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে গিয়েছিল পাশের গাড়িতে। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয় নি।

ম্যানেজারের ঘর থেকে আমাকে টেলিফোন করতে হবে। কিন্তু সেই ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে আমি থমকে দাঁড়ালুম। স্বাতি বুঝতে পেরেছে যে জো রায়কে খুঁজে বার করবার জন্য আমি কোন চেষ্টার ত্রুটি করব না। তাইতেই সে ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এসে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। মনে করিয়ে দিয়েছে পুরনো কথা। তারপরেও কি উচিত হবে জো রায়কে খুঁজে বার করা!

আমাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ম্যানেজার উঠে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললুম: একটা টেলিফোন করব।

বাই-অল মীন্‌স্‌।

বলে টেলিফোনটা ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

বললুম : নম্বর জানি নে।

আর তখনি তিনি ডাইরেক্টরিটা বার করে দিলেন।

একখানা চেয়ারে বসে ফার্মের নামটা খুঁজে বার করলুম। জো রায়ের নামও পেলুম। এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখে নিলুম সেই নম্বরটা। তারপর দুর্গা বলে ডায়াল করলুম। জো রায়কে না পেলেই যেন ভাল হয়। দু কূলই তা হলে বাঁচে। কেন জানি না, বুকের ভিতরটায় একটা আঘাত পড়তে লাগল ঘন ঘন। কানেক্সন ঠিক হয়েছে, ক্রিং ক্রিং করে বাজছে টেলিফোন। কিন্তু কেউ ধরছে না। হে ভগবান, কেউ যেন না ধরে এই টেলিফোন। জো রায় টেলিফোন না ধরলেই আমার যন্ত্রণার শেষ হয়ে যাবে।

সত্যিই কেউ টেলিফোন ধরল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে যখন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলুম, তখন বোধহয় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে আমার কপালে। ম্যানেজার বললেন : এই ঘরটা একটু গরম, তাই না ?

আমি বললুম : না, তেমন নয়। আজ একটু ক্লান্ত আছি কিনা —ধন্যবাদ। বলে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

তারপরেই আমার মনে হল যে অন্য কোন নম্বর ডায়াল করে জো রায়ের কথা আমি হয়তো জেনে নিতে পারতুম। হয়তো তার বাড়ির ঠিকানাও জেনে নেওয়া সম্ভব হত। কিংবা তার বাড়িতেও টেলিফোন করা সম্ভব হত। কিন্তু আবার ফিরে যাবার উৎসাহ আমি পেলুম না। দ্রুত পদে আমার ঘরে এসেই ঢুকে পড়লুম।

মামী সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন : কথা হল ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : না।

স্বাতি বলল : বাড়িতেও পেলে না ?

আমি আশ্চর্য হলুম তার এই প্রশ্ন শুনে, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললুম : কোন জবাব নেই।

মামা বললেন: ঠিক আছে। গোপাল থাকলে আর কারও দরকার আমাদের নেই।

কিন্তু স্বাতি বলল: তুমি পারবে না গোপালদা, কাল আমি চেষ্টা করে দেখব।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি বললুম: সেই ভাল।

মামা বললেন: আজ কোথাও বেরোবে, না ঘরে বসেই সময় কাটাবে?

মামী নিরুৎসাহ হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতির উৎসাহ দেখলুম বেড়ে গেছে। বলে উঠল: ঘরে বসে থাকব কেন বাবা, চল বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যে বেলায় না বেরোলে কি শহরের রূপ ভাল দেখা যায়! তাই না গোপালদা?

মামা বললেন: কাল সকালের প্রোগ্রাম আমাদের হয়ে গেছে। স্বাতি আমাদের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে।

মন্দির!

সশব্দে স্বাতি হেসে উঠল। বলল: বম্বে শহরে যে মন্দির আছে, গোপালদা বোধহয় তা জানেই না।

মামা বললেন: তাই নাকি গোপাল?

আমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে স্বাতি বলল: গোপালদাকে এমন পাহারা দিয়ে এনেছি যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পায় নি। যাত্রীদের কাছেই তো সব জেনে নিয়ে গোপালদা আমাদের চাল দেয়: এইবারে জব্দ হয়েছে।

হাসতে হাসতে মামা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: চল।

মামী বললেন: এমনি করেই বেরোব?

জামাইয়ের বাড়ি তো যাচ্ছ না—

বলে মামা ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এলেন।

পরে আমরা একটা ট্যাক্সি ধরলুম। স্বাতি তাকে ধাস্তিয়া গেটে

যাবার নির্দেশ দিল। তারপরে গাড়ি চলতে শুরু করতেই বলল: হালদার মশায়ের সঙ্গে দেখা হলে ভারি মজা হয়।

মামী যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন: কেন, সেও বম্বে এসেছি নাকি?

মামীর কণ্ঠে ভয়ের সুর শুনে স্বাতি আরও পুলকিত হয়ে উঠল, বলল: তোমাকে তাই বলে নি গোপালদা?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: না।

স্বাতি বলল: তবে ফাঁকি দিয়েছে তোমাকেও। সোমনাথ পর্যন্ত এসে বম্বে না দেখে ফিরে যাবেন, এ হতেই পারে না।

সোমনাথে নয়, এ যাত্রায় আমরা দ্বারকায় দেখা পেয়েছিলুম কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারের। তোতাদ্রি মঠের একটা বেঞ্চিতে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলুম। তার পর ঘরে এসে দরজা বন্ধ করতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

আমি হালদার মশায়ের নাম করতেই তিনি চমকে উঠলেন। মামা ভয় পান তাঁকে। বলেন, লোকটা বিশেষ সুবিধার নয়, ধর্মের নামে অধর্ম করেই হাত পাকিয়েছে। আর রামেশ্বরের সেই ঘটনার পরে মামী এঁরই ভয়ে মরে যাচ্ছিলেন। মুখরোচক মিথ্যা এ যুগে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই মামীর দুর্ভাবনার শেষ নেই। আমার কথা শুনে মামা জিজ্ঞাসা করলেন,—কী বলছিল লক্ষ্মীছাড়া?

আমি সত্যি কথাই স্বীকার করলুম, বললুম: সমুদ্রের ধারে স্বাতিকে দেখেছেন আমার সঙ্গে।

মামা ক্ষেপে উঠলেন: দেখেছে বলছে!

আর মামী তাঁর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন বিছানার উপরে। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, আমি আগেই জানতাম যে এমন একটা কেলেঙ্কারি হবে।

স্বাতি ভয় পাবার মেয়ে নয়। বলল, কেলেঙ্কারি কিসের ?

কিসের কেলেঙ্কারি তা তুমি বুঝবে কেন।

মামী যেন গুমরে উঠলেন।

স্বাতি বলে উঠল, তোমরা ভয় পাও বলেই তো উনি অমন পেয়ে বসেছেন।

ভয় তাঁরা সঙ্গত কারণেই পান। সেবারের সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে। মামীর ধারণা যে সে হালদারের জন্যেই ভেঙেছে। রাণার সঙ্গে নূতন সম্বন্ধটাও গেল ভেস্তে। মামীর উদ্বেগের আর অন্ত নেই। কিন্তু মামা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে বললেন, ঐ লক্ষ্মীছাড়াকে আমি আর ভয় পাই নাকি! কী করবে আমার। কী বলে বেড়াবে!

আশ্চর্য হয়ে মামী বললেন, তুমি কি পাগল হলে! বুঝতে পারছ না, দেশে ফিরে কী সর্বনাশ করবে!

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন, সে আমি বুঝব।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, আপনার পয়সায় এবারে অমরনাথ যাবে বলছে।

যাওয়াচ্ছি। বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে যে হেঁটে ফিরতে হবে কালীঘাটে। ট্রাম ভাড়ার পয়সা যদি পায় তো আমার নাম অঘোর গোস্বামী নয়।

দু চোখ বিস্ফারিত করে মামী আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ এমন সাহস তিনি পেলেন কোথা থেকে। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। সে হাসি মামী দেখতে পেলেন না।

স্বাতির হাসিটি আমার অদ্ভুত লাগল। মনে হল যে মামার নির্ভীক হৃদয়ের সংবাদ তার জানা আছে। স্বাতিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।

এই হালদার মশায়ের সঙ্গে আবার আমার জেতল সরে দেখা

হয়েছিল। তিনিও সোমনাথে চলেছেন। আমরা জুনাগড়ে নামলুম, কিন্তু তিনি নামলেন না। শুধু খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে গেলেন। বললেন, বুড়ী ঐ বাঁদরটাকে পছন্দ করলেন, আর ভাগ্নে হয়ে মামীর মন ভোলাতে পারলেন না!

বুঝতে ভুল হল না যে তিনি জো রায়ের কথা বলছেন। বললুম, জো রায়কে আপনি চিনলেন কী করে?

একটা ভেংচি কেটে উত্তর দিলেন, কী নাম বললেন? জো রায়। জনার্দন বললে বুঝি মান যায়! হনুমান বললেও ঐ বাঁদরকে সম্মান করা হয়।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এত রাগ কেন ঐ ভদ্রলোকের ওপর?

ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক? আমি কোন্ ছার! ওর বাপ ওকে কুলাঙ্গার বলে। তবে কিনা—

হালদার হেঁ-হেঁ করে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তার পরে বললেন, আপনাকে বলতে দোষ নেই, আমি আমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছি। কাল রাতে যখন গাড়ি থেকে ছোঁড়া নামল ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরলুম। কালীকেষ্ট হালদারকে ফাঁকি দেবে, এমন ছেলে এখনও মায়ের পেটে আছে।

নিঃশব্দে এ কথা মেনে নিতেই হালদার আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন, বললুম ওখানে গিয়ে ভিড়েছ তো! দাঁড়াও সব ফাঁস করে দিচ্ছি। তবে তার বুদ্ধিটা দেখলুম প্রখর, বিপদটা সে টক করে বুঝে নিল, কিছু বোঝাতে হল না। হাতে পায়ে ধরে বলল, বুড়ো-বুড়ীকে ভুলিয়েছি, আপনি আর বাদ সাধবেন না।

সেই সঙ্গেই বললেন, অঘোর গোঁসাইকে বাছাধন এখনও চেনে নি। বুড়ী ভুলতে পারে, কিন্তু বুড়ো কম সেয়ানা নয়। যে লোক কালীকেষ্টকে চিনেছে হাড়ে হাড়ে, সে ঐ বাঁদরকে কি আর চিনবে না! পঞ্চাশ টাকায় পার পেতে চেয়েছিল রফা হয়েছে

পাঁচ শো তে। এক শো টাকা নগদ দিয়েছে, বাকিটা কলকাতার ঠিকানায় পাঠাবে।

তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, কারও সম্বন্ধেই কিছু বলি না। অভাব না থাকলে ভয়ও দেখাতুম না। কালীকেষ্ট হালদারের নাম তাহলে কালীকৃষ্ণবাবু হত। বুঝলেন গোপালবাবু, এই হচ্ছে আজকের সমাজ আর আজকের সভ্যতা। একটা মুখোশ মাত্র, পয়সার মুখোশ। পয়সা থাকলে জানোয়ারও মানুষ সাজতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজের পরিচয় হারায় পয়সার অভাবে। লোকে চিনতে পারে না।

তারপর বললেন, গোপালবাবু, নিজের পরিচয়টা যদি দিতে পারতেন, তাহলে বুড়োবুড়ী আজ পাত্র খুঁজে বেড়াত না। চিনেছে শুধু মেয়েটা।

ভেরাবলের ওয়েটিং রুমে একটি রাত আমরা কাটিয়েছিলুম। মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে আমি ছাড়াও ছিলেন হালদার মশাই। যে মানুষকে মামা মামী ঘৃণার চেয়েও ভয় করেন বেশি, তিনিও আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেলেন। তার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। সেকথা আমি পরে জেনেছিলুম।

রাত সাড়ে নটায় ভেরাবলে আমাদের ট্রেন পৌঁছতেই হালদার এগিয়ে এসেছিলেন। খবর দিয়েছিলেন যে রাতের মতো একটা ব্যবস্থা করা গেছে। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম না পেয়ে ঝগড়া করে একটা ওয়েটিং রুম খালি করে রেখেছেন। মামীর ইচ্ছায় তবু একবার স্টেশনের বাহিরে যেতে হল ডাক-বাংলোর চেষ্টায়। সেখানে স্থানাভাব। ফেরার পথে হালদার আমার হাত টেনে ধরলেন, বললেন : দাঁড়ান একটু, কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে!

তবে এখানে আর কে আছে মশাই!

তারপরেই চুপিচুপি বললেন, বুড়ী যদি টাকার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তো উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন।

কিসের টাকা।

লটারির মোটা টাকা পেয়েছেন, এই খবর রটিয়েছি।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম, এ যে মিথ্যে কথা। এ কথা আপনি কেন বললেন।

দূর মশাই! এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছি। বুড়ো আমাকে সন্দেহ করছিল কোন মতলব নিয়ে দেখাশুনো করছি। তাইতেই বললুম, খাতির করছি গোপালবাবুকে। এতে আপনারও মঙ্গল হবে মশাই, বুড়ীর নজরটা পালটাবে।

আমি তাঁকে সমর্থন করি নি, বলেছিলুম, ছি ছি!

পরদিন হালদার আরও একটা কেলেঙ্কারি করেছিলেন। চুপি-চুপি আমি যা কিছু লিখেছিলুম, সেই কথা প্রকাশ করে দিলেন হাটের মাঝে। হালদার কোথায় এ খবর পেলেন, সেই ভেবে আমার বিস্ময় জেগেছিল। স্বাতি এ কথা জানত, কিন্তু কাউকে আমার বই দেখায় নি। লেখক সম্বন্ধে সবার ধারণা নাকি ভাল নয়। অনেকে নাকি ভাবেন যে যারা কোন কাজের যোগ্য নয়, তারাই বসে বসে বই লেখে। একটা মাস্টার বা কেরানী হতে পারলেও তারা বর্তে যায়।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতি এ কথা গোপন করে তার দুর্বল মনের পরিচয় দিয়েছে। গরিব আত্মীয়ের পরিচয় দিতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে, বড়লোক হলে ফলাও করে বলে অনেক কথা। লেখক হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠা থাকলে স্বাতি হয়তো তার বাবা-মার কাছে আমার কথা লুকোত না। কিংবা সেই প্রতিষ্ঠার দিনের প্রতীক্ষা করে আছে। সেদিন কি আসবে।

কিন্তু ভেরাবলের ডাক-বাংলোর সেই পরিবারটি আমাকে

প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মান দিয়েছিলেন। মামা মামী সবই দেখলেন। দেখল স্বাতিও। আর মনে মনে হাসলেন হালদার। এক ঢিলে তিনি সত্যিই দু পাখি মেরেছেন। আমাকে সম্মান করে তিনি নিজে সম্মান পেয়েছেন। ঘৃণার বদলে সৌহার্দ্য। এই পরিবারে তিনি আর শত্রু নন। পরম মিত্র বলে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

হালদার ঠিকই বলেছিলেন। আমার সৌভাগ্যের সংবাদ পেয়ে মামীর নজর খানিকটা পালটাবে। যাচাই কিছুই করলেন না, সত্য বলে অনেক কিছু মেনে নিলেন।

সোমনাথের নূতন মন্দিরের পিছনে সমুদ্রের ধারে বসে আমরা গল্প করছিলুম। আমি আর স্বাতি। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। বড় রাস্তার উপরে সোমনাথের মেয়েরা নাচছে গরবা নাচ—

তালিউঁ না তালে গোরি
গবরে ঘুমি গায়রে
পূর্ণমনি রাত উগি
পূর্ণমনি রাত।

পিছনে হঠাৎ মামার কণ্ঠস্বর শুনলুম। ভূত দেখার মতো চমকে চেয়ে দেখি মামার সঙ্গে মামী আছেন, আছেন কালীঘাটের হালদারও। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, এখানে বসেও শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে!

ফিসফিসানি বটে! গভীর বনে অজগরের নিঃশ্বাসও বুঝি এর চেয়ে মিষ্টি হয়। স্বাতি চমকে উঠল। মামা হাসলেন নিঃশব্দে। আর মামীর মুখ দেখলুম অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি লজ্জা পেয়েছিলুম।

আরতি দেখে বাড়ি ফেরার সময় মামী আমাকে ডাকলেন গোপাল, তুমি বাবা এই গাড়িতে এস।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো স্বাতি আগেভাগেই এ গাড়িতে উঠেছিল। মামা উঠলেন হালদারের গাড়িতে।

সমুদ্রের ধারের প্রশস্ত পথ জ্যোৎস্নালোকে মাতাল হয়ে ছিল। বদ্ধ গাড়ির ভিতরেও যেন নেশা লাগছিল। কারও মুখে আর কথা নেই।

হঠাৎ স্বাতি বলল, সোমনাথে আমরা আবার আসব মা।

মামী আসব বললেন না, বললেন, এসো।

মুখে তাঁর প্রসন্নতা তখনও লেগে ছিল। এ তাঁর প্রসন্ন মনের প্রতিচ্ছবি।

স্বাতি গুনগুন করে গান ধরল। কথা নয়, শুধু সুর। কিন্তু কথাগুলি আমার জানা—

পূর্ণমনি রাত উগি
পূর্ণমনি রাত।

১৩

স্বাতির চেঁচামেচিতে আমি চমকে উঠেছিলুম। স্বাতি বলে উঠেছিল: গোপালদা ঘুমিয়ে পড়েছে মা, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি লজ্জা পেলুম খানিকটা, তারপরে ট্যাক্সির দরজা খুলে ঝুপ করে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখলুম, সামনে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া। এই গেটের এত ছবি দেখেছি যে একে চিনিয়ে দেবার আর দরকার নেই।

মামা আগেই নেমে পড়েছিলেন, বললেন: ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

স্বাতি বলল: দাঁড়িয়ে থাক এইখানে। চারি দিকটা আমরা দেখে শুনে ফিরে আসছি।

বলে সে এগিয়ে চলল।

তাকে অনুসরণ করবার আগে আমি চারিধারে চেয়ে দেখলুম: প্রশস্ত রাজপথ এসে সমুদ্রের ধারে শেষ হয়ে গেছে। ফাঁকা প্রশস্ত এক প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে এই ইণ্ডিয়া গেট। বড় বড় পাথরে তৈরি কিনা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। দু তিন তলার সমান উঁচু। আর সামনে তিনটি খিলান। ছোট দুটি দুধারে, মাঝখানেরটি বড়। তার দুধারে দুটি স্তম্ভ উঠেছে আরও উঁচুতে। কিছু কারুকার্যও দেখা যাচ্ছে। তারই পিছনে অকূল সমুদ্র।

মামী এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মামা বোধহয় আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন: অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ বল তো?

বললুম: ছবি দেখছি, চোখের সামনে এই প্রথম দেখলুম।

মামা বললেন: এ মুসলমানদের কীর্তি নাকি?

আমি বললুম : না। ইংরেজরা এই গেট তৈরি করেছিল।

কেন?

এখন সে প্রায় ইতিহাসের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রাজা পঞ্চম জর্জ কুইন মেরীকে নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। বম্বের অ্যাপোলো বন্দরে এসে তাঁরা নামবেন। তাঁদের সম্বর্ধনার জন্যে তৈরি হল এই গেট, নাম গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া। জাহাজ থেকে এই গেট দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষ দেখা যাচ্ছে। এই গেটের নিচে দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকতে হবে।

মামা বললেন : কিন্তু ধরনটা বিলিতি মনে হচ্ছে না।

বললুম : তা হবে না তো! একজন ইংরেজ স্থপতি তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গুজরাতী শৈলীতে। আমেদাবাদে আমরা যেমন দেখেছি, কতকটা সেই রকম। তখন মুসলমানী আমল বলেই আপনার এই কথা মনে হয়েছে।

খুশী হলেন মামা, বললেন : ঠিক ধরেছি দেখ।

বলে তিনিও এগোলেন। আর আমি তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলুম।

কাছে এসে দেখলুম যে মাঝের হলটি খুবই বড়, তার দুধারে খিলান। আর হলের ভিতরে পাঁচ-ছ শো মানুষ স্বচ্ছন্দে একত্র হতে পারবে। ওধারে পৌঁছে আরও আশ্চর্য হলুম আমরা। নীল সমুদ্র ছোট ছোট তরঙ্গ বিক্ষোভে উদ্বেলিত হচ্ছে সারাক্ষণ। আর অনেক নৌকো যাত্রী নিয়ে ছুটোছুটি করছে। পাল তোলা দেশী নৌকো নয়, কলের নৌকো। স্টীম লঞ্চ এগুলো। ঘাট থেকে যাত্রী সংগ্রহ করে সমুদ্রে খানিকটা ঘুরিয়ে আনছে। দূর থেকে ইণ্ডিয়া গেট আর তার পাশের বিরাট তাজমহল হোটেল দেখিয়ে ঘাটে এনে নামিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই স্বাতি বলল : যাবে গোপালদা?

কিন্তু মামী বাধা দিয়ে বললেন : না না, অন্ধকারে আর নৌকোয় উঠতে হবে না।

সত্যিই তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্র আর আকাশ অন্ধকারে একাকার হয়ে যাবে। আর সেখান থেকে এই শহরকে দিনের মতো আলোয় ঝলমল করতে দেখা যাবে। কল্পনায় আমি সেই দৃশ্য দেখলুম, কিন্তু মুখে কোন কথা বললুম না।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : এলিফেণ্টা কি এইখান থেকেই যেতে হয় ?

আমি বললুম : জানি না।

স্বাতি যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল : জান না ? সে কি গোপালদা ! তুমি জান না, এমন কথাও কিছু আছে !

আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই স্বাতিকে এই আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়ে ফেলেছি। এখন আর উপায় নেই। পরিহাস তার মেনে নিতেই হবে। বললুম : মৌর্য রাজারা যে পথ দিয়ে তাদের পুরীতে যেতেন, সে পথের ধারণা কিছু আছে। কিন্তু এখন যাত্রীরা কোন্ পথে যায় তা এই নৌকোওয়ালাদের কাছেই জেনে নিতে হবে।

মামা বললেন : দাঁড়াও একটুখানি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে মৌর্য রাজাদের প্রাসাদ ছিল এলিফেণ্টা দ্বীপে। এ কি ইতিহাসের কথা ?

স্বাতিও যে আশ্চর্য হয়েছিল, তা বুঝতে পারলুম তার দৃষ্টি দেখে। বললুম : ইতিহাসের কথা আমি পরেই বলব। আগে জিজ্ঞাসাবাদ করে খবরটা জেনে নিই। আমাদের ট্যাক্সি আবার অপেক্ষা করছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খবর সংগ্রহ করে আনলুম। এইখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে, লাক্সারি লঞ্চও আছে। সকাল সাড়ে আটটা

নটা ও সাড়ে নটায় যাত্রা, ফেরা একটা দেড়টা আড়াইটে। দুপুর দেড়টা ও আড়াইটেয় গিয়েও সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ফেরা যায়। ভাড়া সাধারণ লঞ্চে পাঁচ টাকা, আর লাকসারি লঞ্চে দশ।

সব শুনে স্বাতি বলল : কাল সকালে আমরা এলিফেন্টায় যাব।

আমি বললুম : সকালে তো মন্দিরে যাবার কথা।

ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। তবে আমরা দুপুরে যাব।

তারপরেই মামার দিকে তাকিয়ে বলল : কিংবা পরশু সকালে' পরশুর আগে তো বম্বে ছেড়ে যাচ্ছি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : সোজা দিল্লী, না কলকাতা ?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : গোয়া। বম্বে থেকে জাহাজে চেপে আমরা গোয়া যাব। বম্বের চেয়েও সুন্দর, এলিফেন্টার চেয়েও অ্যাডভেঞ্চারাস।

মামা তাঁর চোখ কপালে তুলে বললেন : গোয়া! এ আবার কবে স্থির হল ?

স্বাতি বলল : আজ আমরা স্থির করব। কিন্তু আর দেরি নয় গোপালদা, গাড়িতে বসে এ সব কথা হবে। অকারণে ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ছে।

বলে সে ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে চলল।

মামা তাকে অনুসরণ করে এগোবার সময় আমাকে বললেন : ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না গোপাল। গোয়া তো কাছে নয়, আর গোয়া যে আবার একটা দর্শনীয় স্থান—

বলে তিনি থামলেন।

স্বাতি ট্যাক্সির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল : উঠে পড় মা। অনেক সময় আমরা নষ্ট করেছি।

কোন কথা না বলে সবাই উঠে পড়লুম।

ড্রাইভার একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। মানে,

এবারে কোথায় যেতে হবে ? স্বাতি বলল : বড় বড় ঘর বাড়িগুলো চিনিয়ে দিতে দিতে ফিরে চল।

তারপরেই মামীকে জিজ্ঞাসা করল : বাজারে যাবে মা ? ক্রফোর্ড মার্কেটে ?

মামী বললেন : তাই চল।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে বুঝতে পেরেছে। আর বোধহয় সেই দিকেই চলল।

মামা গম্ভীর ভাবে কিছু ভাবছিলেন। স্বাতি আজ তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। সে আজ এমন একটা জায়গা দেখবার কথা বলেছে, যার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু মামা এই প্রস্তাব এক কথায় বাতিল করে দিতে পারেন নি। তিনি ভাবছেন। পথের দিকে যে মন দিতে পারছেন না, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু স্বাতি সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলল : গোপালদাকে আজ ভারি গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কেউ কোন কথা কইলেন না।

স্বাতি আমাকে বলল : সত্যিই যদি চাকরি যাবার ভয় পেয়ে থাক তো কাল তোমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দেব।

এ কথার কোন উত্তর দিতে হবে কিনা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমাকে রক্ষা করল ট্যাক্সির ড্রাইভার। সে বলল : চার্চ গেট থেকে আমরা ফ্লোরা ফাউন্টেন হয়ে এখানে এসেছি। এবারে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ স্টেশনের পাশ দিয়ে ক্রফোর্ড মার্কেটে যাব। পথের ধারে প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম ও জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি দেখতে পাবেন।

ব্যঙ্গ করে মামা বললেন : সব বুঝে গেলুম গোপাল, জলের মতো সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

মামীকে খুশী করবার জন্যে আমি বলতে পারতুম যে কাল তো

রায়কে খুঁজে বার করতে পারলেই আমাদের সমস্যা মিটে যাবে। সে-ই সব কিছু ভাল করে দেখিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু স্বাতির কথা মনে হতেই আমি সে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেললুম। বললুম : এ সব এক দিন আমাদের ভাল করে দেখতে হবে। ইচ্ছা করলে স্বাতি আমাদের সব দেখিয়ে দিতে পারবে।

স্বাতি বলে উঠল : তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না ভাবছ নাকি ?

বললুম : এমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

যানবাহনে পরিপূর্ণ বম্বের প্রশস্ত পথঘাট। কিন্তু কলকাতার পথের মতো একটুও নয়। অনেক সভ্য ও উন্নত সমাজের শহর বলে মনে হচ্ছে। যেন রাতারাতি শহরটা গড়ে উঠেছে, নানা ধরনের সুন্দর ঘরবাড়ি, নানা স্থাপত্য-শিল্পে তৈরি। কতকটা কলকাতার চৌরঙ্গী বা পার্ক স্ট্রীটের মতো, বড়বাজার বা বৌবাজারের মতো নয়। আমাদের ড্রাইভার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল, কিন্তু একই রকমের এলাকা শেষ হচ্ছিল না। পথের ধারের দোকানপাটে এখন আলো ঝলমল করছে। বড় বড় অফিসের দরজা গেছে বন্ধ হয়ে। এক জায়গায় এসে ড্রাইভার বলল : এই হল বোরি বন্দর—ডান দিকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন, আর বাঁ দিকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং।

স্টেশনের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে পারা যায় না যে একটি স্টেশন দেখছি। ঠিক তেমনি হল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং। গম্বুজ আছে, মিনারের মতো সূক্ষ্ম চূড়া আছে অসংখ্য। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে গথিক শৈলী সুন্দর ভাবে ঢুকে পড়েছে। স্বাতি বলল : এই রকমের ঘরবাড়ি দেখেছি মাদ্রাজের মেরিনায়।

মনে হল স্বাতি ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলুম না।

এই এলাকা পার হয়ে যেতে আমাদের একটুও সময় লাগে নি।

সোজা এগিয়ে গিয়ে আমরা ক্রফোর্ড মার্কেটে পৌছে গেলুম। ড্রাইভার এখানে অপেক্ষা করতে রাজী হল না। তাকে ছুটি দিতে হল।

কিন্তু বাজারের ভিতরে ঢুকে স্বাতির চক্ষু স্থির। এ তো কলকাতার নিউ মার্কেট নয়, এ কেমন বাজারে সে আমাদের নিয়ে এল! আর মামা ঠিক এই কথাই বললেন: এ কোথায় নিয়ে এলে? তোমরা কি মাছ তরকারী কিনবে, না ফল ফুল?

সমস্ত বাজারটা আমরা ঘুরে দেখলুম। শাকসব্জি ফলমূল মাছ-মাংস ও ডিম-মুরগি প্রভৃতি খাবার জিনিস ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলুম না। বাহিরেব ছোট ছোট দোকানপাট আছে, কিন্তু শৌখিন জিনিস নেই কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো। মামী বললেন: শাড়ির দোকান নেই?

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তার জন্যে অন্য বাজারে যেতে হবে। এমন কি যেখান থেকে আমরা এলুম, সেখানেও শাড়ির খুব ভাল ভাল দোকান আছে।

স্বাতি রেগে গেল, বলল: তবে এ বাজারের এত নাম কেন?

বললুম: মাদ্রাজের মুওর মার্কেটেরও তো এমনি নাম শুনেছিলুম।

কিন্তু সেখানেও শৌখিন জিনিস আছে।

তা আছে। তবে কেনার মতো সেখানেও কিছু পাও নি।

মামা বললেন: চল এবারে। হোটেলে ফিরে একটু আরাম করা যাক।

মামী খুশী হন নি। কাজেই বলতে পারলুম না, সেই ভাল।

একটা ট্যাক্সি ধরতে সময় লাগল খানিকটা। কিন্তু হোটেলে পৌছতে বেশি সময় লাগল না। এইটুকু পথ অতিক্রম করবার সময়েই আমি নিজের কর্তব্য ভেবে নিয়েছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে এভাবে একটা শহর দেখা সম্ভব নয়। দর্শনীয় স্থানগুলির

সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। কিংবা অভিজ্ঞ একজনের সাহায্য অপরিহার্য। তাই ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি সবার সঙ্গে নিজেদের ঘরের দিকে এগোলুম না। বললুম: আমার একটু ছুটির দরকার।

কেন?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর স্বাতি সকৌতুকে বলে উঠল: বুঝতে পারলে না বাবা! কাউকে ধরে সব কিছু জেনে নেবার মতলব।

বললুম: ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছেই মঙ্গলদাস মার্কেট, কাপড়ের বড় বাজার। জানা থাকলে ফিরে আসতে হত না।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: তাই নাকি!

আর স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এ খবর আবার কোথায় পেলে?

বললুম: ট্যাক্সি ধরার জন্যে যখন চেষ্টা করছিলুম, তখনি জেনে নিয়েছি। আর কাল সকালের জন্যেও ভাবনা নেই।

মামী বললেন: কী রকম?

বললুম: সকাল বেলায় তো আমরা মন্দির দেখতে বেরোচ্ছি—মুম্বই দেবী মহালক্ষ্মী ও বাবুলনাথের মন্দির দেখে ফিরব।

স্বাতি বলল: তবে আবার বেরোচ্ছ কেন?

মামা বললেন: না না, ওকে একটু স্বাধীনতা দাও।

বলে তিনি এগিয়ে গেলেন।

আর মামী স্বাতিকে বললেন: এস।

স্বাতি একবার আমার দিকে তাকাল, তারপরে কী একটা ভেবে মামীর সঙ্গেই এগিয়ে গেল।

১১

বাহিরে না গিয়ে আমি ম্যানেজারের ঘরে চলে এলুম। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনাদের কাছে কোন গাইড বই আছে?

আছে বৈকি।

বলে ম্যানেজার খান কয়েক বই তাঁর ড্রয়ার থেকে বার করে আমার হাতে দিলেন। একখানা পুরনো গাইড বই, সরকারী পুস্তিকা ও শহরের ম্যাপ। বললুম: চমৎকার; আমি এইখানে বসেই সব দেখে নিচ্ছি।

স্বচ্ছন্দে।

বলে ম্যানেজার তাঁর নিজের কাজে মন দিলেন।

বম্বের ইতিহাস আমি প্রথমেই পড়ে ফেললুম। তার পরে মানচিত্রটি দেখলুম খুঁটিয়ে। আমরা কোথায় আছি, আর দর্শনীয় স্থানগুলির অবস্থান কী রকম। পথঘাটের নামও কিছু পড়ে ফেললুম। তার পরে ছবি দেখতে লাগলুম পাতা উল্টে উল্টে। ছবিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুবিধা আছে। সে জায়গাটি দেখতে পেলেই চেনা যায়, কাউকে চিনিয়ে দেবার দরকার হয় না। এই সব ছবি আগে দেখা থাকলে আজ আমরা অনেক বাড়িঘর চিনতে পারতুম। মোটামুটি একটা ধারণা হবার পরই আমি উঠে পড়লুম। ধন্যবাদের সঙ্গে বইগুলি ফেরত দিয়ে বেরিয়ে এলুম ম্যানেজারের ঘর থেকে।

মনে তখন বল পেয়েছি অনেক। স্বাতিকে আর ভয় পাই নে। আমার অজ্ঞানতার জন্যে সে আর আমাকে উপহাস করতে পারবে না। জো রায়কেও আর ভয় পাবার দরকার নেই। গাইডের কাজ সে যত ভালই করুক, মামাকে সে খুশী করতে পারবে না। খুশী

করতে পারবে না স্বাতিকেও। যা কিছু দেখবার আছে, তার সবই সে দেখাতে পারবে। কিন্তু সে সব জায়গার সম্বন্ধে সব কথা সে বলতে পারবে না।

অন্যমনস্ক ভাবে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ স্বাতির হাসির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালুম, তার পরে ফিরে এসে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলুম।

মামী তখন জিজ্ঞাসা করছিলেন: পাগলের মতো হঠাৎ হেসে উঠলি যে?

স্বাতি বলল: গোপালদার কাণ্ড দেখলে না, আমাদের ঘর চিনতে না পেরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মামা আশ্চর্য হলেন তার কথা শুনে, আর মামী বললেন: ঘরের ভেতরে বসে ওকে দেখলি কী করে?

গোপালদাকে তো দেখতে পাই নি।

তবে?

পর্দার তলা দিয়ে ওঁর চটি দেখতে পেয়েছিলাম।

আমি লজ্জিত ভাবে বললুম: স্বাতি হেসে আমার উপকার করেছে।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: বোসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে। খুবই কাজের কথা।

স্বাতি তার চেয়ারখানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে বসল খাটের উপরে। আর আমি বসতেই মামা বললেন: নটায় খাবার দিতে বলেছি। হাতে এখনও অনেকটা সময় আছে। তুমি মৌর্য রাজাদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?

ঝোঁকের মাথায় যা বলতে শুরু করেছিলুম, তার বেশি কিছুই আমার জানা ছিল না। কোথায় পড়েছিলুম তাও ছিল না মনে। কিন্তু একটু আগে যা পড়ে এলুম, তা গজগজ করছিল মাথার ভিতরে। বললুম: বঙ্গের ভূগোল আর ইতিহাস দুটোই খুব বিচিত্র!

মামা বললেন : তবে একটা একটা করে বলছ না কেন ?

কাজেই কোন ভূমিকা না করে বললুম : ভূগোলের কথা দিয়ে বম্বের কথা শুরু করতে হয়। কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয় হল বম্বে শহর। এই দ্বীপগুলির নাম বেসিন ধারা ভে সল্‌সেট ট্রম্বে বম্বে ও এলিফেন্টা। অনেকে বলেন, না, বম্বে হল সাতটি দ্বীপের সমষ্টি এবং তাদের নাম হল কোলাবা ফোর্ট বাইকালা প্যারেল ওরলি মাতুঙ্গা ও মহিম। এ জায়গাগুলি এখন বম্বের এক একটি পাড়া। একখানা ম্যাপ থাকলে বুঝতে অসুবিধা হত না যে এই দুটো মতই ঠিক। একটা মত হল বম্বে শহর বলতে যা বুঝি তাই, আর একটা মত বৃহত্তর বম্বে সম্বন্ধে। উত্তরে বেসিন ক্রিক আর দক্ষিণে থানা ক্রিক ভারতবর্ষের মাটিকে বিচ্ছিন্ন করে একটি দ্বীপের আকার দিয়েছে। বম্বে থেকে বেসিন প্রায় তিরিশ মাইল দূরে। তাই বম্বে শহরের লোক ক্রিকের ওপারে অবস্থিত বেসিনকে বম্বে বলে স্বীকার করতে রাজী হচ্ছে না। এরই দক্ষিণে ধারা ভে সল্‌সেট হল প্রধান দ্বীপ, সবচেয়ে বড় এইটি। ইতিহাসে এই দ্বীপ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। এর দক্ষিণাংশে ট্রম্বে, আর বম্বে হল দক্ষিণের শেষ অংশ।

মামা বললেন : আরও একটু বুঝিয়ে বল। জিনিসটা চোখের সামনে ঠিক ফুটে উঠছে না।

বললুম : চোখের সামনে একটা ম্যাপ ফুটিয়ে তোলা তো কঠিন কাজ। তবুও চেষ্টা করছি। কন্যাকুমারীর মতো বম্বের শেষ প্রান্ত হল কোলাবা পয়েন্ট। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমরা পশ্চিমে দেখব অকূল আরব সাগর, কিন্তু পূর্বে ভারতবর্ষ। ছোটখাটো কয়েকটা দ্বীপ পেরিয়ে ভারতবর্ষের মাটি। দক্ষিণেও মেন ল্যাণ্ড বলা যেতে পারে। তার কারণ মাটি এখানে মাইল কয়েকের সমুদ্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

বম্বে শহরের পশ্চিম দিকেও আরব সাগর, কিন্তু তীরে মালাবার

ও কাম্বালা পাহাড়। মালাবার পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে, তার নাম মালাবার পয়েন্ট। এখানেও কোলাবা পয়েন্টের মতো তিন দিকে সমুদ্র। পূর্ব দিকের সমুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপসাগরের মতো। তারই নাম মেরিন ড্রাইভ। আমরা এখন এরই দক্ষিণ প্রান্তের কাছে আছি। কাল আমরা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে যাব। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে এই মন্দির, মন্দির থেকেই হয়তো সমুদ্র দেখা যাবে।

তারপর ?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন কৌতূহল নিয়ে।

বললুম : এইবারে আজ আমরা যেখানে গিয়েছিলুম, সেই দিকের কথা বলি। সেটা শহরের পূর্ব দিক। এখান থেকে সমুদ্র পেরিয়ে মেন ল্যাণ্ডে যেতে হলে আমরা এলিফেন্টা দ্বীপ দেখব মেন ল্যাণ্ডের খুব কাছাকাছি। ছোট ছোট আরও কয়েকটা দ্বীপ আছে এই সমুদ্রে। সেই সব দ্বীপে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থাও আছে। কোলাবা পয়েন্ট থেকে যদি আমরা পূর্ব উপকূল ধরে উত্তরের দিকে চলতে শুরু করি তো প্রথমে পাব সেসুন ডক। বম্বের সবচেয়ে পুরনো ডক এইটি। কিন্তু এখন আর জাহাজ ভেড়ে না এই ডকে। ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে জেলেরা সমুদ্রে যায় এইখান থেকে। অয়েস্টার রক ডল্‌ফিন লাইট ও মিডল্‌ গ্রাউণ্ড দ্বীপগুলিতেও যাওয়া যায় এইখান থেকে। আর এরই নিকটে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার অফিস।

উল্টো দিকে একটুখানি হেঁটে কোলাবা কজ্‌ওয়ে পেরিয়ে কাফ্‌ প্যারেডে পৌছ'না যায়। সমুদ্রের ধারে বম্বের শৌখিন পাড়া এটি। কিন্তু এ সমুদ্র উন্মুক্ত আরব সাগর নয়। ব্যাক বে নামে যে উপসাগরের ধারে মেরিন ড্রাইভ, তারই একটি অংশ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এর নাম ব্যাক বে রিক্লামেসন। মাটি ফেলে নতুন জমি বার করা হয়েছে এর দক্ষিণ অংশে। এর দক্ষিণে মিলিটারীর বাস।

তাদের ঘর বাড়ি ছাউনি হাসপাতাল। আমাদের মতো যাত্রীরা যায় কোলাবা অবজারভেটরি, আফগান চার্চ রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রভৃতি দেখতে।

সেসুন ডক থেকে খানিকটা উত্তরে গিয়ে পাওয়া যায় জামশেদজী বন্দর, তারপরেই অ্যাপোলো বন্দর। এইখানেই আমরা তাজমহল হোটেল আর গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া দেখেছি। গভর্ণমেণ্ট ডক ইয়ার্ড আরও খানিকটা উত্তরে। তারপরেই সমুদ্রের ধারে ফোর্ট জর্জ ও কাস্‌ল। পুরনো কাস্টমস্‌ হাউস, টাউন হল মিণ্ট—এ সবও কাছাকাছি। তারপরে সমুদ্রের ধারে বম্বের বন্দর—ব্যালার্ড পীয়ার, আলেকজান্দ্রা ডক, ভিক্টোরিয়া ডক, প্রিন্সেস ডক ও পি অ্যাণ্ড ও ডক ইয়ার্ড, লহরি বন্দর। ফেরি হোয়ার্ফ আলেকজান্দ্রা ডকে। এরই কাছে ক্রস আইল্যাণ্ড, তারপরে বুচেরা আর এলিফেন্টা। ফেরি হোয়ার্ফ থেকে এলিফেন্টা খুব কাছে, কিন্তু যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে কিনা জানা নেই।

স্বাতি বলল: নিশ্চয়ই আছে।

আমি বললুম: জোর করে বলা যায় না।

কেন?

এই দ্বীপটা আকারে বেশ বড়। বেকায়দা জায়গায় নামিয়ে দিলে যে বিপদে পড়তে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাতি বলল: বেকায়দা জায়গায় নামব কেন?

না নামলে ফিরে আসতে হবে।

বাধা দিয়ে মামা বললেন: যা জান তাই বলবে, না কিছু না জেনেই দুজনে তর্ক করবে?

স্বাতি বলল: কিছু না জেনেই তো গোপালদা সব বলে যাচ্ছে।

স্বাতির মন্তব্য উপেক্ষা করে মামা বললেন: তোমার ভূগোলের গল্প শেষ হয়ে থাকলে ইতিহাসের কথা শোনাও। সেই যে মৌর্য রাজাদের প্রাসাদের কথা বলেছিলে—

মামা থামবার পরে আমি বললুম : এলিফেন্টা দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে এখনও একটি জায়গার নাম মোরা, লোকে একে মৌর্য শব্দের অপভ্রংশ মনে করে। পুরাকালে নাকি এই দ্বীপের নাম ছিল মঙ্গলপুরী, রাজধানী ছিল মৌর্য ও চালুক্য রাজাদের। রাজধানী না হলেও এখানে একটি রাজপ্রাসাদ যে ছিল তা এখানকার প্রাচীন স্থাপত্যকলা দেখে সবাইকে মেনে নিতে হয়।

সবিস্ময়ে মামা বললেন : সত্যি নাকি !

আর স্বাতি বলে উঠল : রামায়ণের কালে কী ছিল, তা বললে না ?

এ তার কৌতুকের কথা। তবু উত্তর দিলুম : রামায়ণের কালে এ অঞ্চলের নাম ছিল অপরান্ত। রঘুবংশে আছে, অপরান্ত মহীপালব্যাজেন। কোঙ্কণ দেশের উত্তরাংশে ছিল এই অপরান্ত দেশ। কিন্তু তখন এখানকার সপ্তদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই সন্দেহ হয় যে এটি একটি পার্বত্য উপদ্বীপ ছিল, কোন ভূমিকম্পে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে এই উপদ্বীপটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন পরে আবার মানুষের চেষ্টায় এই দ্বীপগুলি যুক্ত হয়ে পুনরায় একটি উপদ্বীপে পরিণত হয়েছে -- বম্বে সিটি ও গ্রেটার বম্বে।

স্বাতি বলল : এসব কথা তুমি তৈরি করে বলছ না তো ?

আমি বললুম : কেউ নিশ্চয়ই তৈরি করেছে। তা না হলে আমরা জানলুম কী করে ! চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেল সপ্তদ্বীপের। লোকে বলল যে টলেমির লেখায় যে হেপ্টান-শিয়ার উল্লেখ আছে, তা এই বম্বেরই সপ্তদ্বীপ। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই বম্বের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

আমি থামতেই মামা বললেন : বল।

বললুম : প্রস্তর যুগেও এখানে মানুষের বাস ছিল। মাটি দিয়ে ব্যাক বে ভরবার সময় পাথরে তৈরি যে সব যন্ত্রপাতি পাওয়া

গেছে, তাতে প্রমাণ হয়েছে যে সে মানুষেরা ছিল গুহাবাসী। বম্বের আদিবাসী কোলিরা হল তাদেরই বংশধর। যে পাড়ায় তারা বাস করত, তাদের নামে সে পাড়ার নাম হয়েছে কোলাবা। মাছ ধরে এখন তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা ছাড়াও আদিবাসী আছে বম্বেতে—ভাণ্ডারীরা তাড়ির কাজ করত, এখন চাষবাস আর মজুরের কাজ করে। কুলবি ও ঢেডরা তাদের পুরনো চাষবাসের কাজই করে যাচ্ছে।

আর্যরা বোধহয় এখানে এসেছিল খ্রীষ্টের জন্মের হাজার খানেক বছর আগে। সল্‌সেটের বর্তমান নাম কল্যাণ। সেখান থেকে তারা বাণিজ্য করত ব্যাবিলন পারস্য ও মিশরের সঙ্গে। চতুর্থ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে এই জায়গা ভৃগুকচ্ছের মতোই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকেরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে সে যুগে এই অঞ্চল সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারপর সাতবাহন রাজারা অপরান্ত অধিকার করল। আরও উন্নতি হল এই অঞ্চলের। মধ্য প্রাচ্য ও মিশর থেকে গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হল। তারপরে এল মৌর্য ও চালুক্যরা।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল: রাত অনেক হয়েছে গোপালদা, তোমার ইতিহাস একটু তাড়াতাড়ি শেষ কর।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম তারকথা শুনে, কিন্তু মামা বললেন: এমন কিছু রাত হয় নি। ধীরে ধীরেই বল।

বললুম: ইতিহাসে পড়ি নি, এমন একটি রাজবংশের নাম আছে এই দিকে—থিলহারা রাজবংশ। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা রাজত্ব করেছেন। তারপরে আলাউদ্দীন খিলজীর তাড়া খেয়ে দক্ষিণদেশ থেকে ভীমদেব এসে এখানে রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে বর্তমান মহিমের নাম ছিল মাহিকাবতী। তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে, আর আছে তাঁর গৃহদেবতা প্রভাদেবীর মন্দির। ভীমদেবের

উত্তরাধিকারী নগরদেবের সময়েই এই নগরীর পতন হল গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহর কাছে। কিন্তু সুলতানরাও বেশি দিন বম্বে অধিকার করে থাকতে পারে নি। এক দিকে মারাঠা, অন্য দিকে পর্তুগীজরা যুদ্ধ করেই যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজরাই বম্বে অধিকার করে বসল।

মামা বললেন: সে কি, ভারতে পর্তুগীজের দখলে তো ছিল গোয়া দমন আর দিউ।

বললুম: ঠিক কথা। এই তো সেদিন তারা এই অধিকার ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু বম্বের অধিকার ছাড়তে হয়েছিল তিন শো বছরেরও বেশি আগে।

কেন?

বললুম: ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিন ডি ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করে যৌতুক পেয়েছিলেন এই বম্বে। কিন্তু সরাসরি অধিকার পান নি, বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। কতকটা জোর করে পর্তুগীজদের এখান থেকে তাড়াতে হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকেরা সুরাত থেকে বম্বেতে এসে জাঁকিয়ে বসল। তারপর থেকে ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে এই বন্দরের।

ঠিক এই সময়ে আমাদের ঘরের দরজায় কেউ টোকা দিল। স্বাতি বাহিরে গিয়ে দেখে এসে বলল: বেয়ারা জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কি ডাইনিং হলে যাব, না ঘরেই খাব।

উত্তর মামী দিলেন, বললেন: ঘরেই খাবার দিতে বল।

স্বাতি এই হুকুম দিতেই বেয়ারা ঘরে ঢুকে দুখানা টেবিল জুড়ে চলে গেল। স্বাতি বলল: হাত মুখ ধুয়ে এস গোপালদা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বলে নিজেও বাথ-রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি গেলুম পাশের ঘরে।

১২

সকাল বেলায় স্বাতির তাড়াতেই তাড়াতাড়ি বেরোতে হল। বলেছিল : মা কিন্তু কিছু না খেয়ে বেরোবেন, বেশি দেরি করলে চলবে না।

আমরা তিনজনে চা খেয়েছিলুম, মামী খান নি। সকাল বেলায় মন্দিরে যাবার কথায় তিনি খুশী হয়েছিলেন। পুজো দেবেন মন্দিরে, তাই নিজে কিছুই খেলেন না। এই তাঁর অভ্যাস। স্বাতি জানে, আমিও জেনেছি। এই কথাই স্বাতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

হোটেলের বাহিরে আমরা একখানা ট্যাক্সি ধরে চেপে বসলুম। বললুম : সোজা চল মুম্বই দেবীর মন্দিরে।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই মামী বললেন : মুম্বই দেবী কোন্ দেবতা গোপাল ?

বললুম : মুম্বই দেবী হলেন ভবানী বা পার্বতী, বোম্বাইয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। তাঁরই নামে শহরের নাম হয়েছে।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : উঁহু, হল না।

তবে ?

বলে আমি পিছন ফিরে স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : গাইড হয়ে সামনে বসেছ, ফাঁকি চলবে না।

বললুম : দেবীর নাম হল মহা অম্বা, তার থেকেই মম্বা বা মুম্বা আই। আদিবাসী কোলিদের ইষ্ট দেবতা ছিলেন তিনি।

স্বাতি বলল : কোলিদের দেবতা হলে কোলাবায় তাঁর মন্দির নয় কেন ? আমরা তো এখন উল্টো দিকে যাচ্ছি।

বললুম : ঠিক কথা। কলবা দেবী রোড ধরে আমরা এখন

উত্তরে জলেশ্বরের দিকে যাচ্ছি। জাভেরি বাজারে নেমে মন্দিরে যাব। আসলে এই মন্দির জগদম্বার মন্দির, মুম্বা দেবীকে এনে এইখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কেন?

সাহেবরা বলে যে এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন সেইখানে ছিল মুম্বা দেবীর মন্দির। একটি পুষ্করিণীও ছিল। সোয়া দু শো বছর আগে পুরনো শহরের দেওয়াল যখন বাড়ানো হয়, তখন মুম্বা দেবীকে সরাতে হয়েছিল। এখন তিনি যে মন্দিরে আছেন, সে মন্দিরের বয়সও দু শো বছরের বেশি। কিন্তু মুম্বা দেবী এখন আর শুধু কোলিদের দেবতা নন, বম্বের সমস্ত ব্যবসায়ীদেরই তিনি দেবতা। তাঁর এখন অনেক জাঁক।

জাভেরি বাজারে সোনা-রূপোর দোকান। মামীকে এই খবর দিতেই তিনি উৎসাহ পেলেন, বললেন: বম্বের গহনা শুনেছি কলকাতার চেয়েও ভাল।

স্বাতি বলল: নামেই ভাল।

মামা বললেন: তবে একটা ভাল দোকানে নিয়ে চল না গোপাল?

মামা সত্যি বলছেন, না তামাসা করছেন, তা বোঝবার জন্যে পিছন ফিরে তাকাতেই মামী বললেন: দোকানে কি যাব না ভেবেছ! তোমার গাঁটের কড়ি এইখানেই শেষ করে যাব।

ট্যাক্সির ড্রাইভার আমাদের এমন জায়গায় নামিয়ে দিল যে কোন্ দিকে মন্দির তা বুঝতে পারলুম না। সে নিজেই বলল: মন্দির এই গলির ভিতরে, গাড়ি যাবে না।

মামা বললেন: ট্যাক্সি কি দাঁড়াতে বলবে?

কিন্তু ড্রাইভার রাজী হল না। বলল: ট্যাক্সি আপনারা দুধারেই পাবেন। যদি মহালক্ষ্মী যেতে চান তো ওধারে গিয়ে ট্যাক্সি ধরবেন।

কাজেই তাকে বিদায় দিয়ে আমাদের হেঁটে এগোতে হল।

কয়েক পা এগিয়েই মন্দির। একেবারে পথের উপরেই দেবতার দর্শন হল। কোন ব্রাহ্মণ নেই, নেই কোন দেউল বা গর্ভগৃহ। বাহিরে দাঁড়িয়েই দেবতার দর্শন হল। মাঝখানে জগদম্বা, মুম্বা দেবী তাঁর ডান দিকে। মামীর জন্যে পুজার ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু মনে হল, তিনি খুব তৃপ্ত হলেন না।

এবারে আমরা অন্য পথে বেরিয়ে এলুম। এ ধারটায় বাজার নেই, খোলামেলা। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার মধ্যে দোতলা স্কুলবাড়ি আছে। তারই পাশ দিয়ে পথ ঘুরে সদর রাস্তার দিকে গেছে। স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল: দেখ দেখ, মন্দির দেখ এইখান থেকে।

সবাই থমকে দাঁড়ালুম। আর পিছন ফিরে দেখলুম মুম্বা দেবীর মন্দির। ধনীর বাসগৃহের মতো মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, তারই এক ধারে চূড়া উঠেছে কারুকার্যময়। কতকটা বিশ্বনাথের মন্দিরের মতো চূড়া, কিন্তু আরও সূক্ষ্ম হয়ে উপরে উঠেছে। কাছে থেকে যত উঁচু দেখলুম, দূরে গিয়ে দেখলুম আরও উঁচু। পরে মনে পড়েছিল যে এই মন্দির সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীও দেখেছিলুম মানচিত্রে। কিন্তু তখন মনে ছিল না বলে সে কোন্ দিকে তা দেখবার চেষ্টা করি নি।

ট্যাক্সির জন্যে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমরা তাতে উঠে বসলুম।

কিন্তু স্বাতি আমাকে নীরবে থাকতে দিল না, বলল: গোপালদা, মুম্বই থেকে বম্বে নাম আমার পছন্দ হল না। এ ঠিক গোঁজামিল বলে মনে হচ্ছে।

বললুম: তারও জবাব আছে। পর্তুগীজ ভাষায় বম্ বাহিয়া মানে সুন্দর উপসাগর। কিন্তু পর্তুগীজরা এসে এই শহরের নাম

রাখল, আর তার আগে কোন নাম ছিল না, তা মেনে নিতে ইচ্ছে করে না।

মামা বললেন : ঠিক কথা।

বললুম : তাহলে তো বলতে পারি যে এ দিকে সরু সরু আঙুলের মতো যে মাছ পাওয়া যায়, তারই বম্বেলি নাম থেকে শহরের বম্বে নাম হয়েছে। এই মাছকে এখন বলে বম্বে ডাক।

স্বাতি বলল : এ একেবারে আজগুবি কথা।

বললুম : তবে এ আলোচনাই থাক।

বলে আমি মানচিত্রটি মনে করবার চেষ্টা করলুম। আমরা এখন উত্তরে বম্বে সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে চলেছি। রেল লাইন পেরিয়ে আমাদের সমুদ্রের দিকে যেতে হবে। মালাবার হিলের উত্তরে কাম্বাল্লা হিল। তারই কাছে মহালক্ষ্মী মন্দির। বম্বে সেন্ট্রাল ছেড়ে আরও উত্তরে গেলে মহালক্ষ্মী নামেও একটি রেল স্টেশন আছে। তার পশ্চিমে মহালক্ষ্মী রেস কোর্স, আর উত্তরে বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম। রেলের ওয়ার্কশপ আর অনেকগুলি মিল ও ফ্যাক্টরি আছে এই অঞ্চলে। কিন্তু সে দিকে আমাদের যেতে হল না। বম্বে সেন্ট্রাল স্টেশন পৌঁছবার আগেই আমরা রেল লাইন পেরিয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : গোপালদা রেগে গেছে বাবা।

মামা বললেন : তাই নাকি ?

কিন্তু আমি কোন কথা বললুম না। আমি দেখছিলুম যে শহরটা যেন পরিচিত হয়ে গেছে। একটু আগে কলকাতার বড়বাজারের মতো যে ঘিঞ্জি অঞ্চল দেখেছিলুম, এখানে তেমন নয়। এখানে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে, খোলামেলা পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া নতুন শহরের মতো। দেখতে দেখতেই আমাদের ট্যাক্সি এসে মন্দিরের কাছাকাছি দাঁড়াল। মামা বললেন : এখানেও কি ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে নাকি ?

আমি বললুম : ভরসা পাচ্ছি নে।

মামা বললেন : সেই ভাল। একেই ধরে রাখ।

ট্যাক্সির ড্রাইভারও দেখলুম ছেড়ে দেবার কথা বলল না। আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম।

মনে হল যে পাহাড়ের উপরে একটি সমতল ভূমিতে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। পিছনে শুধু আকাশ। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মন্দিরটি প্রাচীন নয়, এক নজরে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আধুনিক কালে নির্মিত হয়েছে। মসৃণ শিখর আছে, আর সামান্য কারুকার্য। কিন্তু এ সব দেখবার আগে মামীকে আমি ফুল ও পূজার উপকরণ কিনে দিলুম। মামার সঙ্গে তিনি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

আমিও মন্দিরের দিকেই যাচ্ছিলুম। কিন্তু স্বাতির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি তাকে। মন্দিরের পিছনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ডাকছে : এই দিকে এস গোপালদা, অদ্ভুত দৃশ্য।

তাড়াতাড়ি আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : দেখ।

দেখলুম, সত্যিই অদ্ভুত দৃশ্য। আমরা যেন কোন মাথা-কাটা পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। নিচে খানিকটা আর্দ্র জমির পরে সমুদ্র। সমুদ্রের ধারে ধারে এই আর্দ্র জমি, আর শহরটি যেন পাহাড়ের উপরেই গড়ে উঠেছে। মনে পড়ল যে মালাবার হিল থেকে কাম্বাল্লা হিল পর্যন্ত একটি পাহাড় বম্বের পশ্চিম সীমান্তটি এই ভাবেই রক্ষা করছে। এই পাহাড়ের একেবারে উত্তর প্রান্তে এই মহালক্ষ্মীর মন্দির।

উত্তরের দিকে দেখিয়ে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ওটা কী গোপালদা?

তার প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম। আমরা দুজনেই এখানে

নতুন। সে যা জানে না, আমারও তা জানবার কথা নয়। কিন্তু স্বাতি আমার হাসি দেখে জিজ্ঞাসা করল : হাসলে যে ?

বললুম : আমি তো জো রায় নই।

জো রায় কি বলতে পারবে মনে কর ? পারবে না।

আর আমি ?

তুমি পারবে।

বলে স্বাতি গভীর বিশ্বাসে তাকাল আমার দিকে।

আর আমি ততোধিক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম : কেন এমন ভাবছ ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি হাসল, বলল : বল এইবারে।

বললুম : মামা হাজি আলির কবর ও মসজিদ।

মামা হাজি আলি কে ?

কোনও পীর হবে। তাঁর নামে একটা পার্কও আছে কাছে।

দেখ দেখ।

বলে স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই দিকে। আর আমি দেখলুম যে সরু একটি পথ ধরে অনেক স্ত্রী পুরুষ সেই মসজিদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফিরছেও অনেকে। এত নিচুতে সেই মসজিদ যে মনে হল জোয়ারের সময় সেই মসজিদটি জলের মাঝে থৈ থৈ করে, আর পথটি ডুবে যায় জলে। এখনও ভিজে দেখাচ্ছে পথ, বালি না কাদা তা বোঝা যাচ্ছে না।

পিছনে হঠাৎ মামার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। তিনি এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন : কী গল্প হচ্ছে তোমাদের ?

তাঁর পিছনে আমি মামীকেও দেখতে পেলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে তিনটি মূর্তি কেন গোপাল ?

লজ্জিত ভাবে বললুম : মহালক্ষ্মীর দুই বোন আছে শুনেছি।

কিন্তু মামী বললেন : লক্ষ্মীর বোন তো সরস্বতী, কিন্তু আর একটি বোন কে ?

বললুম : যমুনাও হতে পারেন। কিন্তু সঠিক জানি নে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : মহালক্ষ্মীর দুই বোনের কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?

বললুম : এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে একটি গল্প পড়েছি।

স্বাতি বলল : গাড়িতে বসে তোমার গল্প শুনব। আগে মহালক্ষ্মীর দর্শন করে আসি।

বলে তরতর করে সে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

বললুম : আপনারা গাড়ির দিকে এগোন। আমিও একটা প্রণাম করে আসি।

বলে আমি স্বাতিকে অনুসরণ করলুম।

বাহিরে আমাদের ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে বসে আমরা বাবুলনাথের মন্দিরে যাবার নির্দেশ দিলুম। আর গাড়ি চলতে শুরু করতেই মামা বললেন : এইবারে তোমার মহালক্ষ্মীর গল্প বল।

গল্পটি আমি গাইড বইএ পড়েছিলুম। সংক্ষেপে সেই গল্প বললুম।

প্রায় আড়াই শো বছর আগের কথা। মহালক্ষ্মী থেকে ওরলি পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা হবে। কোলাবাতে যেমন কজওয়ে তৈরি হয়েছিল, কতকটা তেমনি। যতবারই চেষ্টা হচ্ছে, ততবারই ভেঙে যাচ্ছে রাস্তা। নাস্তানাবুদ হয়ে গেল হর্নবি সাহেব। শেষে এক দিন স্বপ্ন দেখল রামজী শিবাজী নামে প্রভু সম্প্রদায়ের একজন ঠিকাদার। দেবী মহালক্ষ্মী স্বপ্ন দিয়েছেন যে মাটির নিচে থেকে তাঁর ও তাঁর দুই বোনের মূর্তি উদ্ধার করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলে তারা সেই জায়গায় পুল বা রাস্তা তৈরি করতে সক্ষম হবে। ঠিকাদার সেই স্বপ্নের কথা গভর্নর সাহেবকে বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে এইখানে তৈরি হয়ে গেল মহালক্ষ্মীর মন্দির।

তার পর ?

বলে স্বাতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

বললুম : তার পরে আর কোন বাধা রইল না। রাস্তা তৈরি হল নির্বিঘ্নে। তার নাম হল হর্নবি ভ্যালার্ড।

ভ্যালার্ড মানে কী ?

ভ্যালার্ড কথাটা পর্তুগীজ ভ্যালাডো থেকে এসেছে। তার মানে বেড়া বা ফেন্স্। সমুদ্রের ধারে ব্রীচ ক্যাণ্ডি আর হর্নবি ভ্যালার্ডের মাঝখানে হল মহালক্ষ্মীর মন্দির।

কিন্তু আমরা উত্তরে হর্নবি ভ্যালার্ডের দিকে না গিয়ে দক্ষিণে ব্রীচ ক্যাণ্ডির দিকেই চললুম। এরই কাছে পার্সি হাসপাতাল। এক জায়গায় রাস্তার নামটি লেখা দেখলুম—ভুলাভাই দেশাই রোড। খানিকটা দক্ষিণে এসে পৌঁছলুম কেম্প্স্ কর্নারে, আরও খানিকটা দক্ষিণে এসে রাস্তার ধারেই আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

মামা বললেন : এ কোথায় এলুম ?

কোন মন্দির দেখা যাচ্ছিল না বলেই এ কথা বলেছিলেন। তা বুঝতে পেরে ড্রাইভার বলল : ওধারে মন্দিরে ঢোকবার রাস্তা।

মামা বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে থাক বাপু, আমরা দেরি করব না।

ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলতেই সে রাজী হল। আমরা রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গিয়েও মন্দির দেখতে পেলুম না। ধনীর বাসগৃহের মতো বাড়ি, গেট আছে, তার পরে পথ ক্রমশ উপরে উঠেছে। সেই পথের দিকে তাকিয়েই মামা বললেন : এ যে স্বর্গের দিকে চলেছে দেখছি।

কিন্তু তখন আমি জানতুম না যে পার্সিদের টাওয়ার অব সাইলেন্সে উঠবার সিঁড়ি এর কাছেই কোথাও আছে। জানা

থাকলে দেখে নিতুম সেই সিঁড়ি। আর স্বাতি অন্য কিছু দেখে চেঁচিয়ে উঠল : দেখ দেখ, কী তৈরি করছে এরা।

এলাচ দানা। দেবতার ভোগে দেবার জন্যে কয়েকজন লোক পথের পাশেই এলাচ দানা তৈরি করছে। মামা বললেন : আমি দাঁড়াচ্ছি এইখানে, তোমরা দেখে এস।

বুঝতে পারলুম যে উপরে উঠবার ভয়েই মামা বাবুলনাথ দর্শনের আশা ত্যাগ করলেন। মামী বললেন : বুড়ো বয়সেও তোমার ধর্মজ্ঞান হল না।

মামা উত্তর দিলেন : ভুলে যাচ্ছ কেন, সতীর পুণ্যেই পতির পুণ্য।

আমরা উপরে গিয়ে বাবুলনাথ শিব দর্শন করলুম। মামী প্রসন্ন হলেন এইখানে। বললেন : শিবের দর্শন না হলে মন যেন ভরে না।

একেবারে নতুন মন্দির এটি, এই শতাব্দীরই প্রথমে তৈরি। এর চেয়ে প্রাচীন শিব এখানে আরও আছেন। মুম্বই দেবীর মন্দির ছাড়িয়ে জলেশ্বর শিব, আর মালাবার হিলের দক্ষিণে ওয়ালকেশ্বর শিব। বালুকা-ঈশ্বর থেকেই ওয়ালকেশ্বর নাম হয়েছে। কিন্তু এ সব কথা আমি মামীকে বললুম না।

যে পথে আমরা উপরে উঠেছিলুম, সে পথে ফিরলুম না। ফিরলুম অন্য পথে। কিন্তু দুটো পথই এসে এক জায়গায় মিলেছে। তারই কাছাকাছি মামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন : সোজা হোটেলে চল।

আর কোন মন্দির নেই ?

বলে মামী আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগেই মামা বললেন : সকাল থেকে এত বেলা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে আছ, আর দেরি করলে অসুখ করবে।

কাজেই কোন প্রতিবাদ না করে আমরা ফেরার জন্যেই গাড়িতে উঠে বসলুম।

ওয়ালকেশ্বর শিবেরও একটা প্রতিষ্ঠার গল্প আছে। সীতা উদ্ধারের জন্যে বেরিয়ে রাম এইখানে নাকি কয়েকদিন বাস করেছিলেন। প্রতিদিন রাতে লক্ষ্মণ তাঁকে একটি করে কাশীর শিবলিঙ্গ দিতেন পূজার জন্যে। কিন্তু সেদিন রাতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাম তাই বালুকা দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করেছিলেন।

শোনা যায় যে পর্তুগীজরা এখানে আসবার পরে সমুদ্র থেকে এই শিবলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অত্যাচারের প্রতিবাদে। এই মন্দিরের নিকটে যে ছোট পুষ্করিণী আছে, তাও রামের কীর্তি। তৃষ্ণার জলের জন্যে বাণ নিক্ষেপ করে তিনি এই পুষ্করিণী সৃষ্টি করেন। তাই এর নাম হয়েছে বাণ তীর্থ।

ট্যাক্সি আমাদের ঊর্ধ্বশ্বাসে হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল। মেরিন ড্রাইভ আমরা ভাল করে দেখতে পেলুম না। অ্যাকোয়েরিয়ামটিও দেখবার ইচ্ছা ছিল, তাও হল না।

১৩

মেরিন ড্রাইভে অ্যাকোয়েরিয়াম দেখা হয় নি বলে স্বাতি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু জোর করে সেখানে নামতে পারে নি। সকালে কিছু না খেয়ে মামী বেরিয়ে পড়েছিলেন। বেলাও হয়েছিল অনেক। তাই বলেছিল: বিকেলে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

মামা বলেছিলেন: কেন বল তো?

তা না বেরোলে অ্যাকেয়োরিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে মামা বললেন: বিকেলের চা খেয়ে বেরোনো যাবে।

কিন্তু স্বাতি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বলল: বিকেল চারটেয় বন্ধ হয় না পাঁচটায়, তা জেনে আসতে হবে গোপালদা।

মামী বলে উঠলেন: ভর দুপুরে তোমরা আবার বেরোবে নাকি?

স্বাতি বলল: গোপালদা তো বেরোবে বলছিল, তাই এ খবরটাও আনতে বলছি।

দুপুরে বেরোবার কথা আমার মনে পড়ল। হোটেলে ফিরেই মামী আমাকে জো রায়ের খবর নিতে বলেছিলেন। আমি টেলিফোনে ভদ্রলোককে পাই নি। তিনি অফিসে নেই, এ খবরটিই শুধু জেনেছিলুম। ফিরে এসে মামীকে এই কথা বলতেই স্বাতি বলেছিল, অফিসে গিয়ে খবর নাও।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম তার কথা শুনে। তবু বলেছিলুম, সেই চেষ্টা করব।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার অন্য কথা মনে এসেছিল। কাল

বিকেলে স্বাতি আমাকে যা বলেছিল তার সঙ্গে এ কথার কোন মিল নেই। সে তো স্পষ্ট ভাবেই বলেছিল যে জো রায় এসে উপস্থিত হলে সে মোটেই খুশী হবে না। স্বাতি কি তাহলে সত্যি কথা বলে নি, না এখন তামাসা করছে আমার সঙ্গে! সামলে নিতে আমার সময় লাগল না, বললুম: জো রায়কে ধরতে পারলে আমাদের আর কোন ভাবনা থাকবে না।

বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

মামা তখন পাইপ ধরাচ্ছিলেন, মনে মনে বিরক্ত হলেন বলে আমার মনে হল। অন্য দিন হলে এ সময়ে আমাকে ছেড়ে দিতেন না, এ সময়ে তাঁকে কিছু শোনাতেই হত। কিন্তু আজ যেন কিছু দেখতেই পেলেন না, এমনি ভাবে বসে রইলেন।

হোটেল থেকে বেরোবার আগে আমি ম্যানেজারের ঘরে এসে বসলুম। বললুম: আপনার গাইড বইগুলো আর একবার দেবেন?

বাই অল মীনস্।

বলে ভদ্রলোক সেগুলো তাঁর ড্রয়ার থেকে বার করে দিলেন।

কিন্তু বইএর পাতা ওল্টাতে গিয়ে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। স্বাতি কি আমাকে নিয়ে খেলা করছে! কিন্তু কিসের খেলা! আর কেন খেলা! আমি তো রাণা নই, জো রায়ও নই। আমি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও নই। আমি তাদের ভ্রমণের সঙ্গী। বেড়ানো শেষ হয়ে গেলেই যে যার মতো ফিরে চলে যাব। তার পরে আবার তাদের সঙ্গে এমনি করে বেড়াব কিনা, তা আমার বিধাতাই জানেন।

কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ক্ষত যেন খচখচ করে উঠছে। কবে কোথায় কেমন করে এই ক্ষত হয়েছে তা মনে করতে পারলুম না। আর আশ্চর্য হলুম এই ভেবে যে সব সময় এই বেদনা থাকে না। বেদনার কথা ভুলেই থাকি সারাক্ষণ।

কোলের উপরে বই নিয়ে আমি কতক্ষণ বসেছিলুম জানি নে।

ম্যানেজার আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন : শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।

আমাকে বলছেন ?

বলে আমি সোজা হয়ে বসলুম।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : সারা সকাল ঘুরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটুখানি ঘুমিয়ে নিলে আবার তাজা মনে হবে।

লজ্জা পেয়েও আমি উঠলুম না। বললুম : আমাকে একবার বেরোতে হবে কিনা। ঘুমের ঘোরটা তাই কাটিয়ে নিচ্ছি।

তার পরে জো রায়ের অফিসের অবস্থানটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলুম। আর অ্যাকোয়েরিয়ামের সময়টা দেখে নিলুম একখানা পুস্তিকায়। সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। বন্ধ থাকে সোমবারে। আজ তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। বইপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আমি উঠে পড়লুম।

বেশিদূর আমাকে যেতে হল না। ফ্লোরা ফাউণ্টেনের কাছেই জো রায়ের অফিস। খোঁজ করে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কী সুন্দর সাজানো ঘর ঝকঝক তকতক করছে। কিন্তু সাহেব নেই। তার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেণ্টের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি বলল : সাহেব টুরে গেছেন। তবে আজই ফেরার কথা ছিল। ফিরেছেন কিনা জানা যায় নি।

তার বাড়ির ঠিকানা চাইব কিনা ভাবছিলুম। এই সময়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল : কিছু বলতে হবে ?

একটু ইতস্তত করে বললুম : তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা পেতে পারি ?

মেয়েটি আমার আপাদমস্তক দেখে বলল : তিনি পছন্দ করেন না।

আচ্ছা।

বলে আমি পিছন ফিরেছিলুম। কিন্তু মেয়েটি বলল : আপনার কার্ড রেখে যেতে পারেন।

তা পারি। কিন্তু স্বাতির কথা মনে পড়তেই বললুম : ধন্যবাদ।

তারপরেই বেরিয়ে এলুম তার অফিস থেকে।

কেন জানি না, হঠাৎ আমার নিজের অফিসের কথা মনে পড়ল। কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা পুরনো বাড়ির মধ্যে এই অফিস। একটা বড় হলঘরে সারি সারি টেবল চেয়ারের মধ্যে আমার জন্যেও একটি কাঠের চেয়ার নির্দিষ্ট আছে। আজ কেউ আমার খোঁজ নিতে গেলে আমার পাশের সহকর্মী বলবে, অনেক দিন আগেই তো ফেরার কথা ছিল, কেন ফিরছে না জানি না।

আমার মনে হল, জো রায়ের অফিসে আমাকে একটুও মানায় নি। তার পি. এ. এ কথা বুঝতে পেরেছে বলেই আমাকে বসতে বলে নি, তার বাড়ির ঠিকানাও দেয় নি আমাকে। আমার সামাজিক মর্যাদা অনুমান করে নিতেও তার বিলম্ব হয় নি। তার মানুষ চেনার দক্ষতা আমি মনে মনে স্বীকার করে নিলুম।

কিন্তু এখন আমার হোটেলে ফিরলে চলবে না। সবাই বিশ্রাম করছেন। এমন কোন জরুরি খবর নেই যে কারও ঘুম ভাঙাবার দরকার আছে। হঠাৎ আমার গোয়ার কথা মনে পড়ল, গোয়ার জাহাজের কথা, ফেরি হোয়ার্কের কথা। মনে হল যে এই খবরটা সংগ্রহ করে আনতে পারলে মন্দ হত না। স্বাতিকে খুশী করতে পারব এই সংবাদ দিয়ে।

দেরি না করে, আমি একটা বাসে উঠে পড়লুম। তারপরে বাস বদল করে কর্নাক ব্রিজ পেরিয়ে ফেরি হোয়ার্কের কাছাকাছি এসে নামলুম। ভিতরে যেতে হল হেঁটে। আলেকজান্দ্রা ডকের মধ্যে এই ফেরি হোয়ার্ফ। রেল স্টেশনের মতো ওয়েটিং রুম আছে, বুকিং অফিস আছে, ফলের দোকান আছে। কিন্তু জলে

জাহাজ একখানাও দেখলুম না। জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করে নিলুম।

চৌওলে কোম্পানীর জাহাজ প্রতিদিন সকালে ছাড়ে। আর পরদিন ভোর বেলায় পৌঁছয় গোয়ার রাজধানী পানাজি। কোঙ্কণ উপকূলের আরও কয়েকটি জায়গায় দাঁড়ায় এই জাহাজ। সে সব জায়গার নাম হল জঞ্জিরা হরেশ্বর দাভোল বিজয় দুর্গ ও মালবান। ভাড়ার কথাও জেনে নিলুম। লোয়ার ডেকে সোয়া উনিশ টাকা আর আটাশ টাকা নব্বই পয়সা আপার ডেকে। কেবিনের ভাড়া সাতান্ন টাকা আশি পয়সা। ডি লাক্স কেবিন আছে দু রকমের, সে সবের আরও বেশি ভাড়া।

যাবার সময় আমি ক্রফোর্ড মার্কেটের পাশ দিয়ে গিয়েছিলুম, ফিরলুম অন্য পথ ধরে। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের পাশ দিয়ে বোরি বন্দর এসে ফ্লোরা ফাউন্টেন হয়ে হোটেলে ফিরলুম। কিন্তু দরজার কাছেই স্বাতিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলে উঠল: ব্যাপার কী গোপালদা, এত দেরি হল তোমার?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম: কই, বেশি দেরি হয় নি তো।

দেখা হল?

তার উদ্বেগের কারণ জেনে আমার আনন্দ হল। মাথা নাড়লুম এমন ভাবে যে হাঁ কি না তা ঠিক বোঝা যাবে না।

স্বাতি বলল: কী ঠিক হল?

তামাসার লোভ আমি ছাড়তে পারলুম না। বললুম: ছুটে আসছে।

স্বাতি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না, বলল: তাড়াতাড়ি এস, চা খেয়েই বেরোতে হবে।

ঘরে এসে মামীকে আমি মিথ্যা বলতে পারলুম না। পরম আগ্রহে তিনি প্রশ্ন করলেন: কখন আসছে?

বললুম: দেখা হল না।

স্বাতি বোধহয় কাপড় বদলাতে যাচ্ছিল। চকিতে ফিরে দাঁড়াল, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের দিকে। কিন্তু মামী তাকে দেখতে পান নি। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

বললুম: টুর থেকে এখনও ফেরে নি।

মামা যেন নিশ্চিন্ত হলেন এই খবর পেয়ে। কিন্তু মুখে কোন কথা বললেন না। স্বাতি স্নানের ঘরে চলে যাবার পরে বললুম: তার বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ করব ভেবেছিলুম। কিন্তু যে মেয়েটি তার পি. এ.র কাজ করে, সে ঠিকানা দিতে চাইল না।

কেন?

বলে মামী আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: তার সাহেব পছন্দ করে না।

মামীর মুখ দেখে মনে হল যে তিনি হতাশ হয়েছেন। তারপরেই আক্রমণ করলেন মামাকে, বললেন: আমি তখুনি বলেছিলাম—

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: কী বলেছিলে?

বলেছিলাম না তার ঠিকানা টুকে নিতে।

মামা বললেন: সে তো তার বাপের নাম ঠিকানা।

শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামী বললেন: তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

মামা বিচলিত হলেন না এই মন্তব্যে। শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন: তবে তুমিই সব কর।

কাপড় বদলে স্বাতি ফিরে এল। বলল: অ্যাকোয়েরিয়ামের খবর নিয়েছ?

বললুম: রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মামা বললেন: নিশ্চিন্ত তাহলে।

কেন?

স্বাতি ভয় পাচ্ছিল যে মাছ দেখতে হলে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানটা দেখা হবে না।

ব্যাবিলনের!

ঐ হল। বম্বের পাহাড়ের নাম যদি মালাবার হিল হতে পারে তো ব্যাবিলন বললেও কোন দোষ নেই।

স্বাতি বলল: সত্যিই তো, মালাবার হিল নাম হল কেন?

বললুম: জো রায়ের সঙ্গে দেখা হলে তাকেই জিজ্ঞেস করব।

চা খেয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। একটুখানি হেঁটেই পৌঁছে গেলুম সমুদ্রের ধারে। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বোঝা গেল যে এই জায়গারই নাম মেরিন ড্রাইভ। গাড়িতে বসে সকালেও দেখেছি, কিন্তু এখনকার মতো মন দিয়ে দেখি নি।

স্বাতি বলল: ঠিক ছবির মতো দেখতে।

মানে?

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: ছবিতে ঠিক এই রকমই দেখেছি।

কিন্তু এ রকমটি দেখি নি।

বলে আমি পথচারীদের দেখালুম।

সমুদ্রের ধারে নিচু প্রাচীর, বসে আলাপ করবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। বেলা পড়বার আগেই লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। কেউ পা তুলে বসেছে, কেউ পা ঝুলিয়ে। নানা রঙের শাড়ি পরে মেয়েরাও হাঁটছে দেখে মামী বললেন: আজ কোন মেলা আছে, না পর্ব?

মামা আমার দিকে তাকালেন দেখে বললুম: এ মেলা রোজ বসে, সন্ধ্যে বেলায় আরও জমে উঠবে। ওধারের চৌপাঠিতেও ভিড় হবে, সেখানে বালির ওপরে লোকে গড়াগড়ি দেবে।

স্বাতি বলল: আমরাও দেব।

ছি ছি।

বলে মামী নাক সেঁটকালেন। কিন্তু স্বাতি তাতে দমল না, বলল: সমুদ্রের বালি আমার খুব ভাল লাগে। বালির ওপরেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি বললুম: মেমসাহেবরাও খুব ভালবাসে। সে দেশে তো শনি রবি দুদিন ছুটি। ওরা ছুটে সমুদ্রের ধারে যায়, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বালির ওপরেই গড়াগড়ি দেয়। বিলিতি কাগজে ছবি দেখ নি?

স্বাতি বলল: দেখেছি। কিন্তু ওদের মতো পোশাক আমরা পরতে পারব না।

পারলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হত। সূর্যের আলোর অনেক গুণ, রোদে স্নান করে ওরা নতুন জীবন পায়।

আমার মনে পড়ল যে পঞ্চাশ বছর আগে আজকের এই লোভনীয় স্থানটি এখানে ছিল না। আবর্জনা আর মাটি ফেলে সমুদ্র ভরাট করে অর্ধচন্দ্রের মতো একটা প্রশস্ত পথ তৈরি হয়েছে। তার এক দিকে আরব সাগরের শান্ত জল ছলছল করছে, অন্য দিকে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি সারিবদ্ধ ভাবে বম্বের বৈভব ঘোষণা করছে। এই মেরিন ড্রাইভের শেষ হয়েছে মালাবার হিলে। সমতলের পথ পাহাড়ের উপরে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে গিয়ে পৌঁছেছে। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, আর বম্বের এই বাগান তেমন বিস্ময়কর না হলেও যে পরম রমণীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন আমরা সেখানেই বেড়াতে যাব।

কিন্তু মামী এবারে সমুদ্রের ধার থেকে অন্য ধারে মুখ ফেরালেন। পাঁচ ছ তলা উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন: একেবারে একই রকমের বাড়ি, মনে হচ্ছে যেন একই লোক তৈরি করেছে।

স্বাতির হঠাৎ চিত্রতারকাদের কথা মনে পড়ল, বলল: এখানে অনেক তারকার বাড়ি আছে, তাই না গোপালদা?

বললুম : থাকতে পারে।

মামী প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি, কিন্তু স্বাতি গোটা কয়েক নাম করতেই বললেন : এ সব খবর আবার কোথায় পেলে?

স্বাতি বলল:: আমি তো তোমাদের মতো গোঁড়া নই, বাঙলা কাগজ যা পাই তাই পড়ি।

স্বাতি যে সিনেমার কাগজের কথা বলছে তা বুঝতে পারি। এই সব কাগজেই দেশ ছেয়ে গেছে, সাহিত্যের পত্রিকা আর বেশি চলছে না। গোঁড়া যারা, তাদের মুখে ক্ষোভের কথাও শুনেছি। বলছে, রীতিমতো অত্যাচার চালিয়েছে, সাহিত্যকে হত্যা করবে এই সব সিনেমার কাগজ। কিন্তু কাগজ তো সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে নয়, কাগজ পাঠকের খোরাক যোগাবার জন্যে। সেই খোরাক যদি তারা যোগাতে পারে তো আপত্তি কিসের! এক দিন ধর্ম নিয়েও হয়তো এই সব কথা উঠেছিল। বেশি গোঁড়ামির জন্যে ধর্মের বাঁধন একেবারে আলগা হয়ে গেছে। ধর্মের নামে ব্যবসা শুরু হয়েছিল, তাই তার কাঠামো পড়েছে ভেঙে। এই ব্যবসা বন্ধ না হলে ধর্মেরই এক দিন মৃত্যু হবে। গীতার আশ্বাস বাণী শুনিয়ে ধর্মকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব না।

সাহিত্য নিয়ে স্বাতির সঙ্গে এক দিন কথা হয়েছিল। বলেছিলুম, ধর্মের মতো সাহিত্যেরও মৃত্যু আসন্ন, সাহিত্য নিয়েও ব্যবসা শুরু হয়েছে। স্বাতি বলেছিল, না, সে ভয় নেই। ব্যবসা অনেক জিনিস নিয়েই হচ্ছে। সিনেমা নিয়ে, থিয়েটার নিয়ে, আরও সব শিল্পকর্ম নিয়ে। শিল্পের যেমন মৃত্যু নেই, সাহিত্যেরও নেই। ধর্মও চিরকাল বেঁচে থাকবে।

এ স্বাতির বিশ্বাসের কথা। যুগধর্মকে সে মেনে নিয়েছে। তাই তার গোঁড়ামি নেই, দুর্ভাবনাও নেই। নিশ্চিন্ত মনে সে সিনেমার কাগজ পড়ে, খবর রাখে চিত্রতারকাদের। আবার শিল্প

সাহিত্যও ভালবাসে। তাই আমি তার মন্তব্যের কোন উত্তর দিই নি।

ভারী শরীর নিয়ে মামার বোধহয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। বললেন : আর কতক্ষণ হাঁটাবে ?

মামীরও বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল অভ্যাসের অভাবে। তিনি বললেন : তোমাদের মতিগতি কিছুই বুঝছি না।

মালাবার হিল এখান থেকে অনেকটা দূরে। পশ্চিমঘাটের মতো জনহীন দুর্গম পাহাড় নয়। ও পাহাড়ে লোকালয় আছে, প্রশস্ত পথ আছে যানবাহন চলাচলের জন্য। কিন্তু পায়ে হেঁটে ঐ পাহাড়ে পৌঁছনো যাবে না। বললুম : একটা ট্যাক্সি ধরছি।

স্বাতি বলল : সামনেই অ্যাকোয়েরিয়াম নয় !

তার পরেই বলল : আচ্ছা ফেরার পথেই দেখা যাবে।

একটা ট্যাক্সি ধরতে আমাকে বেগ পেতে হল না। গাড়িতে বসে মামা খুশী হলেন, বললেন : এইবারে চল যেদিকে খুশি।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আমি মালাবার হিলে উঠবার নির্দেশ দিলুম।

১৪

এই শহরে একটা নূতন রকমের তৃপ্তি পাচ্ছি। শহরটা বড় সভ্য মনে হচ্ছে। বাসের স্ট্যাণ্ডে ঠেলাঠেলি দেখি নি। সারি দিয়ে সবাই দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ বসবার জায়গা আছে, ততক্ষণই মানুষ উঠেছে। জায়গা নেই বলবার পরে জোর করে কেউ উঠছে না। গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা হাতল ধরে ঝুলে একজনও যাচ্ছে না। কলকাতার মতো রীতি এখানে নেই। এ শহরে কি লোক কম, না বাসে লোক ওঠে না! এখানকার ভিড়ের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। যেমন শৃঙ্খলা দেখছি সমুদ্রের ধারে পথঘাট অট্টালিকা নির্মাণে ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে, মানুষের মধ্যেও তেমনি এই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখছি। কলকাতার বাঙালীর কাছে এ এক বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই মনে হবে।

স্বাতি বলে উঠল : ঠিক বলেছিলাম কিনা দেখ।

মামী বললেন : কী বলেছিলে?

অ্যাকোয়েরিয়াম আমরা ফেলে এলাম। ম্যাড্রাসে কী শুনেছিলাম মনে নেই? সেখানকার অ্যাকোয়েরিয়ামটাই তো বম্বেতে উঠে এসেছে!

মাছ রাখার ব্যবস্থা আমরা ত্রিবেন্দ্রামে দেখে এসেছি। বড় বড় কাচের ঘরে জল ভর্তি করে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। তার পর সেই সব ঘরে রাখা হয় সমুদ্র ও নদীর জলের নানা রকম মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই আমরা চৌপাঠির কাছাকাছি এসে পড়লুম। বললুম : এই দেখ চৌপাঠি, বালির ওপরে এইখানে সবাই গড়াগড়ি দেয়।

মামী বলে উঠলেন : ওমা, সত্যিই তো!

অনেকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, আর বসে ছিল জনকয়েক মেয়ে-পুরুষ। স্বাতি বলল: আমরাও এখানে আসব।

এর পরে আমাদের ট্যাক্সি অন্যদিকে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ওঠবার পথ ধরল। এই পাহাড়ের শেষ প্রান্তে রাজভবন। ওয়ালকেশ্বর মহাদেবও আছেন এই অঞ্চলে। শৌখিন অভিজাত পাড়া। সুন্দর ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে এসে নামলুম। কিন্তু ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে মামা রাজী হলেন না। বাস-স্ট্যাণ্ড আমরা দেখেছি, ফিরে এসে বাস ধরার খুব অসুবিধা হত না। তবু তাঁর কথায় ট্যাক্সি ধরে রাখতে হল।

পাহাড়ের গায়ে এই বাগানেরই নাম হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, ঝুলন্ত বাগান। কোন্‌টা ফিরোজ শাহ মেটা পার্ক আর কোন্‌টা কমলা নেহরু পার্ক, সে প্রসঙ্গ আর তুললুম না। বাগানের ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল: সমুদ্র বোধহয় এই দিকে, এই দিকেই এস।

বলে যেদিকে পাহাড় শেষ হয়ে গেছে মনে হয়, সেইদিকে সে এগিয়ে গেল।

আমি বললুম: ঐদিকে বোধহয় আরও একটি জিনিস দেখতে পাব।

কী?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: পার্সিদের টাওয়ার অব সাইলেন্স।

চারিদিকে চেয়ে মামা বললেন: কই, কোন টাওয়ার দেখতে পাচ্ছি না তো!

পাহাড়ের উপরে হলে দেখতে পেতুম। বোধহয় এমন জায়গায় যে চূড়োটাও দেখা যাচ্ছে না।

মামী দাঁড়িয়ে ছিলেন এক জায়গাতেই। বললেন: সে আবার কী জিনিস?

মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : পার্সিদের কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে।

স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল, বলল : ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে গোপালদা, চলে এস।

মামা বললেন : সেই ভাল। পরেই শুনব পার্সিদের কথা।

কিন্তু তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বলে আমি এগোতে পারছিলুম না, আর স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। সে দিকে আরও অনেকে দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছে। বললুম : আপনারা কি এগোবেন না?

মামা বললেন : এখান থেকেই তো সব দেখতে পাচ্ছি!

আমি অন্য দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। এধারের বাগান দেখে ওধারে সবাই নেমে যাচ্ছেন। বললুম : ওধারে বোধহয় নিচে নামতে হবে।

মামা তখনি উত্তর দিলেন : পাহাড়ে ওপর-নিচ করে বাগান দেখা আমাদের কর্ম নয়! তোমরাই দেখ।

বলে একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন।

মামী আজ আপত্তি করলেন না। বললেন : বেশি দেরি কোরো না যেন!

এ তাঁর সম্মতির কথা। আমি খানিকটা আশ্চর্য হলুম তাঁর এই পরিবর্তন দেখে। কিন্তু কেন তা ভাববার জন্য অপেক্ষা করলুম না, দ্রুত পায়ে অগ্রসর হলুম স্বাতির দিকে। কেন জানি না আমি অনুভব করছিলুম যে দু জোড়া স্নেহার্দ্র দৃষ্টি আজ আমাদের অনুসরণ করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এতটুকু সন্দেহ করি নি যে এই বাগানেই একটা বিরাট বিস্ময় আছে আমাদের অপেক্ষায়, খানিকক্ষণ পরেই সব কিছু ওলটপালট করে দেবে। কিন্তু তার

আগে কয়েকটা নিশ্চিন্ত মুহূর্ত উপভোগ করবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম।

স্বাতি এক জায়গায় আমার অপেক্ষা করছিল। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল বলে আমি তাকে দেখতে পাই নি। কিন্তু সে বেরিয়ে এসে বলল : এস।

এত নিকটে আমি তাকে আশা করি নি। তাই পায়ের গতি একটু মন্থর করতেই সে বলল : না, এখানে দাঁড়াব না। এই বাগানটা ঘুরে অন্য ধারে চল।

বাগানের চারিধার ঘুরে পথ। ফুল পাতার গাছ। কতগুলো সবুজ পাতার গাছ ছেঁটে জন্তুজানোয়ারের আকার করে রেখেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য হচ্ছে এই সব দেখে। আমরাও এই সব দেখে এগোতে লাগলুম।

স্বাতি হঠাৎ বলল : আজ তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছিলে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তাই নাকি!

রাগব না! অকারণে তামাসা করেছিলে আমাব সঙ্গে। জো রায় বাঘ না ভালুক, যে আমি তাকে ভয় পাই ভেবেছিলে।

অন্য কিছুও ভাবতে পার!

বেবুন বা ওরাং ওটাং?

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললুম : কৃষ্ণ কানাই।

একটা কঠিন কটাক্ষ করে স্বাতি বলল : মা তোমাকে গলাধাক্কা দেবেন সেদিন।

হেসে বললুম : তার জন্যে সারাক্ষণই তৈরি আছি।

স্বাতি হঠাৎ তরল ভাবে বলল : তোমার কথা শুনে আমি কী প্ল্যান করেছিলাম জান? ভেবেছিলাম যে ভোর বেলার ট্রেনে পুনা চলে যাব, তার পর বাবাকে যদি রাজী করাতে পারি তো রাতের ট্রেনেই গোয়া।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : ট্রেনের সময় পেলে কোথায়?

সঙ্গে কি আমাদের টাইম টেব্‌ল নেই ভেবেছ ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম : তোমার জন্যে আমি জাহাজের খবর সংগ্রহ করে এনেছিলুম।

সত্যি !

বলে স্বাতি গভীর আগ্রহে তাকাল আমার মুখের দিকে।

বললুম : সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে যেতে হবে ফেরি হোয়াফে। চৌগুলে কোম্পানীর জাহাজ ছাড়বে সকাল দশটায়। চার-পাঁচ তলা জাহাজ। ডেকের ওপরে ডেক, তার উপরে কেবিন। কেবিনের ওপরেও ডি লাক্স কেবিন।

তার পর ?

তার পর বলবার আগে আমাদের একটু সতর্ক হতে হল। এধারের বাগান শেষ হয়ে গেছে। একটা রাস্তা পেরিয়ে ওধারের বাগানে ঢুকতে হবে। মনে হল যে এতক্ষণ আমরা যে বাগানে ছিলুম তার নাম ফিরোজ শাহ মেটা পার্ক। আর এই পথ পেরিয়ে আমরা কমলা নেহরু পার্কে প্রবেশ করলুম।

পাহাড়ের অন্য ধারে এই বাগান। এ ধার থেকে বম্বে শহরটা যে দেখা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাস্তাটা পেরিয়েই স্বাতি আমাকে তাড়া দিল। বলল : তার পর বল।

বললুম : তার পর গোয়ায় চল কোঙ্কণ উপকূল দেখতে দেখতে। এক ধারে আরব সাগরের জল দিগন্তে আকাশের সঙ্গে মিলেছে, অন্য ধারে শস্যশ্যামল মাটির পিছনে পশ্চিমঘাট পাহাড়। জাহাজের ডেকে বসে—

বলেই আমি থেমে গেলুম। স্বাতির দু চোখের দৃষ্টি যেন সামনের দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। পার্কের রেলিঙের ধারে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। সামনে দেখতে পাচ্ছি মেরিন ড্রাইভের বাড়িগুলি বেলাশেষের রৌদ্রে ঝলমল করছে। সমস্ত শহরটাই যেন দেখা যাচ্ছে। দেখছি আকাশ থেকে, একটু একটু করে

যখন অন্ধকার নামবে, আর বাতি জ্বলে উঠবে ঐ সব ঘরবাড়িতে, তখন কি আর শহর মনে হবে ওকে! হয়তো পরীর রাজ্য বলেই ভুল হবে আমাদের।

কিন্তু স্বাতি বোধহয় এ সব কথা ভাবছিল না, বলল: থামলে কেন গোপালদা?

নিজের কথার মধ্যে আমি ফিরে আসার চেষ্টা করলুম, বললুম: জাহাজের ডেকে বসে আমরা একেবারে অন্য রকমের দৃশ্য দেখব। সে রকমের দৃশ্য এর আগে আমরা কোথাও দেখি নি।

স্বাতি বলল: এস, একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে তোমার কথা শুনি।

নিরিবিলি জায়গার খোঁজে একটুখানি এগোতেই বাগানের সেই অদ্ভুত জুতোটি দেখতে পেলুম। ওল্ড লেডিজ শু। ঠিক বুটজুতোর মতো দেখতে একটি দোতলা বাড়ি। জানলা আছে জুতোর গায়ে, ভিতরে যাবার জন্যে দরজাও আছে। উপরে ছাদ, আর একটি ছোট বারান্দা। ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপ-মায়েরাও উপরে উঠে চারদিকের দৃশ্য দেখছে! অন্য দিন হলে স্বাতি বলত, এস গোপালদা, আমরাও উপরে উঠব। কিন্তু আজ সে এক নজরে দেখেই বলল: এই ধারে এস।

বলে খানিকটা দূরে ছোট একটি গাছের নিচে ঘাসের উপরেই বসে পড়ল। পাশের জায়গাটিতে একবার হাত বুলিয়ে বলল: বস।

আমি তার পাশে বসে পড়লুম।

এখান থেকেও মেরিন ড্রাইভ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয় অর্ধচন্দ্রের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্রের মতো তরঙ্গসঙ্কুল নয়, আবার স্থিরও নয়। ছলছল করে প্রাণের আবেগে আছে উচ্ছল হয়ে। অন্ধকার নামলেও এ দৃশ্য মুছে যাবে না। আলোর মালায় হয়তো আরও রমণীয় হয়ে উঠবে।

স্বাতি বলল: তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে না তো?

হেসে বললুম: অতীতের চর্চা করে রিক্ত মানুষ।

স্বাতি যেন আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে, জিজ্ঞাসা করল: নিজেকে হঠাৎ ধনী ভাবছ কেন?

ধন পেয়েছি বলে।

সে কি আজ নতুন পেয়েছ?

না।

তবে?

ভয় ছিল দস্যুতে কেড়ে নেবার।

আজ বুঝি সে ভয় আর নেই?

নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলার অবকাশ পেলুম না। অদূরে কোন পরিচিত মানুষকে দেখতে পেলুম বলে মনে হল, উপর থেকে নিচে নামছে। যাকে চেনা মানুষ ভাবছি, তাকে আড়াল করে আছে একটি মেয়ে, পার্সি মেয়ের মতো তন্বী ও সুন্দরী। তার পায়ের ছন্দে ও মুখের হাসিতে একটি প্রাণবন্ত জীবনের ঘোষণা দেখছি। পুরুষটিকে চিনতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগে নি। যাকে সন্দেহ করেছিলুম, সেই জো রায়কে চিনতে পেরে নিঃসন্দেহ হলুম। তারা একটা সরু পথ ধরে নিচে নেমে গেল।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে তার দৃষ্টি এখন অন্য ধারে। জো রায়কে সে বোধহয় দেখে নি। দেখলে এমন নির্বিকারে হয়তো বসে থাকত না। আমি কী বলব আর ভেবে পেলুম না।

স্বাতি হঠাৎ বলল: আর কতক্ষণ বসবে?

বললুম: ভাল লাগছে না বুঝি?

বাবা মা অপেক্ষা করছেন কিনা, তাই বলছি।

অন্যত্র স্বাতি এ কথা ভাবে নি, আমাকেই এ রকম কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে। তাইতেই কেমন বিসদৃশ মনে হল তার

প্রস্তাবটি। বললুম: এ জায়গা যদি ভাল না লাগে তো কোথায় লাগবে জানি নে।

স্বাতি বলল: এলিফেন্টার গুহা।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম: পৃথিবীটা কি তোমার ছোট হয়ে আসছে?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: নিজের জন্যে একটা জগৎ গড়বার চেষ্টা করছি, সেখানে জনতার উপদ্রব থাকবে না।

তোমার একজন সঙ্গী থাকবে তো?

ভেবে দেখব।

তাহলে আজই আমার আরজি পেশ করে রাখলুম।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। উঠে বলল: চল।

কিন্তু রাজপথে পৌঁছবার আগেই জো রায়ের গলা শুনতে পেলুম: আরে গোপালবাবু যে। কী ব্যাপার, কবে এলেন?

পিছন থেকে ভদ্রলোক এক রকম ছুটতে ছুটতে আসছিল, কিন্তু একা। সেই মেয়েটি এখন সঙ্গে নেই। আমার মনে হল যে তাকে সে লুকিয়ে রেখেই এসেছে। আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করে আবার তার কাছে ফিরে যাবে।

ভদ্রলোক কাছে এলে আমি উত্তর দিলুম, বললুম: কাল এসেছি, আর কাল থেকেই খুঁজছি আপনাকে।

তাই নাকি।

আজ আপনার অফিসেও গিয়েছিলুম। কী সুন্দর অফিস, আর আপনার পি. এ.—

বলে আমি থেমে গেলুম।

কী বলল আপনাকে?

বলল, টুর থেকে আপনি ফেরেন নি। বাড়ির ঠিকানাও দিতে চাইল না।

আপনার কার্ড রেখে এলেন না কেন?

আমি স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে এ কথার উত্তর দিলুম না। আর জো রায়ও আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করল : বাবা মা কোথায় ?

স্বাতি কোন কঠিন কথা বলে ফেলবে বলে আমি ভয় পেলুম। তাড়াতাড়ি বললুম : ওধারে আছেন।

জো রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল : আসুন আসুন, দেখা করে আসি তাঁদের সঙ্গে।

বলে আমাদের সঙ্গেই রাস্তা পার হয়ে উপরের বাগানে মামা মামীর কাছে এসে উপস্থিত হল। তার পর বিনয়ে সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে তাঁদের বিপর্যস্ত করে তুলল। মামী বললেন : এসে অবধি—

শুনেছি গোপালবাবুর কাছে। কাল সকাল বেলাতেই আপনাদের হোটেলে এসে জুটব। বম্বে দেখাবার ভার নিলুম আমি।

আজ সন্ধ্যা বেলায় তার জরুরি কাজ। তাই হোটেলের ঠিকানা নিয়ে গাড়িতে তুলে আমাদের বিদায় দিল।

পিছন ফিরে আমি একবার দেখলুম। মামা গম্ভীর হয়ে আছেন, কিন্তু প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন মামী। স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তার মনের কথা কিছুই বুঝতে পারলুম না।

১৫

মেরিন ড্রাইভে তখন একটা একটা করে আলো জলে উঠছে। অন্ত ধারের জল যেন আকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। গাড়িতে কেউ কথা বলছিলেন না। বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল আমার।

মামী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : কোথায় মাছ দেখবে বলছিলে ?

মামা কোন উত্তর দিলেন না, স্বাতির আগ্রহও যেন ফুরিয়ে গেছে। তাই আমি বললুম : সেইখানেই আমরা নামব।

তারপরে ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিলুম।

তারপোরওয়ালা অ্যাকোয়েরিয়ামের কাছাকাছি আমরা এসে গিয়েছিলুম। বাঁ দিকের একটা গেটের ভিতরে ঢুকে ট্যাক্সি থামল। আমরা নেমে পড়লুম। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি মামা ছেড়ে দিলেন। দরজার কাছে টিকিট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

কত রকমের মাছ, আর সামুদ্রিক জীবও কত রকমের। বড় বড় কাচের ঘরে জল নুড়ি বালি শ্যামলা দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। বাহির থেকে বিশুদ্ধ বাতাসও আসছে নল দিয়ে। আর তার ভিতরে ছোট বড় নানা জাতের মাছ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ছোট ঘরে ছোট ছোট শৌখিন মাছও আছে। পরিচিত ও অপরিচিত তাদের নাম ও গোষ্ঠী। কিন্তু এই সব দেখার উৎসাহ যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অকস্মাৎ যেন সঙ্গীতের তাল কেটে গেছে, আর কিছুতেই জমছে না। অল্পক্ষণেই আমাদের সব দেখা হয়ে গেল। আর একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

মামীর আচরণে আমি আজ আশ্চর্য হলুম। তিনি আমাকে বললেন : পার্সিদের সম্বন্ধে কী বলবে বলছিলে ?

এই প্রশ্ন শুনে আমার মনে হল যে তিনি একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন। সেই বিপর্যয় কখন কোথা দিয়ে আসবে বুঝতে না পেরেই তিনি পরিবেশটা স্বাভাবিক করবার চেষ্টায় এই কথা বলছেন। তা না হলে এই রকমের প্রসঙ্গ শোনবার আগ্রহ আমি তাঁর কখনও দেখি নি। বললুম : এই শহরে পার্সিরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। কিন্তু তাদের কথা কি আপনার ভাল লাগবে ?

অন্য দিন হলে মামা উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ তিনি নিঃশব্দে তাঁর পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করে তামাকে আগুন ধরাবার আয়োজন করলেন। মনটা তাঁর স্বাভাবিক হয়ে আসছে বলেই মনে হল।

স্বাতির দিকে আমি চেয়ে দেখলুম। সে একখানা টাইম টেবল বার করে তার পাতা ওল্টাতে লাগল গভীর মনোযোগে। আমাদের কোন কথাই যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাব। মনে হল যে মামী মিথ্যা কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন। আর আমিও সহজ ভাবে পার্সিদের কথা শুরু করলুম। বললুম : সারা পৃথিবীতে পার্সিদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। তার মধ্যে ভারতবর্ষেই এক লক্ষ কুড়ি হাজার। যে ইরান থেকে তারা এসেছে, সেখানে তাদের সংখ্যা দশ হাজার, আর অন্যান্য দেশে কুড়ি হাজার। এই শহরেই সংখ্যায় তারা বেশি। পুনা জামসেদপুর ও কলকাতাতেও তাদের বসতি আছে।

মামার পাইপ ধরে উঠেছে, মুখে ধোঁয়া নিয়ে প্রফুল্লও হয়ে উঠেছেন। বললেন : এদের পার্সি নাম কেন হল ?

বললুম : ইরানের পুরনো নাম পারস্য বা পার্সিয়া, বর্তমান ইরানেও পার্স নামে একটি প্রদেশ আছে। এর থেকেই পার্শী বা

পার্সি শব্দ। এরা আর্য জাতিরই একটি শাখা এবং আর্য শব্দটিও বোধহয় ইরান থেকেই এসেছে।

কী রকম ?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: পুরাকালে ইরানের নাম ছিল এরান, তার প্রাচীন রূপ আরিয়ানাম বা ঐর্যানাম। অর্থাৎ আর্যদের দেশ আর্যানাম। একটি বিবাদের জন্যে আর্যরা সেদিন বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর্যদের কাছে অগ্নি পবিত্র, এত পবিত্র যে এই আগুনে তারা কোন শবদাহ করবে না, পশুপক্ষীও আহুতি দেবে না। যারা এই নির্দেশ মানল না, তারা বেরিয়ে এল দল থেকে। এল ভারতবর্ষে, তাদের নাম হল ভারতীয় আর্য। যারা রয়ে গেল তারা হল ইরানীয় আর্য। পার্সিরাই সেই ইরানীয় আর্য।

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে এখনও তার টাইম টেব্‌লের পাতায় ডুবে আছে। আমাদের আলোচনার দিকে তার কান নেই। মামীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে তিনিও আর মনোযোগ দিচ্ছেন না। কিন্তু মামা বললেন: তুমি এক নতুন কথা বললে।

বললুম: কতকটা নতুন কথাই, কিন্তু আমার নিজের কথা নয়। পার্সিদের কথা জানতে হলে তাদের ধর্মের কথাও কিছু জানতে হবে। জরথুশ্‌ত্র বা জোরো আস্তেরের কথা, তাঁর জেন্দ্‌ আভেস্তার কথা। কিন্তু এ আলোচনা কি ভাল লাগবে ?

মামা পিছন ফিরে বললেন: স্বাতি কী করছে ?

স্বাতি বলল: এই যে বাবা!

তুমি পিছনে বসে আছ কেন, সামনে এস। গোপালের গল্প একেবারেই জমছে না।

এই যে আসছি।

বলে স্বাতি যখন তার টাইম টেব্‌ল রেখে দিয়ে এগিয়ে এল

তার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে, আমি তার প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। খানিকক্ষণ টাইম টেব্‌লের পাতা উল্টে মানুষ যে এমন খুশী হয়ে উঠতে পারে, এ কথা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই কী বলব ভেবে পেলুম না।

স্বাতি বলল: জরথুশ্‌ত্র নামটা শুনেছি, কিন্তু তার বেশি কিছুই জানি না।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে রাতের আহারের সময় এখনও হয় নি। তার আগেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা সম্ভব হবে। তাই বললুম: ভারতে যেমন গৌতমবুদ্ধ, ইরানে তেমনি জরথুশ্‌ত্র। বুদ্ধেরও আগের লোক তিনি। খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন নিজের রচিত কবিতা 'গাথায়'। অনেক পণ্ডিত এই গাথার ভাষার সঙ্গে আমাদের বেদ ও উপনিষদের ভাষার মিল দেখে মনে করেন যে জরথুশ্‌ত্র আরও প্রাচীন লোক। তাঁর নামেরও ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে। কেউ বলেন, সংস্কৃত জরদ্‌ উষ্ট্র থেকে জরথুশ্‌ত্র। বুড়ো গরু থাকলে যেমন জরদ্‌-গব বা জরদ্গব বলা হয়, তেমনি বুড়ো উটের মালিক জরথুশত্র। অনেকে আবার জরথ উষত্র বা উজ্জ্বল উষার কিরণ থেকে জরথুশ্‌ত্র নাম হয়েছে বলেন। গ্রীক ভাষায় অ্যাস্টার বা আস্তের শব্দের মানে হল তারা। গৌতমের যেমন বুদ্ধ নাম হয়েছে, তাঁরও তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী নাম হয়েছিল।

আমি থামতেই মামা বললেন: কঠিন কথা।

আর স্বাতি প্রশ্ন করল: তাঁর জীবনের কথা কিছু জানা যায়?

বললুম: শুনেছি পনর বছর বয়সে তপস্যা করবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। পনর বছর তপস্যার পর দেখা পান অহুর-মজ্‌দার মানে ভগবানের। অনেকে বলেন যে অহুর-মজ্‌দার কাছে তিনি অগ্নি পেয়েছিলেন। আর তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মন্দিরে।

সারা জীবন তিনি নির্যাতন সহ্য করেন ও সাতাত্তর বছর বয়সে একটি অগ্নি মন্দিরেই নিহত হন।

মামা বললেন : এ তো বুদ্ধের মতো হল না, হল যীশু খ্রীষ্টের মতো।

বললুম : কতকটা তাই। জীবনে তিনি যন্ত্রণাই পেয়েছিলেন বেশি।

স্বাতি বলল : অহুর মজ্‌দা শব্দটি কোথা থেকে এল ?

বললুম : সংস্কৃত অসুর মেধস্‌ শব্দ, তার মানে শক্তিময় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর। এদের ধর্মানুষ্ঠানে মূর্তিপূজা ও বলিদানের প্রথা উঠে গেল। যারা তা আঁকড়ে ধরে রইল, তাদের নাম হল দয়েব যস্‌নাম বা দেব পূজক। এই অহুর আর দয়েব বা অসুর ও দেব শব্দ ভারি মজার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কী রকম ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আর আমি বললুম : ইরানীয় আর্যদের অসুর হলেন তাদের দেবতা, আর দয়েব দানব। ভারতীয় আর্যদের বেলায় ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—অসুর হল অসুর আর দয়েব দেবতা। এই দুই সম্প্রদায়ের আর্যদের বিবাদকেই অনেকে দেবাসুরের যুদ্ধ বলে মনে করেন। অসুররা দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করেছিলেন মানে হল ইরানীয় আর্যরা যাদের স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারাই ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় আর্য হয়েছে। তারা বেদ উপনিষদ রচনা করেছে, নানা দেবতার পূজা হোম বলিদান প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন করেছে। এরাই হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক।

পরম বিস্ময়ে মামা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আর আমি বললুম : আর যারা ইরানে রয়ে গেল তাদের পুরাতন ধ্যান ধারণা নিয়ে তারা এদেশে এল অনেক পরে। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি আরবরা যখন ইরান জয় করে, তখন এরা দীর্ঘদিন

আত্মগোপন করে থাকবার পর নৌকোয় করে গুজরাতে এসে উপস্থিত হয়। রাণা জয়দেব তাদের বসবাসের জন্যে জমি দেন, অস্ত্রত্যাগ করে তারা গুজরাতের লোকাচার গ্রহণ করে। সন্‌জানে তাদের নূতন উপনিবেশ গড়ে ওঠে, পরে তারা বোম্বাইএ আসে। বোম্বাই থেকে পুনা জামসেদপুর ও কলকাতা। ভারতে এরাই এখন পার্সি নামে পরিচিত। এখনও তারা নিজেদের ধর্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করছে, বিবাহ করছে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই। তাদের উপাসনার জন্যে অগ্নি মন্দির, আর মৃতের সৎকারের জন্যে টাওয়ার অব সাইলেন্স।

স্বাতি বলল: টাওয়ার অব সাইলেন্স সম্বন্ধে কিছু বল গোপালদা। এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই।

আমি তার সুস্থ ও সহজ কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হলুম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলে তার কথারই উত্তর দিলুম: তার আগে তাদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। সে কতকটা হিন্দুদেরই মতো। হিন্দু ছেলেদের যেমন উপনয়ন, পার্সিদেরও তেমনি নব জ্যোতি। সাত থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেদের উপবীতের মতো কুস্তি ও সদরা নামের শুভ্র উত্তরীয় পরিয়ে পার্সি ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। এদের পুরোহিত হল দস্তুর ও মোবদ্ বা মগপতি। মগ ছিলেন জরথুশ্‌ত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, তিনিই এই পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই পুরোহিতরাই মৃতদেহকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখবার জন্যে দখ্‌মা স্থাপন করেন। এই দখ্‌মাই এখন টাওয়ার অব সাইলেন্স।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: মৃতদেহ কি দাহ করা হয় না?

বললুম: না।

তবে কি গোর দেওয়া হয়?

তাও না।

তবে?

বললুম: পার্সিরা পঞ্চভূতকে পবিত্র বলে মানে। পৃথিবী অগ্নি ও জলে তারা মৃতদেহের সংকার করতে পারে না। তাই উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করে তারই উপরে মৃতদেহকে রেখে দেয়। আর শকুনরা এসে মৃতদেহটি খেয়ে যাবার পরে অস্থি বিসর্জন করা হয় টাওয়ারের নিচে একটি কূপে।

স্বাতি যেন শিউরে উঠল, বলল: এ কী অমানুষিক প্রথা?

বললুম: শবদেহ দাহ করাও কি অমানুষিক নয়?

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তা বটে।

বললুম: জরথুশ্‌ত্র নাকি বলেছিলেন যে মৃত্যুর পরে ধনী ও দরিদ্র এক সঙ্গে মিলিত হয়। তাই সবার সংকার একই রকমে হয়। এদের নাকি বেতনভোগী শববাহক আছে। মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা গাড়ি নিয়ে আসে। সেই গাড়িতে করে শব বহন করা হয়। তাদের অনুসরণ করে সাদা পোশাক পরিহিত আত্মীয় বন্ধুরা। বম্বে শহরের মালাবার হিলে আছে পাঁচটি টাওয়ার অব সাইলেন্স, আশিটা সিঁড়ি উঠে তার গেট। অনুমতি না নিয়ে তার ভিতরে যাওয়া যায় না। শুনেছি বড় শান্ত ও সমাহিত এই পরিবেশ। মৃতদেহ টাওয়ারে রেখে আত্মীয় বন্ধুরা এসে গাছের ছায়ায় বসে প্রার্থনা করে।

এর পরে কিছু সময় নীরবে কাটল। তার পরে মামী জিজ্ঞাসা করলেন: পার্সিরা কি অগ্নির উপাসক, না সূর্যের?

বললুম: সবাই তাই মনে করে। কিন্তু তারা অগ্নিরও উপাসক নয়, সূর্যের উপাসনাও করে না। অথচ তাদের অগ্নির মন্দির আছে। সেইখানে তারা প্রার্থনা করে, আবার সূর্যের দিকে চেয়েও করে প্রার্থনা। আসলে তারা ঈশ্বরকে জ্যোতির্ময় মনে করে। আর এইজন্যেই অগ্নি বা সূর্যের দিকে চেয়ে সেই জ্যোতির্ময়ের ধ্যান করে।

এই প্রসঙ্গে আমার রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে পড়ল।

তিনি বলেছেন যে মানুষের জীবনে যে নৈতিক দায়িত্ব আছে, জরথুশ্ত্র এই কথা প্রচার করেছিলেন সকলের আগে। তাঁর সম্বন্ধে কবি আরও কিছু বলেছিলেন। কিন্তু সহসা আমি সে সব কথা মনে করতে পারলুম না। তার আগেই হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল যে ডিনার তৈরি আছে, অনুমতি পেলেই দিয়ে যেতে পারে। কাল আমরা ঘরেই খেয়েছিলুম, আজও তাই সে ঘরে খাবার দেবার সময় জানতে এল।

মামী বললেন: আর দেরি কিসের, দিক না খাবার।

কেউ আপত্তি করল না দেখে বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। আমরা খেয়ে নিলুম।

শোবার আগে স্বাতি আমাদের চমকে দিল। কোনও ভূমিকা না করে বলল: কাল সকালে আমরা পুনায় যাব।

মামা পাইপ ধরাচ্ছিলেন, বললেন: কাল?

স্বাতি বলল: হ্যাঁ কালই। একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে সকাল বেলায়। সারা দিন আমরা পুনা দেখব।

মামা কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ব্যাপারটা বুঝতে মামীরও অনেক সময় লাগল। বললেন: কাল কোথায় যাবে?

পুনা।

সে আবার কোথায়?

মামীকে আমি বললুম: এখান থেকে এক শো কুড়ি মাইল দূরে মস্ত শহর।

মামী বললেন: তা কাল কী করে হবে। কাল সকালে যে—

জো রায় আসবে। কাজেই কাল কোথাও বেরোনো চলে না।

কিন্তু এ কথা বলার অবকাশ আমি পেলুম না। স্বাতি বলে উঠল: কারও জন্যে বসে থাকতে তো আমরা আসি নি।

মামী ক্ষেপে গেলেন, বললেন : তবে তাকে আসতে বলা হল কেন?

স্বাতি খুব শান্ত ভাবে বলল : আমরা তো কাউকে আসতে বলি নি।

কোন ভদ্রতা নেই।

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে একটা কঠিন কথা বুঝি তার মুখে আটকে গেল। আর মামা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : গোপাল একবার টাইম টেবলটা দেখ তো!

স্বাতি বলল : আমি দেখেছি বাবা। সকাল সাতটায় ট্রেন। সঙ্গে বুফে কার থাকবে। চা খেয়ে বেরোবার দরকার হবে না।

বিস্ময়ে মামী হতবাক হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে আর প্রতিবাদ শুনলুম না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মেয়ে আজ কোন কথা শুনবে না। নিজের মান রক্ষা করতে হলে চুপ করে থাকাই ভাল।

মামার পাইপ ধরে উঠেছিল। খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন : হোটেলওয়ালাকে একটা খবর দিয়ে রাখ। বিল তৈরি রাখবে।

আমার দিকে চেয়ে স্বাতি হাসল। পুলকে উজ্জ্বল তার হাসি। বলল : তাড়াতাড়ি যাও গোপালদা, ম্যানেজার চলে যাবে।

কোন কথা না বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

১৬

প্রত্যূষে উঠে আমরা হোটেলেই স্নান সেরে নিলুম। তাড়াতাড়ি চা পান করে চলে এলুম ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। বেরোবার আগে মামী বলেছিলেন: এক দিনের জন্য যখন যাওয়া তো মালপত্র নিয়ে যাচ্ছ কেন?

এ কথার উত্তর দিয়েছিল স্বাতি, বলেছিল: ফিরতে না পারলে রাতে আমরা পুনাতেই থেকে যাব। আর—

বলেই থেমে গিয়েছিল। তারপরে চুপি চুপি আমাকে বলেছিল বাবাকে রাজী করিয়ে ভাস্কো এক্সপ্রেস।

মানে?

ভাস্কো এক্সপ্রেস জান না? গোয়ার ট্রেন। সোজা গিয়ে দাঁড়াবে ভাস্কো ডা গামা স্টেশনে। একখানা গাইড বই জোগাড় করে রাখলে খুব ভাল হত। কাছেই তো ছিল টুরিস্ট অফিস।

মামা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন স্বাতির কথা, বললেন: কী পরামর্শ করছ তোমরা?

স্বাতি বলল: পরে বলব। তখন বুঝবে তোমার মেয়ের বুদ্ধি কত!

তা এখুনি বুঝেছি।

বলে মামা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সকালের মিষ্টি আলোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল এই স্টেশন। এই দেশে অনেক সুন্দর স্টেশন আছে। ম্যাড্রাস সেন্ট্রালের চেয়ে এগ্‌মোর অনেকের বেশি ভাল লাগে। হাওড়া দিল্লীর চেয়ে ভাল লাগে কানপুর লক্ষ্ণৌ। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস বোধহয় সকলের চেয়ে ভাল লাগবে। এই অঞ্চলটাই সুন্দর। যেমন পরিচ্ছন্ন,

তেমনি আভিজাত্যে গঠিত। বম্বে যে সুন্দরতম শহর, এই সব পথঘাট আর অট্টালিকা দেখলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

চুপি চুপি স্বাতি বলল: কেমন লাগছে?

বললুম: মিষ্টি বলব?

ভ্রমণকে কি মিষ্টি বলে!

ভ্রমণের সঙ্গীকে বলে।

স্বাতি তার কটাক্ষ দিয়ে আমার প্রগল্‌ভতার জন্য ভর্ৎসনা করল।

এখানে যেন দুটি স্টেশন। এক ধার থেকে দূর পাল্লার গাড়ি ছাড়ে, আর এক ধারে শহরতলীর ট্রেন। মাঝখানে রাস্তা। সব ট্রেনই এখানে বিদ্যুতে চলে: কোন্ ট্রেন কখন ছাড়বে ঘড়িতে তার সঙ্কেত আছে।

এখানে টিকিট কাটতে গেলেন মামা নিজে। এই ফাঁকে আমি দু দিকের স্টেশনই দেখে এলুম। ওধারের স্টেশনে একটার পর একটা লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে। যাত্রী নামছে, নতুন যাত্রী উঠছে; তারপরে ফিরে যাচ্ছে সেই ট্রেন। যাত্রীরা এধারে আসছে না। ওধারেই বেরোচ্ছে বড় রাস্তায়। কেউ হাঁটছে, কেউ বা ট্যাক্সি ধরছে।

এ ধারের স্টেশনে এখন ব্যস্ততা বেশি নেই। টিকিট কেটে মামা ফিরে আসতেই ট্রেনের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম। মামা সগৌরবে ঘোষণা করলেন: এবারে সবাই এক গাড়িতে।

তৃতীয় শ্রেণীতে আমার ওঠা হল না, সবার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতেই উঠতে হল। আমার দিকে চেয়ে স্বাতি হাসল।

এ হাসি আমার চেনা, এ হাসির অর্থ আমি বুঝি। প্রাণে যার আনন্দের উৎস আছে অফুরন্ত, সে হাসবেই। শুধু একটু উপলক্ষের দরকার। তা না হলে লোকে পাগল বলবে। স্বাতি তার হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে আমি জব্দ হয়েছি। নিজের খুশী মতো

তাদের এড়িয়ে থার্ড ক্লাসে উঠবার সুযোগ হারিয়েছি এই যাত্রায়।

এই ট্রেনের গাড়িগুলি আমাদের কলকাতার ট্রামের মতো। দু ধারে দুজন করে বসবার ব্যবস্থা, মাঝখানে চলাফেরার পথ। গাড়িতে গাড়িতেও যোগ আছে, আছে খাবারের গাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ। মামী স্বাতিকে নিজের পাশে বসাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতি মামাকে এগিয়ে দিল। পিছনের সারিতে সে আমার পাশে বসল।

তার আচরণে আজ আমি আশ্চর্য হচ্ছি। এমন দুঃসাহস তার আগে কখনও দেখি নি। মামা মামীর সঙ্গে সামনে পাশাপাশি বসতে আমার লজ্জা করে। তারও করত, কিন্তু আজ তার লজ্জা দেখছি না, সঙ্কোচও না। খুব সহজে স্বাভাবিক ভাবেই আমার পাশে ঘেঁষে বসল। গাড়ি ছাড়ল সময় মতো।

এ পথে আমাদের যাত্রা নতুন। ওয়েস্টার্ন রেলের ট্রেনে আমরা বম্বে এসেছি। বম্বে থেকে চার্চ গেটে আসতে পারতুম লোকাল ট্রেনে। চার্চ গেট স্টেশন থেকে দূর পাল্লার ট্রেন ছাড়ে না। কিন্তু সেন্ট্রাল রেলের স্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস নামেও যেমন, কাজেও তেমনি। সব ট্রেনের শেষ এইখানে, আর যাত্রাও এইখান থেকেই শুরু।

কিন্তু দাদর নামে একটা স্টেশনে এই দুটো পথই এসে একবার মেলে। তারপর যে যার পথে চলে যায়। বম্বে আসার পথে এই স্টেশনটি দেখেছিলুম। দেখলুম ফেরার পথেও। দাদর বম্বেরই একটি বড় পাড়া। পৌঁছতে ষোল মিনিট সময় লাগে। আর সব ট্রেন এখানে দাঁড়ায় না। শিয়ালদহ ছেড়ে বালীগঞ্জ স্টেশন যেমন, এ কতকটা তেমনি। তারপরে কল্যাণীর মতো কল্যাণ স্টেশন। এক ঘণ্টা ছ মিনিট সময় লাগল কল্যাণে পৌঁছতে।

কল্যাণ একটি জংসন স্টেশন। পুনার ট্রেন এখান থেকে দক্ষিণে

নেমেছে। সোজা পথ গেছে দিল্লী ও কলকাতার দিকে। ছুটির দিনে আমি রেলওয়ের ম্যাপ দেখেছি মনোযোগ দিয়ে। বেড়াতে বেরোবার আগে প্রতি বারেই দেখেছি। এই সব পথঘাট সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। মনে মনে আমি যখন রেলের মানচিত্রটি মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলুম, তখন স্বাতি আমাকে বাধা দিল। বলল : চোখ বুজে কী ভাবছ গোপালদা ?

এর আগে বুফে কারের বেয়ারা এসে মামার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পিছন ফিরে মামা বলেছিলেন : সাত সকালে চা-টা তেমন জুত-সই হয় নি, কী বল গোপাল ?

মামী বললেন : আর একবার খাবার ইচ্ছে হয়েছে তো খাও না।

মামা বললেন : ইচ্ছে কি আর সাধে হয়েছে !

বাধা দিয়ে মামী বললেন : অত ভূমিকার কী দরকার ? বুঝতে তো সবই পাচ্ছি।

তা বুঝবে না, তুমি অন্তর্যামী যে !

কিন্তু বেয়ারা কিছুই বোঝে নি। বাঙলা ভাষায় অধিকার নেই মারাঠী বেয়ারার। সে শুধু এইটুকু বুঝেছে যে দাঁড়িয়ে থাকলে একটা অর্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না বলে স্বাতি বলল : চায়ের সঙ্গে আরও কিছু দাও—কেক বিস্কুট স্যাণ্ডুইচ যা পার, কিন্তু রুটি মাখন চাই নে।

বেয়ারাকে আমি হিন্দীতে এই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলুম। তার চা আনবার সময় হয়েছে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে আছে বলে বললুম : চোখ বুজে এই অঞ্চলটা দেখবার চেষ্টা করছি। সেকালে মুনি ঋষিরা যেমন ধ্যানে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করতেন, কতকটা তেমনি।

কৌতূহল নিয়ে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী দেখলে ?

বললুম : দেখছি যে পুনার গাড়িতে না চেপে যদি বারাণসী

এক্সপ্রেসে চাপতুম তো পুনার বদলে আমরা একই সময়ে পৌঁছতুম নাসিক রোডে। নাসিক হিন্দুদের একটি বড় তীর্থস্থান। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় শুনলে না, আমাদের সামনেই ছেড়ে গেল বারাণসী এক্সপ্রেস।

স্বাতি বলল: কই শুনি নি তো!

বললুম: চোখ কান সারাক্ষণ খুলে রাখতে হয়, আর মন খুলতে হলে বন্ধ করতে হয় চোখ আর কান।

সামনে থেকে মামা বললেন: গোপাল কি তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছ!

লজ্জা পেয়ে আমি বললুম: না, রেল লাইনের কথা বলছি। নাসিক রোডে না নামলে আমরা মনমাডে নেমে আর একবার ইলোরা ও অজন্তা দেখবার জন্যে ঔরঙ্গাবাদে যেতে পারতুম। প্রথম দিন ইলোরা দেখে পরের দিন অজন্তা, তারপরে জলগাঁওএ গিয়ে ট্রেন। তাড়াতাড়ি কলকাতা পৌঁছতে হলে আমাদের ওয়ার্ধা নাগপুর হয়ে যেতে হবে। আর তা না হলে ভুসাবল থেকে উত্তরে ইটার্সি জব্বলপুর ও এলাহাবাদ হয়ে কলকাতা। দিল্লীর ট্রেন ইটার্সি থেকে ভোপাল আগ্রা হয়ে যাবে।

মামা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না বলতে। বুফে কারের বেয়ারা দুখানা ট্রে এনে উপস্থিত করেছিল। মামী একখানা নিজের হাতে নিতেই বেয়ারা আর একখানা দিল স্বাতির হাতে।

চা খেতে খেতে মামা বললেন: আমরা তো এ পথে অজন্তা ইলোরা দেখি নি!

বললুম: না। আমরা হায়দ্রাবাদ থেকে ছোট লাইনের গাড়িতে চেপে ঔরঙ্গাবাদে এসেছিলুম। তারপরে ইলোরা দেখে গিয়েছিলুম অজন্তা দেখতে।

মামা বললেন: মনে পড়েছে।

কিন্তু স্বাতির দিকে চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দু চোখের দৃষ্টি তার স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে। তার কি সেই পুরনো দিনের কথ

মনে পড়ছে! অজন্তার সেই নদীর ধারে বসে নিজেদের ভাবনার কথা!

সেদিনের কথা আমিও ভুলব না। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে নদীর ধারে আমরা পাশাপাশি বসেছিলুম। একটুখানি ছায়ায় একটা বড় পাথরে বসে স্বাতি আমায় ডেকেছিল। সঙ্কীর্ণ স্থান, তবু নিমন্ত্রণ অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে সে নিজের হাতখানাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দ্বিধা করতে পারি নি, আমি এসে তাকে ঘেঁষে বসেছিলুম।

দু-একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। কিন্তু কে আমাদের লক্ষ্য করছে, আর কে করছে না, তা আমরা তাকিয়ে দেখি নি। পৃথিবীতে যে আমাদেরও একটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেদের আমরা বঞ্চিত করি নি।

বোধহয় আমার হিউএন চাঙের কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়েছিল তাঁর দুঃসাহসী ভ্রমণের কথা। কত পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে তিনিও এসেছিলেন অজন্তার গুহা মন্দিরে। শুধু কি ধর্মের টানে এসেছিলেন, না তার সৌন্দর্যের কথাও শুনেছিলেন কারও কাছে!

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি বল তো আমরাও কি বেরোতে পারি না দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে? পারি, এ কথা আমি বলতে পারি নি। তাই আমি কবিতায় একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলুম—

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মনে হল যে আমার উত্তরটা ঠিক হয় নি। স্বাতির প্রশ্নটা আমি সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছিলুম।

হঠাৎ আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম। স্বাতি আস্তে আস্তে বলল: অজন্তার কথা বুঝি মনে পড়েছে!

আমি মিথ্যা বলতে পারলুম না। নিঃশব্দে মেনে নিলুম তার কথা।

স্বাতি বলল : এ দিকে আরও অনেক গুহা মন্দির আছে শুনেছি, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কিছুই দেখা হল না।

বললুম : ফিরে গিয়ে এলিফেন্টা দেখতে পাবে।

স্বাতি বলল : এক সঙ্গেই দেখব।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না, কিন্তু আমার মন বলছিল যে বম্বে ফিরে আর কিছু দেখা আমার হবে না।

সত্যিই হয় নি। এলিফেন্টার কথা আমি গাইড বই পড়ে জেনেছিলুম। মাইল ছয়েক দূরে সমুদ্রের মধ্যে এই এলিফেন্টা দ্বীপ। আগে যেখানে নৌকো ভিড়ত, সেই রাজঘাটের কাছে পাহাড়ের গায়ে একটি বিরাট হাতির মূর্তি ছিল। দেড় শো বছর আগে সেই হাতির মুণ্ডটি ভেঙে পড়ে। তার পরে সেটাকে সরিয়ে এনে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে রাখা হয়েছে। হাতির জন্যে সাহেবরা এই দ্বীপের নামকরণ করেছিল এলিফেন্টা। যেখানে হাতির মূর্তি ছিল, তার নিকটেই একটি পুরনো নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। তার প্রাচীন নাম মঙ্গলপুরী। স্থানীয় লোকেরা বলে ঘারাপুরী, মানে গড়পুরী। কিন্তু এখন হাতি নেই, তবু এলিফেন্টা নামটাই প্রচলিত হয়ে গেছে।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি ছোট উপত্যকা। রাজঘাটে নামলে মাইল খানেক হাঁটতে হয়। কিন্তু নতুন ঘাট থেকে গুহা নিকটে, সিঁড়ি আছে গুহার মুখ পর্যন্ত। হাঁটতে যাদের অসুবিধা আছে, স্থানীয় লোক আছে তাদের বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই গুহা মন্দির অষ্টম শতাব্দীর হিন্দু কীর্তি বলে সবাই মনে করে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে এগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। হিন্দুদের স্বর্ণ যুগে কোন শৈব রাজা যে এগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই

দেবাদিদেব মহাদেব যে বিশ্বের সমস্ত শক্তির উৎস, সেই ভাবনাকেই এখানে রূপ দেওয়া হয়েছে।

সেখানে কী দেখবার আছে বই পড়েই আমি তা জেনেছিলুম। অনেক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গণেশ গুম্ফার সামনের লম্বা বারান্দায় পৌঁছতে হয়। সারিবদ্ধ হাতি ও বিরাটকায় দ্বারপালগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের ভিতরে এক দিকে অর্ধনারীশ্বর শিব, অন্য দিকে শিব ও পার্বতী, মাঝখানে সেই বিখ্যাত মহেশ মূর্তি বারো হাত উঁচু। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিকে দেখা যাবে শিবের তিনটি মুখে। বামে রুদ্রের কঠিন রূপ, দক্ষিণের রূপ স্নেহ-কোমল এবং মাঝখানে শান্ত সমাহিত পিতার রূপ। দেবাদিদেব যেন এই তিন রূপে সৃষ্টি রক্ষা করছেন।

এ ছাড়াও শিবের নানা রূপের সুন্দর মূর্তি আছে। সকৌতুকে শিব গঙ্গাকে জটায় আবদ্ধ রাখবার পর মুক্তি দিচ্ছেন, তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্ত নটরাজ শিব, কমলাসনে আসীন যোগীশ্বর শিব, আবার শিবের অন্ধক বধের সেই ভয়াবহ দৃশ্য। অন্যত্র পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহের দৃশ্য আছে, আছে দশানন রাবণের কৈলাস উত্তোলনের দৃশ্য। দেবদেবীদের শিব ও পার্বতীর উপরে পুষ্পবৃষ্টির দৃশ্যও আছে।

স্বাতি বলল : আজ অমন চুপ করে আছ কেন?

বললুম : এলিফেন্টার কথাই ভাবছি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : এখনও এলিফেন্টার কথা ভাবছ!

বললুম : এলিফেন্টা দেখতে গেলে বোধহয় আমার আনন্দের চেয়ে দুঃখই বেশি হবে।

কেন?

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম : শুনেছি পর্তুগীজ সৈন্যরা এক সময় এই দ্বীপে ঘাঁটি করেছিল। তখন তারা ভাল ভাল মূর্তিকে তাক করে গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করত। তাই সে সব মূর্তির খুব ক্ষতি হয়েছে।

স্বাতি বলল : ক্ষতি হবার পরেও তো তার আকর্ষণ কমে নি! এ অঞ্চলের অনেক গুহা মন্দিরের চেয়ে এলিফেন্টার আকর্ষণ আজও অনেক বেশি।

কথাটা মিথ্যা নয়। পশ্চিম ভারত গুহা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পাহাড় কেটে গুহা মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয় মহারাজ অশোকের সময়। তিনি ও তাঁর পৌত্র দশরথ বিহারের গয়া জেলায় সাতটা গুহা নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম যুগের বৌদ্ধ গুহাগুলি নির্মিত হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের দু শো বছর আগে থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তখন বাণপ্রস্থে যেত পাহাড়ে বা বনে। গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হত। খড়কুটো দিয়ে কুটীর নির্মাণের চেয়ে পাহাড়ে একটা গুহা খুঁজে নেওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল। কোন খরচ নেই, অথচ নিশ্চিন্ত নিরাপদ স্থান। ক্রমে ক্রমে মানুষ এই গুহাকে সংস্কার করা শুরু করল। দেবতার উপাসনার জন্য সুন্দর স্থান চাই। বৌদ্ধরা চৈত্য নির্মাণ করল, আর তার পাশে নিজেদের আবাসের জন্য বিহার। পশ্চিমঘাট পর্বত বুঝি এই কাজের জন্য আদর্শ স্থান বলে বিবেচিত হল। করলা কালহেরি নাসিক ভাজা বেদ্‌সা এবং অজন্তায় প্রথম যুগের গুহা মন্দিরগুলি নির্মিত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় যুগের গুহা মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। এতে কাঠের ব্যবহার একেবারে পরিত্যক্ত হয়, এবং বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হয় মন্দিরের ভিতর। বিহারের ছোট ছোট প্রকোষ্ঠগুলিতেও বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সমস্তই হীনযান বৌদ্ধদের কীর্তি। এর পরে মহাযান বৌদ্ধরা কোন নূতনত্ব আনতে পারে নি। পরবর্তী কালে হিন্দু ও জৈনরাও এই রীতি অনুসরণ করেছে। সামান্য যা পরিবর্তন করতে হয়েছে, তা শুধু ধর্মের প্রয়োজনে।

দ্রাবিড় শিল্পে দুটি জিনিস খুবই স্পষ্ট। একটি মণ্ডপ, আর একটি

রথ। মণ্ডপ হল পাহাড় কেটে বার করা একটি চারি দিক খোলা ঘর, দেবতার জন্য দু-চারটি প্রকোষ্ঠ আছে। আর রথ হল একটি পাথর থেকে তৈরি মন্দির।

গুহা মন্দির আমরা বেশি দেখি নি। বিজাপুরের দক্ষিণে বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গল্প শুনেছি এক সহযাত্রী কৃষ্ণ রাওএর কাছে। আমরা সেবারে সমগ্র দক্ষিণ ভারত দেখে কর্ণাট দেশের উপর দিয়ে দেশে ফিরছিলুম। এই যাত্রার শেষেই দেখেছিলুম ইলোরা ও অজন্তা। প্রাণভরে দেখেছিলুম, কোন আক্ষেপ আমরা রাখি নি।

এই বারের ভ্রমণে সৌরাষ্ট্রের জুনাগড়েও ছিল প্রাচীন গুহা। কিন্তু আমরা তা দেখবার সুযোগ পাই নি। উপরকোট দুর্গের ভিতরে এই গুহা। আমরা উঠে সরোবরের ধারে বসে খানিকটা সময় কাটিয়ে নেমে এসেছি। সত্যি বলতে কি, এই গুহার কথা তখন আমরা জানতুম না।

বম্বের আশেপাশেও এমন গুহা মন্দির অনেক আছে। কালহেরি যোগেশ্বরী মণ্ডপেশ্বর করলা ভাজা বেদ্সা আর নাসিক। এসব গুহারও পরিচয় আমি পড়েছি।

কালহেরি গুহা বম্বে থেকে মাইল চব্বিশেক দূরে। পশ্চিম রেলের চরিভলি স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি বনময় স্থানে এই গুহা। কাছেই একটি শীতল জলের ঝর্ণা। খুবই প্রাচীন হীনযান গুহা। একটি চৈত্য ও দরবার হল দেখবার মতো। এ ছাড়াও প্রায় শ খানেক গুহা এখানে আছে।

মণ্ডপেশ্বর গুহাও এই স্টেশনের মাইল খানেকের মধ্যে। এটি হিন্দু গুহা ছিল। পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জর্জ এটিকে গির্জায় পরিণত করেন। এখনও এখানে খ্রীষ্টান অনাথ আশ্রম আছে। গুহার নাম হয়েছে মন্টপেজির।

যোগেশ্বরী গুহা ঐ নামের স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে। অষ্টম শতাব্দীর মহাযান গুহা। মন্দিরগুলি সব আলাদা আলাদা।

এর পরে নাসিকের গুহা মন্দির। নাসিক স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। হীনযান বৌদ্ধদের এই তেইশটি গুহার নাম পাণ্ডু-লেখা। প্রথম শতাব্দীতে তৈরি বলে অনুমান করা হয়। তখন বুদ্ধের মূর্তি বদলে তাঁর সিংহাসন বা পায়ের ছাপ রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন যে সব বুদ্ধের মূর্তি দেখা যাচ্ছে, সব পরবর্তী কালের তৈরি বলে মনে করা হয়।

কল্যাণ আমরা অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। ট্রেন এখানে ইলেক্‌ট্রিকে চলছে। কলকাতার দিকে গেলে ইগৎপুরী স্টেশনে ইঞ্জিন বদল হত। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনের বদলে লাগত স্টীম ইঞ্জিন। কিন্তু এদিকে পুনা পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন। পশ্চিমঘাট পাহাড় ডিঙিয়ে পুনায় গিয়ে থামবে। মানচিত্রে এই পাহাড় একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো উত্তর থেকে সুদূর দক্ষিণে বিস্তৃত। মানচিত্রে আছে ভোরঘাট ও থলঘাটের নাম। ভোরঘাট অতিক্রম করে বম্বের মানুষ পুনায় যায়।

এই দৃশ্যের তুলনা বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোনখানে নেই। রেলপথ চলেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও উঠছে, কখনও নামছে। পথ যেখানে অবরুদ্ধ, সেখানে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ আছে। কোথাও পাহাড়ের উপরে গাছপালা দেখছি, কোথাও সেই পাহাড় স্তরে স্তরে নেমে নিচের সমতলে গিয়ে মিলেছে। কী বিচিত্র দৃশ্য!

এক সময় স্বাতি বলে উঠল: মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি আমি তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু পাহাড় আর দেখছি না। দেখছি নিচের সমতল ভূমি। নিচে অনেক দূরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে। সহসা এই দৃশ্য চোখে পড়লে আকাশে ওড়ার কথাই মনে হয়।

গুহা মন্দিরের কথা আমি ভুলতে পারি নি। এই লাইনেও

আছে তিনটি গুহা মন্দির—করলা ভাজা ও বেদ্‌সা। লোনাভ্‌লা নামে একটা স্টেশনে নেমে যেতে হয়, পরের স্টেশন খাণ্ডালা থেকেও যাওয়া যায়।

করলা গুহার চৈত্যটি দেখবার মতো। বোধহয় এইটিই সবচেয়ে বড়। এক শো চব্বিশ ফুট লম্বা, পঁয়তাল্লিশ ফুট চওড়া ও ছেচল্লিশ ফুট উঁচু। প্রবেশের পথটিও অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। চৈত্যের ভিতরে সূর্যের আলো আসবার ব্যবস্থাটি এমন মনোরম যে তা নজরে পড়বেই। উপর থেকে আলো এক এক জায়গায় এক এক রকম পড়ে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া। আর এই আলো-ছায়ায় ভিতরটা গম্ভীর ভাবে থম থম করে।

ভাজায় আঠারোটি গুহা তৈরি হয়েছিল ভিক্ষুণীদের জন্যে। তার প্রধান গুহার সামনেটা এখন ভেঙে পড়েছে। কিছু ফ্রেস্কোর নমুনা আছে, আর আছে সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন।

বেদ্‌সা গুহার শেষ চার মাইল পথ খুবই খারাপ। হেঁটে যাওয়াই উচিত। না গেলেও ক্ষতি নেই। করলা দেখবার পর এ গুহা না দেখলে দুঃখ পেতে হবে না।

কিন্তু স্বাতি এ সব কথা ভাবছিল না। সে তাকিয়ে ছিল বাহিরের দৃশ্যের দিকে। আস্তে আস্তে বলল: উড়ো জাহাজে গেলে বোধহয় এর চেয়ে ভাল দেখা যেত না।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলুম না। আজ তার কল্পনায় খানিকটা বিলাস দেখছি। স্বপ্নের পাখা জুড়ে সে তার রঙীন কল্পনাকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি উড়তে জানি নে। আমার জীবন আছে কঠিন মাটির সঙ্গে বাঁধা। ভারি দুটো হাত নিয়ে আকাশে ওড়ার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নে।

কেন জানি না, জো রায়ের কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। এতক্ষণ হয়তো সে আমাদের হোটেলে এসে উপস্থিত হয়েছে। ম্যানেজারের কথা সহসা তার বিশ্বাস হবে না। সন্ধ্যা বেলায়

যাদের দেখেছে, ভোর বেলায় তারা পালিয়ে গেছে, এ যেন অবিশ্বাস্য কথা। তবু সে দমবে না, আবার আসবে। সোমনাথের পথে স্বাতি যে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, সে কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। মনে থাকলেও গায়ে সে কোন অপমান মেখে রাখে নি। সে জানে যে পুরুষকে ধরা দেবার জন্যে নারী তাকে বার বার ফিরিয়ে দেয়। প্রেমের পরীক্ষা হয় এই ফেরানোর খেলায়।

তারপর?

তারপরের কথা ভাবতে আমার ভয় হয়। এই ভয় আমার আগে ছিল না। এই ভয় আমার নূতন দেখা দিয়েছে। যার কিছু নেই, তার আবার হারাবার ভয় কি। আমি কি কিছু পেয়েছি যে আজ আমার হারাবার ভয় জেগেছে! বুকের ভিতরে যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলুম, কিন্তু ঐ যন্ত্রণায় কোন কষ্ট হচ্ছে না কেন!

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে আমার দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু মুখে তার প্রসন্ন হাসি। এই হাসি দিয়ে সে কি উপহাস করছে আমাকে!

১৭

পুনার পথে পাহাড় যেন আর ফুরোয় না। বাহিরের দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল : এ পাহাড়ে বরফ কোথাও দেখছি না।

বললুম : বরফের পাহাড় এ নয়।

বরফের কি আলাদা পাহাড় হয়?

বরফ দেখতে হলে হিমালয়ে যেতে হবে। ভারতের আর কোন পাহাড়ে বরফ নেই।

তাই কি!

বললুম : আবু পাহাড় তো দেখলে! বরফের বদলে সেখানে পাথর আছে। নীলগিরি অমন উঁচু পাহাড়, কিন্তু সেখানেও আমরা বরফ দেখি নি।

নীলগিরির কথা স্বাতির বোধহয় মনে পড়ে গেল। বলল : কিন্তু শীত একটুও কম নয়। এখানে তো শীতও করছে না!

বললুম : তবু এই পাহাড়ে বম্বের বড়লোকেরা বেড়াতে আসে—মাথেরন খাণ্ডালা আর লোনাভ্‌লায়। পুনার মানুষ যায় মহাবলেশ্বর আর পাঁচগানি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : এ সব জায়গা তুমি দেখেছ নাকি!

গম্ভীর ভাবে বললুম : দেখেছি।

স্বাতি আরও আশ্চর্য হয়ে বলল : দেখেছ!

বললুম : মানচিত্রে দেখেছি।

মামা যে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন, তা বুঝতে পারলুম তাঁর হাসি শুনে। তিনি সরবে হেসে উঠলেন।

স্বাতি বলল : কিন্তু সহজে রেহাই পাবে না। সে সব জায়গায় কী দেখবার আছে, তা বলতে হবে।

বললুম : এ গাড়িতে তা সম্ভব নয়।

কেন ?

এ সব উঁচু দরজার গাড়িতে আদব কায়দা অন্য রকম। গায়ে পড়ে আলাপ করতে গেলে বড়লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভাল করে উত্তর দিতেও ভয় পায়—কী জানি, কী মতলব আছে!

এ তোমার মিথ্যা সন্দেহের কথা।

বললুম : এত দিন এ আমার সন্দেহের কথাই ছিল। এখন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এ দেশের মানুষ চিরকাল দান করে আনন্দ পেত জানতুম, এখন দেখছি যে কেউ কিছু চাইতে পারে ভেবেই সবাই কুঁকড়ে আছে। যার যত বেশি আছে, তার ভয়ও তত বেশি।

মামা আর হাসলেন না, স্বাতিও করল না প্রতিবাদ।

বললুম : ঐ যে ও ধারে যে ভদ্রলোক একা বসে সিগার খাচ্ছেন, তিনি নিশ্চয়ই পাহাড়ে যাচ্ছেন।

কী করে জানলে ?

বললুম : ভদ্রলোকের চেহারা দেখে।

চেহারা দেখে কোথায় যাচ্ছে বলতে পার ?

অনুমান করতে পারব না কেন! শৌখিন মানুষ, আর গায়ের স্যুটটা গরম কাপড়ের মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল : উঁহুঁ, টেরিলিনের স্যুট মনে হচ্ছে।

তার পরেই জিজ্ঞাসা করল : ভাব করবে নাকি ?

লাভ হবে কিছু ?

দেখ না চেষ্টা করে।

বলে সে পা গুটিয়ে বসল।

বললুম : আমার খদ্দর দেখে ভদ্রলোক ঘাবড়ে না যান।

বলে আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলুম। আর কোন কথা না বলে তাকালুম মামা মামীর দিকে।

মামী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবারে মনে হল যে আমি উঠে যাওয়াতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। স্বাতির পাশে বসা কি তিনি পছন্দ করছিলেন না! আমাদের অন্তরঙ্গতা কি পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে! সহসা আমার সোমনাথের কথা মনে পড়ল। তিনি নিজে আমাকে তাঁর গাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন, বসতে দিয়েছিলেন স্বাতির সঙ্গে। সেই অবস্থার তো কোন পরিবর্তন হয় নি! হালদারের কথা কি তিনি অবিশ্বাস করেছেন! অবিশ্বাস করা তাঁর আগেই উচিত ছিল। লটারিতে আমি কোন টাকা তো পাই নি, লটারির টিকিটই কিনি নি কোন দিন। কয়েকখানা বই লিখেছি বটে, কিন্তু তার জন্য আমার অত সম্মান পাওনা ছিল না। শ্রীমতী সান্যাল সোমনাথে ভুল করেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে যে মামী বোধহয় জো রায়ের সঙ্গে আমার তুলনা করছেন। করবেনই। বম্বের রঙ্গমঞ্চে যে জো রায় আবার দেখা দিয়েছে! পালিয়ে এসে কি স্বাতি নিস্তার পাবে! কিন্তু সে পালাবেই বা কেন?

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে এখন বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। আমি সরে যেতে কি সেও আরাম পেয়েছে! কিন্তু যাঁর পাশে এসে আমি বসলুম, তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বসলেন। আমার আপাদমস্তকও বোধহয় একবার তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। শুধু সিগারের ধোঁয়ায় আরও বেশি আচ্ছন্ন করে ফেললেন নিজের জায়গাটি।

আমি বেশ সাহস সঞ্চয় করে বললুম: আপনি বুঝি পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন, তার পরে মুখের সিগার সরিয়ে বললেন: বেড়াতে নয়, কাজে। আপনি?

খুশী হয়ে বললুম: আমরা পুনা শহর দেখতে যাচ্ছি। আজ রাত্তেই ফিরব।

এক বেলায় কী দেখবেন ?

যতটুকু দেখা হয়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেব।

ভাল।

বলে ভদ্রলোক চুপ করলেন। কিন্তু নীরবে থাকলে আমার চলবে না। তাই বললুম : এ দেশের পাহাড় একটাও দেখা হবে না।

তখনও আমরা পাহাড়ের উপর দিয়েই চলেছি। ভদ্রলোক বললেন : সে রকম উঁচু পাহাড় এখানে নেই।

ভদ্রলোক থামলেও আমি তাঁকে থামতে দিলুম না, বললুম : শুনেছি, এ দিকের পাহাড় নাকি ভারি সুন্দর!

সুন্দর আর কোথায়! লোকজন এত কম যে বিজনেস একেবারে নেই।

লোকজন নেই কেন ?

ছিল সাহেবদের আমলে। ছোট ছোট শহরগুলোই সিজ্‌নে জমজমাট হয়ে উঠত।

কোন্ কোন্ শহর ?

এই ধরুন মাথেরন—

ভদ্রলোক আরও কতগুলো নাম করতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে আমি বললুম : মাথেরন বুঝি ভারি সুন্দর জায়গা ?

ভদ্রলোক এইবারে আমার মতলব বুঝলেন। আর বুঝতে পেরে সহজ হয়ে গেলেন অনেকখানি। বললেন : সুন্দর বৈকি! তা না হলে শৌখিন লোকেরা সারা বছর ধরে ওখানে যাবে কেন! একটু আগে আমরা নেরাল ছেড়ে এলাম। নেরাল জংশন বম্বে থেকে ঠিক দু ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে মাথেরন মাত্র সাত মাইল, ট্রেনে তেরো মাইল। হেঁটে উঠতেও দু ঘণ্টা, ট্রেনেও তাই। খেলনার মতো ছোট ছোট গাড়ি, বর্ষার সময় তা চলে না। কিন্তু পথ যেমন সুন্দর, শহরও তেমনি।

বললুম : বেড়াবার মতো অনেক ভাল জায়গা আছে নিশ্চয়ই ?

তা আছে বৈকি। এক এক দিন এক এক জায়গায় বেড়াতে যাবেন। গোটা তিরিশেক জায়গা, আর নামের কত বাহার সে সব জায়গার।

আরও কিছু শোনবার জন্যে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। আর আমার কৌতূহল দেখে তিনি বললেন : প্যানোরামা থেকে শুধু নিচের সমতল নয়, বম্বে পর্যন্ত দেখা যায়। রাগ্‌বিতে জমাট আড্ডা, মাঙ্কি পয়েন্টে বাঁদরের অত্যাচার। শার্লট লেক, হার্ট্‌স্ পয়েন্ট, ম্যালেট্‌স্ স্প্রিং। ম্যালেট সাহেবের নাম শুনেছেন ?

বললুম : না।

ভদ্রলোক বললেন : প্রায় এক শো বছর আগে ম্যালেট সাহেব এই জায়গাটা আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন থানার কালেক্টর। শিকারে বেরিয়ে এই সুন্দর পাহাড়টি দেখে তিনি স্থানীয় লোকেদের কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন। নিজেদের ভাষায় তারা উত্তর দিয়েছিল, মাথেরন হ্যায়, মানে ওখানে জঙ্গল আছে। সাহেব ভাবলেন ঐ জায়গার নামই মাথেরন। মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তিনি আসতে লাগলেন, আসতে লাগল তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও। পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে রেল লাইনও পাতা হয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন : এই নাম নিয়ে আরও একটি গল্প আছে। আপনি মারাঠী বোঝেন ?

বললুম : না।

আমি মানে বলে দেব।

বলে একটি ছড়া শোনালেন আমাকে :

মাথে পিত্তে গম ভিলা
মাথেরন না পহাইলা।

তার পরে এই ছড়ার মানে বললেন : ঐ অরণ্যে পৌঁছে আমরা পিতামাতা দুজনকেই হারিয়েছি। এ একটা প্রবাদ। ঐ পাহাড়ে

যে আদিবাসীর বাস, তাদের প্রথম পুরুষ নাকি ওখানে পৌঁছেই তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছে।

স্বাতির দিকে চোখ পড়তেই দেখলুম যে সে বেশ কৌতুক বোধ করছে। কিন্তু ভদ্রলোক সেদিকে লক্ষ্য না করে বললেন: এই শহরে আরও দুটো শহর আছে পাশাপাশি—খাণ্ডালা ও লোনাভ্‌লা। একেবারে ভোরঘাটের উপরেই। মাথেরন আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে, আর এ দুটো জায়গা দু হাজার ফুট। বম্বে থেকে পুনা পর্যন্ত যে পাকা সড়ক, তারই উপরে চমৎকার পিকনিকের জায়গা। অনেকে মোটরে আসে, বাসেও আসা যায়। খাণ্ডালায় হোটেল আছে, ঘরবাড়িও আছে, আর আছে কয়েকটি ঝর্ণা। বর্ষার পরে অপরূপ তাদের রূপ। একটি ঝর্ণা প্রায় তিন শো ফুট নিচে নেমেছে। আর ডিউক্‌স নোজ নামে একটি পাহাড় এমনি উঁচু যে সমর্থ পুরুষেরাই শুধু উঠতে পারে। স্থানীয় লোকেরা এই পাহাড়কে বলে নাগফুঙ্গি, মানে সাপের ফণা।

এর পরে ভদ্রলোক লোনাভ্‌লার কথাও বললেন: খাণ্ডালা থেকে লোনাভ্‌লা মাইল তিনেক দূরে। চেহারাটা কতকটা ঘিঞ্জি শহরের মতো। বাজারের বাহিরে না গেলে সৌন্দর্যের স্বাদ নেই। রাই ফরেস্ট, ভাঙ্গেরওয়াড়ি গ্রাম, টাইগার্স লিপ পাহাড়, হর্স শু ভ্যালি আর জলের লেকগুলি সত্যিই দেখবার মতো। লোনাভ্‌লা একটি বড় রেলওয়ে স্টেশন। একটি নৌবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রও আছে, আর আছে তিনটি বিখ্যাত গুহা। দু-শত মাইলের মধ্যে কারলা ভাজা ও বেদ্‌সা গুহা। দেখেছেন এসব?

বললুম: না। তবে বইএ নাম পড়েছি।

ভদ্রলোক বললেন: অজন্তা ইলোরা দেখেছেন তো? একই জিনিস, তবে অনেক ছোট। ভাজা থেকে দুটো দুর্গও দেখতে পাবেন—ভিলাপুর আর লোহাগড়। শিবাজীর আমলে খুব কাজে লেগেছিল।

আমার মনে হল যে এ ভদ্রলোক বোধহয় মহাবলেশ্বরের কথাও জানেন। সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন: ভূগোলে এ নাম পড়েছেন তো? সাহেবদের আমলে বোম্বাই প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। পশ্চিমঘাট পাহাড়ে এটাই সবচেয়ে উঁচু শহর, প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু। পুনা থেকে সাতাত্তর মাইল পথ নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। তিনটে ঘাট পেরিয়ে পৌঁছতে তিন চার ঘণ্টা সময় লাগে।

তৃতীয় ঘাটের মাথাতেই পাঁচগানি নামে আর একটি পার্বত্য শহর। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে মহাবলেশ্বর বারো মাইল। কিন্তু আবহাওয়ার আকাশ-পাতাল তফাত। পশ্চিমঘাটের কোন পাহাড়েই সারা বছর থাকা যায় না, প্রচুর বৃষ্টিপাত। মহাবলেশ্বরে সাড়ে তিন শো ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। কিন্তু পাঁচগানিতে ষাট ইঞ্চি বৃষ্টি, আর সারা বছর সুন্দর আবহাওয়া। এটি তাই একটি জনপ্রিয় শহর হয়ে উঠেছে। যত স্কুল তত হোটেল, যত বাড়ি তত স্যানাটোরিয়া। রোগীদের প্রিয় তীর্থ এটি।

মহাবলেশ্বর নামের পৌরাণিক উপাখ্যানটিও তিনি আমাকে বললেন। পুরাকালে মহাবল অতিবল নামে দুই রাক্ষস ছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণরা বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু অতিবলকে বধ করলেন, কিন্তু মহাবলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় হেরে যাচ্ছিলেন। তখন মায়াদেবী এসে মহাবলের মতিচ্ছন্ন করলেন। মহাবল বিষ্ণুর যে কোন দাবী মেটাতে রাজী হলেন। বিষ্ণু তার প্রাণ চাইলেন। মহাবল বলল, তথাস্তু। এই ত্যাগ দেখে শিব হলেন সন্তুষ্ট, বললেন, বর চাও। মহাবল বলল, তোমরা দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর—মহাবলেশ্বর আর অতিবলেশ্বর।

ভদ্রলোক বললেন: পুরনো মহাবলেশ্বরে এখনও এই মন্দির আছে। বাজার থেকে আর্থার সীট যাবার পথে এই মন্দির মাত্র মাইল তিনেক দূরে। মন্দিরের একটা গোমুখ থেকে নাকি দক্ষিণের

পাঁচটি নদীর জন্ম হয়েছে। কৃষ্ণা তার অন্যতম। এ পথে একবার আপনাকে যেতেই হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম : কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : মাইল দশেক দূরে হলেও আর্থার সীট আপনাকে একবার দেখতে হবে। অ্যামেরিকার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখেন নি তো! আমাকে একজন অ্যামেরিকান বলেছিলেন যে আর্থার সীট থেকে পাহাড়ের যে দৃশ্য দেখা যায়, তা কতকটা গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের মতো। আর একটা অদ্ভুত দ্রষ্টব্য আছে। সেটা হল কেট্‌স পয়েন্টে নীড্‌লস্ হোল। পাহাড়ের একটা স্বাভাবিক জানলা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে গা শির শির করে ওঠে। আশ্চর্য দৃশ্য। ঐ জানলা দিয়ে বাতাসে একটা রুমাল কিংবা হাল্কা টুপি উড়িয়ে দিলে ভেসে ভেসে নিজের হাতেই আবার তা ফিরে আসে।

ট্রেনের গতি কিছু মন্থর হয়েছিল। ভদ্রলোক তা লক্ষ্য করে বললেন : মাথেরনের চেয়েও পুরনো শহর মহাবলেশ্বর। বম্বের এক গভর্নর ম্যালকম সাহেব এই শহরটি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে। এখানে যত দেখবার জায়গা আছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে বললেন : এল্‌ফিন-স্টোন পয়েন্ট, কনট পীক, ব্যাবিংটন। বম্বে পয়েন্ট থেকে পরিষ্কার রাতে বম্বের বাতি দেখা যায়, যেমন মাথেরন থেকে। তারপর—

ট্রেনের গতি যত কমছিল, ভদ্রলোক ততই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তাই দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কি নামবেন এখানে ?

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ, লোনাভ্‌লায় নামব।

তারপরে বললেন : মহাবলেশ্বরে গেলে প্রতাপগড়ও দেখে আসবেন। মহারাষ্ট্রে দুর্গের তো অভাব নেই। এই সব দুর্গ দেখলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে কতকটা বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এর বেশি ভদ্রলোক আর বলতে পারলেন না। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে। ইলেকট্রিক ট্রেন। যেমন তাড়াতাড়ি থামে, তেমনি তাড়াতাড়ি ছাড়ে। তৎপর না থাকলে যাত্রীদের ফেলেই চলে যাবে মনে হয়। কখন আমরা কাড়জাতি দাঁড়িয়েছি, আর কখন খাণ্ডালায়, তা টেরই পাই নি। লোনাভলায় পৌঁছলুম প্রায় দশটার সময়। পুনা এখান থেকে দেড় ঘণ্টার পথ।

ভদ্রলোকের সঙ্গে শুধু একটি ব্রীফকেস ছিল, সেটি সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: সন্ধ্যার গাড়িতে আপনারা ফিরছেন তো, তাহলে দেখা হতে পারে।

বলে নমস্কার করলেন।

আমিও নমস্কার করলুম তাঁকে।

ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হল যে বাহিরের হাবভাব দেখে ভিতরের মানুষটিকে আমরা চিনতে পারি নি। মানুষ চেনার ব্যাপারে জীবনে আমরা ভুল করি বেশি।

ভদ্রলোক উঠে যেতেই স্বাতি এসে আমার পাশে বসে পড়ল। এমন সহজ ভাবে বসল যে এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস বলেই মনে হবে। আমার হাসি পেল তাই দেখে। আর আমাকে হাসতে দেখে স্বাতি বলল : হঠাৎ এ পুলক কেন ?

বললুম : পুলক তো অকারণে হয়। শুধু অকারণ পুলকে—

তার পরের লাইনটাও কি সত্যি ?

তার মানে ?

স্বাতি বলল : তুমি কি তোমার প্রাণকে ক্ষণিকের গান গাইতে বলছ ক্ষণিক দিনের আলোকে ?

বললুম : সে কথা তুমি আমার চেয়ে ভাল জান।

তুমি কেন জান না ?

এ গান চিরন্তন করার ক্ষমতা তো আমার নেই।

কেন নেই, সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।

বললুম : আমি তো কাঙাল, তাই নির্বাচনের ভার দিয়েছি তোমার হাতে।

স্বাতি বলল : কিন্তু কাঙাল কি দুর্বল হয় ? কিছু চাইতে জানে না সে ?

মুখ ফুটে চাইলে লোকে হ্যাংলা বলবে।

আর গায়ের জোর দেখালে ?

বললুম : গায়ের জোর তো নিজেদের জন্যে নয়। সে তৃতীয় পক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে। নিজেদের দ্বিধা ঘুচে গেলেই অপরের উপরে গায়ের জোর খাটানো চলে।

দ্বিধা কি তোমার কোন দিন ঘুচবে ?

বলেছি, নির্বাচনের ভার দিয়েছি তোমার হাতে।

স্বাতি বলল : বুঝেছি, লেখাপড়া করিয়ে নিতে চাও। দলিলে সইসাবুদ না হলে মনের দাবি তুমি মানবে না।

স্বাতির সঙ্গে আজ আমি কথায় পেরে উঠছি না, অথচ হেরে যেতেও ইচ্ছা নেই। বললুম : তোমার দাবির কথা তো কোন দিন জানাও নি!

তোমার নিজের বুঝি কোন দাবি নেই?

বললুম : আছে। আর সেটা জানাজানি হয়ে গেছে বলেই মামী এখন রীতিমত ভয় পাচ্ছেন।

সে অন্য ভয়।

অন্য ভয়!

বলে আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

গম্ভীর মুখে স্বাতি বলল : উপদ্রবের।

বলেই সে খিল খিল করে হেসে উঠল। আর আমি চমকে উঠলুম। ভয়ে নয়, ভাবনায়। মায়াময় মুহূর্তগুলি সে নিমেষে ভেঙে দিল নিষ্ঠুর হাতে। সে কি আমার সঙ্গে এতক্ষণ পরিহাস করছিল! স্বাতির এই স্বভাবের পরিচয় আমি আগেও পেয়েছি। অনেক দিন অনেক স্বপ্ন দেখবার সুযোগ সে দিয়েছে। তার পরে নির্দয়ভাবে জাগিয়ে দিয়েছে। বলে নি, পরিহাস করেছি। বলেছে, তুমি ভারি বোকা।

আমার অর্থ-সামর্থ্য থাকলে আমি বোকা হয়ে থাকতুম না। চালাক হতে আমিও জানি, কিন্তু ভয় অভাবকে, দারিদ্র্যকে ভয়। একা আমি কিছুতেই ভয় পাই নে। কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। মনুষ্যত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেই মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে হয় কঠিন দারিদ্র্যে। আর দারিদ্র্যের জন্ম অভাব থেকে হয় না, হয় অভাববোধ থেকে। অভাববোধ সংসারের ধর্ম। একা মানুষ অভাবকে জয় করতে পারে নিজের চরিত্রবল দিয়ে। সন্ন্যাসীর

নেই অভাববোধ, নিঃস্ব মহাপুরুষের আছে মন ভরা ঐশ্বর্য।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে স্বাতি বলল : মান গেল বুঝি?

বললুম : মান থাকলে তো মান যাবে।

এ অভিমানের কথা।

অপমানের বল।

স্বাতি চমকিত হয়ে বলল : আমি তোমাকে অপমান করেছি!

সম্মান কর নি।

প্রমাণ?

হেসে বললুম : অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কৌতুকে স্বাতির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল : জো রায়ের সমান?

জো রায়ের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। হোটেলে আমাদের দেখা না পেয়ে এতক্ষণ সে ফিরে গেছে। স্বাতির জন্যেই এমন হল। সব জেনে শুনেই সে বেরিয়ে এসেছে। তাকে এড়াবার জন্যেই যেন এই কাজ করেছে। তার এই আচরণের কারণ আমি বুঝতে পারি নি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়েছে যে জো রায়কে তার ভাল লাগে না। হয়তো সত্যিই লাগে না। কিন্তু সে কথা কেন যে খুলে বলে না! লজ্জায়, না সঙ্কোচে! হেসে বললুম : জো রায়কে তো হারিয়ে দিয়েছি।

সত্যি নাকি?

বলে স্বাতি সকৌতুকে তাকাল আমার দিকে।

বললুম : সত্যি না হলে স্বাতি কেন পালিয়ে এল!

স্বাতি গম্ভীরভাবে বলল : ভুল হল। তাকে হারাতে পারলে সেই পালিয়ে যেত, স্বাতি তার কাছ থেকে পালিয়ে যেত না।

মনে মনে আমি মেনে নিলুম তার কথা, কিন্তু মুখে কোন উত্তর যোগাল না।

স্বাতি বলল : অমনি মন খারাপ ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম : সত্যি বল তো, আজ এমন জোর করে কেন বেরিয়ে এলে ?

তা না হলে জো রায়ও সঙ্গে আসত।

তাতে ক্ষতি কী হত ?

তোমার কাছে ইতিহাস শোনার ব্যাঘাত হত।

বলেই সে খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি দেখতে পেলুম যে স্বাতির হাসির শব্দ শুনে মামী তার দিকে ফিরে তাকালেন। স্বাতিও বোধহয় তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। তাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল : তোমার গোত্র কি গোপালদা ?

গোত্র !

হ্যাঁ, গোত্র। ব্রাহ্মণদের থাকে না।

বললুম : সবারই থাকে। কিন্তু হঠাৎ তার দরকার হল কেন ?

কৌতূহল।

বললুম : বশিষ্ঠ।

স্বাতি আরও গম্ভীর হয়ে বলল : আমিও তাই ভেবেছিলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বল তো ?

তোমার আচরণে আমার সন্দেহ হয়েছিল।

আচরণ দেখে কি গোত্র জানা যায় ?

আমি জানলাম কী করে ?

বললুম : আমি বোকাসোকা মানুষ, একটু বুঝিয়ে বল।

স্বাতি বলল : তোমার আচরণ দেখে আমার বশিষ্ঠ মুনির কথা মনে পড়ছে। সেই গল্পটা তোমার মনে নেই ?

কোন্ গল্প ?

সেই যে রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে এসেছিলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে। তাঁর কামধেনু শবলা অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করল। সব দেখে

শুনে আশ্চর্য হয়ে রাজা বললেন, এই কামধেনুটি আমার চাই। কিন্তু শবলা বশিষ্ঠকে ছেড়ে যাবে না। রাজা বললেন, আমি জোর করে নিয়ে যাব। শবলা কেঁদে বলল, আমাকে রক্ষা কর প্রভু। কিন্তু রাজার লোকেরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর বশিষ্ঠ বলছেন, আমি কী করতে পারি! শবলা বলল, তুমি শুধু ইচ্ছা কর প্রভু, আমি আত্মরক্ষা করব। বশিষ্ঠ বললেন, তবে তাই কর।

তারপর ?

স্বাতি হেসে বলল : তুমি জান এই গল্প ?

আমি বললুম : আজ তোমার মুখে শুনব।

স্বাতি বলল : কামধেনু তার দেহ থেকে অগণিত সৈন্য সৃষ্টি করল। তার পরে হল তুমুল যুদ্ধ। সসৈন্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন বিশ্বামিত্র।

আমি বললুম : এর সঙ্গে গোত্রের কী সম্বন্ধ হল ?

স্বাতি বলল : বশিষ্ঠের মতো তোমাকেও দুর্বল দেখি।

আসলে আমি দুর্বল নই, এই তো ?

সে তুমিই জানো।

বললুম : তাহলে আমিও একটা গল্প বলি। বশিষ্ঠেরই গল্প। সহস্রবাহু কার্তবীর্য অর্জুন অগ্নির প্রার্থনা পূরণে নগর ও গ্রাম দান করেন। তাঁর বাণে যে আগুন জ্বলল, তাতে বশিষ্ঠের আশ্রমও গেল পুড়ে। বশিষ্ঠ তাঁকে ক্ষমা না করে শাপ দিয়েছিলেন, দুরাত্মা, তুমি জেনেশুনে আমার আশ্রম জ্বালালে বলে পরশুরাম তোমার সহস্র বাহু ছেদন করবেন। পিতা জমদগ্নিকে হত্যার অপরাধে পরশুরাম তাই করেছিলেন।

কিন্তু এতে প্রমাণ হল কী ?

বললুম : প্রমাণ এই হল যে বশিষ্ঠ নিজের অধিকারের কথা বুঝতেন, ক্ষমতাও জানতেন। প্রয়োজন হলে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এ যুগের বশিষ্ঠরা কিছুই জানে না, বোঝেও না কিছু।

আমি নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল : তোমার পাশে এসে কেন বসলাম, তা বুঝতে পেরেছ ?

বললুম : না।

তবেই দেখ, তোমার ক্ষমতা কী রকমের। অত্যন্ত জরুরি ও গোপনীয় কাজের জন্যে তোমার সাহায্যের দরকার।

মামা ও মামী এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে আছেন, স্বাতি তবু অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল : পুনা থেকে আজ আমরা ফিরব না।

তবে ?

এগিয়ে যেতে হবে গোয়ায়।

বল কি !

এই জন্যেই তো বলছি, তোমার সাহায্যের দরকার।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম : মামী আমাকে মেরে ফেলবেন।

স্বাতি বলল : তোমাকে নয়, আমাকে। যা করতে হবে, আমি তোমাকে বলছি

বল।

মালপত্র নিয়ে আমি যাব ওয়েটিং রুমের দিকে। আর তুমি চট করে গোয়ার খবর সংগ্রহ করে আসবে। টাইম টেব্‌লে দেখেছি, রাত আটটা নাগাদ ভাস্কো এক্সপ্রেস ছাড়ে এইখান থেকে। চারখানা বার্থ পাওয়া যায় কিনা সেই খবরটা দরকার। ওয়েটিং রুমে ফিরে এসে তুমি ইসারায় আমাকে বলবে। ইসারাটা কী ভাবে করবে বল তো

বললুম : চোখ টিপব।

ঠোঁট উল্টে স্বাতি বলল : এই বুদ্ধি নিয়েই করে খাবে।

লজ্জিতভাবে আমি বললুম : তবে ?

স্বাতি বলল : আঙুল দেখাবে। যটা বার্থ পাওয়া যাবে, ওটা আঙুল।

বললুম : আচ্ছা।

আর একটা কথা।

বল।

বলবে, পুনায় কী দেখতে হবে সেই খোঁজ নিতে যাচ্ছ। পুনার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ার খোঁজও নিও। দেরি হলে ক্ষতি নেই।

কেন ?

সাড়ে এগারটায় পৌঁছে শহর দেখতে বাবা রাজী হবেন না। খেয়েদেয়ে আরাম করবেন একটু, তারপর তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেড়ানো। যদি সম্ভব হয় তো দুজনে একটু ঘুরে আসব। মনে থাকবে তো ?

বললুম : থাকবে।

স্বাতি বলল : আর একটা কাজ যদি করতে পার তো তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নেব।

কী কাজ বল ?

সেবারে যেমন উটি যাবার ব্যবস্থা করেছিলে, এবারে তেমনি বম্বে এড়িয়ে ফেরার ব্যবস্থা।

বললুম : সে অসম্ভব কাজ।

কেন ?

চিরকালের জন্মে আমার অন্ন মারা যাবে। অত সাহস আমার নেই।

তবে শুধু শুধু তোমার পায়ের ধুলো কেন নেব।

তা নিও না। তাতে আমার কোন লাভ নেই।

অত্যন্ত ভীতু লোক।

বলে স্বাতি আমার পাশ থেকে উঠে গেল।

বেলা সাড়ে এগারটার সময় আমরা পুনায় এসে নামলুম। পুনার নাম এখন পুনে হয়েছে। কিন্তু স্টেশনটা পুরনোই আছে। ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের মেন প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্মের উপরতলায় ওয়েটিং রুম রিটায়ারিং রুম ও রিফ্রেশমেন্ট রুম। মালপত্র নিয়ে আমরা যখন উপরে উঠতে যাচ্ছিলুম, তখন স্বাতি বলে উঠল: তুমি ওপরে আসছ কেন গোপালদা? আমরা নিজেরাই গুছিয়ে বসতে পারব। তুমি বরং এখানে কী দেখতে হবে, তার খোঁজখবর নিয়ে এস।

বললুম: এই কাঠ-ফাটা দুপুরে কি শহর দেখতে ভাল লাগবে?

স্বাতি বলল: তাই বলে খোঁজ না নিলে তো চলবে না!

অগত্যা আমি আর উপরে উঠলুম না। রিজার্ভেসন অফিসের খোঁজ করতে গিয়ে দেখলুম যে সেটা স্টেশনের বাহিরে। খানিকক্ষণের চেষ্টায় খবর পেলুম যে গোয়ার জন্যে দুখানা বার্থ খালি আছে। কুপে পাওয়া যেতে পারে, আর একখানা বার্থের রিজার্ভেসন ক্যানসেল হবার সম্ভাবনাও আছে। আমি বললুম: আমরা চারজন আছি, পরামর্শ করে আপনার কাছে আসছি।

তারপরে খবর সংগ্রহ করলুম পুনার। সালওয়ার ওয়াডা দুর্গ, বান্দ্ গার্ডেন, সম্ভাজী পার্ক, পাহাড়ের উপর পার্বতী মন্দির—এক বেলায় এসব দেখা সম্ভব নয়। আর পার্বতী মন্দির দেখার ভাল সময় হল সকাল বেলায়। এই কাজে আমি বেশি সময় নষ্ট করলুম না। গোয়ার খবরটা স্বাতিকে তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার। তাই তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম।

স্বাতি বোধহয় আমার অপেক্ষা করছিল। বাইরে মুখ

বাড়াতেই আমি তাকে দুটো আঙুল দেখিয়ে দিলুম। স্বাতি আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। কাছে এসে আমি শুনলুম যে সে গোয়া দেখার প্রস্তাব করে ফেলেছে। আর নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে একটা বিস্ফোরণের।

মামার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। তিনি বললেন: পাগলামির কথা শুনেছ মেয়ের?

কিন্তু এই মন্তব্যে মামী জ্বলে উঠলেন, বললেন: তোমার আদরেই এমন হয়েছে।

তা বটে।

বলে মামা চুপ করে রইলেন। আর মামী বললেন: তোমাদের যদি এই মতলব ছিল তো আমাকে আগে বললে না কেন?

এইবারে মামা বললেন: কী করতে তাহলে?

মামী বললেন: সন্ধ্যা বেলায় ফিরব বলে আসতাম না।

আমি যেন কিছুই জানি না। এমনি ভাবে বললুম: আমরা আজ ফিরব না বুঝি?

তাহলে ভালই হল, কাল সকাল বেলায় দেখব পার্বতীর মন্দির।

মামা বললেন: সে কি গোয়ায় নাকি?

এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মামা আমাকে সন্দেহ করেছেন কিনা বুঝতে পারলুম না। এমন ভাবে তাকালুম যেন কিছুই বুঝতে পারি নি। তাই দেখে তিনি বললেন: আজ রাতে আমরা গোয়ার যাচ্ছি। তোমার পার্বতী মন্দির যদি গোয়ায় হয় তো কাল সকালে দেখা যাবে।

আমি আকাশ থেকে পড়বার ভান করলুম। আর স্বাতি বলল: এস গোপালদা, গোয়ার টিকিট পাওয়া যাবে কিনা দেখে আসি।

বলে মামার কাছ থেকে টিকিট কাটার টাকা চেয়ে নিল।

খুব গর্বিত ভাবে স্বাতি নিচে নামছিল। বলল: এইবারে তোমার কাজ, গোয়া থেকে অন্য পথে ফিরতে হবে।

আমি বললুম: আমাকে মাপ কর, অমন দুঃসাহস আমার নেই।

মুখের ভঙ্গিতেই স্বাতি একটা অবজ্ঞা প্রকাশ করল।

টিকিট কাটবার সময় আমরা আর একটি খবর পেলুম। গোয়ার রাজধানী হল পানাজি বা পান্‌জিম, কিন্তু সেখানে ট্রেন যায় না। মাড্‌গাও নামে একটি স্টেশনে নেমে পানাজি যেতে হয়। ভাস্কো এক্সপ্রেস যায় ভাস্কো-ডা-গামা স্টেশন পর্যন্ত। তার পরের স্টেশন হল মার্মাগোয়া হার্বার। ভাস্কো স্টেশন থেকেও পানাজি যাওয়া যায়, কিন্তু জুয়ারি নামে একটা চওড়া নদী নৌকোয় পার হতে হয়। স্বাতি বলল: তবে আমাদের মাড্‌গাওএর টিকিট দিন চারখানা, দুজন ওয়েটিং লিস্টে থাকব।

টিকিট আর চেঞ্জ নিয়ে স্বাতি তার ব্যাগে রাখল। তার পরে নেমে এল স্টেশনের বাহিরে। তার পুলক আজ ধরে না। বলল: এই শহরটা ভারি সুন্দর, তাই না গোপালদা?

আমি হেসে বললুম: সবই এখন ভাল লাগবে।

স্বাতি বলল: এস, চারি ধারটা একটু দেখে আসি।

কিন্তু রাস্তার দিকে না গিয়ে স্টেশনের ভিতরেই ফিরে এল, আর বইয়ের দোকানের সামনে এসে বলল: পুনার গাইড বই আছে?

আছে।

বলে দোকানদার একখানা হলদে রঙের ছোট চারকোণা বই বার করে দিল। কিছু না দেখেই স্বাতি বলল: ভারি সুন্দর বই, দাম কত?

বলে ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে দাম দিয়ে দিল।

এর পরেও সে উপরে উঠল না। বলল: এস, স্টেশনটাই ভাল করে দেখি। গোয়ার ট্রেন কোথা থেকে ছাড়ে সেটাও জেনে রাখি।

এখান থেকে মিটার গেজের ট্রেন গোয়ায় যায়। সে প্ল্যাটফর্মও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওভার-ব্রিজের উপর দিয়ে ওধারে গিয়ে নামতে হবে।

কিন্তু স্বাতি এমন করে সময় নষ্ট করছে কেন, তা একটু পরেই বুঝতে পারলুম। সে নিজেই বলল: আর একটু দেরি করা ভাল। মার রাগ পড়তে সময় লাগবে।

আমি বললুম: রাগ পড়বে তো?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: মা হবার নাকি এই জ্বালা, সন্তানের উপরে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না।

স্বাতি যে মামীর কথা বলল, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না।

পাতা উল্টে পুনার গাইড বইখানা আমরা দেখে নিলুম। শহরের মানচিত্র ছিল কয়েকখানা। কোনটায় পাহাড় দেখানো আছে। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা শহর। মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। উত্তর দিক থেকে এসেছে মুলা নদী, আর মুথা নদী এসেছে দক্ষিণ থেকে। শহরের মাঝখানে সঙ্গম, তারপরে মিলিত স্রোত পূর্ব মুখে বয়ে গেছে। এই দিকেই বাঁধ গার্ডেন। স্টেশন থেকে দূরে নয়। অন্য দিকে সঙ্গম, সেও কাছে। শনওয়ার ওয়াড়া দুর্গ ও শম্ভাজী পার্কও দূরে নয়। দূরে পার্বতী মন্দির সিংহগড়ের পথে পাহাড়ের উপরে। স্বাতি বলল: পার্বতী মন্দির দেখতে গেলে আর কিছু আমাদের দেখা হবে না।

আমি বললুম: এখনি বেরিয়ে পড়লে—

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল: জুলুম করার একটা সীমা থাকা দরকার।

তাহলে ফেরার পথেই আমরা পার্বতীর মন্দির দেখব। গোয়ার ট্রেন নিশ্চয়ই ভোর বেলায় আসে—

স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে কথাটা আমি শেষ করতে পারলুম

না। মনে পড়ে গেল যে স্বাতি এ পথে ফিরবে না বলেই স্থির করে ফেলেছে।

স্বাতি বলল: রিফ্রেশমেণ্ট রুমের দিকে এস। খাবার তৈরি থাকলে আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া যাক।

সেই ব্যবস্থা করে ওয়েটিং রুমে ফিরতেই মামা বললেন: গোপাল, একখানা টেলিগ্রাম করতে হবে।

আমি তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছি দেখে বললেন: তোমার মামীর সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল। আমরা কবে কোন্ ট্রেনে বম্বে পৌঁছব, সেই খবরটা জো রায়কে দিয়ে দাও।

আমি স্বাতির দিকে তাকালুন, কিন্তু স্বাতি কোন উত্তর দিল না। মামা বললেন: আর ঝামেলা বাড়িয়ো না, যা বলছি শোন।

আবার আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। এবারেও সে নীরব হয়ে রইল। কিন্তু আমার মনে হল যে সে আমার সাহসের পরিমাপ করছে। তাই কোন রকমে বললুম: আমরা কি এই পথেই ফিরব, না—

না মানে?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি খানিকটা ভয় পেলেও বললুম: গোয়া থেকে আমরা সরাসরি ফিরতে পারি, অবশ্য যদি বম্বেতে কোন কাজ না থাকে।

মামা এক মুহূর্ত ভাবলেন, তার পরে বললেন: না, আমরা এই পথেই ফিরব। টাইম টেব্‌ল দেখে টেলিগ্রামটা আজই করে দাও।

গম্ভীর আদেশ। এ আদেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই।

স্বাতি আমাকে টাইম টেব্‌ল বার করে দিল। পাতায় বোধহয় চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল। বলল: কাল বিকেলে আমরা পানাজি পৌঁছব, পরশু থাকব সেখানে। তার পরদিন সকালে রওনা হলে পরের দিন পুনায় পৌঁছব ভোর বেলায়। পার্বতীর

মন্দির দর্শন করে দুপুরে অমারা ডেকান এক্সপ্রেস ধরতে পারব। বম্বে পৌঁছব রাত আটটার আগে। এইবারে তারিখটা হিসেব করে নাও।

মনে মনে আমি হিসেব করেই নিয়েছিলুম। বললুম: টেলিগ্রামটা তাহলে দিয়েই আসি।

মামা বললেন: পয়সা নিয়ে যাও।

স্বাতি বলল ঃ আমার কাছে আছে বাবা, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

বাহিরে বেরিয়েই স্বাতি আমাকে আক্রমণ করল, বলল: এই সাহস! এতটুকুতেই চুপ্‌সে গেলে!

বললুম: ফুলোনো বেলুনে কে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিল।

কে?

তোমার দুটো উপদেশ।

স্বাতি এবারে আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বুঝিয়ে বললুম ঃ একটু আগেই তুমি বলেছিলে যে জুলুম করার একটা সীমা থাকা দরকার। আর তার পরে বলেছিলে, সন্তানের ওপরে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। আমি তো সন্তান নই, ভাগনে। তাও আবার নকল ভাগনে, রক্তের কোন সম্বন্ধই নেই। আমি জোর খাটাব কার ওপরে!

স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল, আর একটি কথাও সে বলল না। জো রায়কে টেলিগ্রাম করে দিয়ে আমরা ফিরে এলুম।

দুপুরের আহারের পর ওয়েটিং রুমের একখানা আরাম চৌকিতে বসে মামা বললেন : গোপাল, আমার কাছে এস।

বলে পাইপে আগুন দেবার আয়োজন করলেন।

আমি তাঁর কাছে এসে বসতেই স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। এই হাসি দেখে আমি আর লজ্জা পাই নে। তাই কোন কথা না বলে মামার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পাইপ ধরাবার পরে মামা বললেন : এই রাজ্যের নাম তো মহারাষ্ট্র– শিবাজীর দেশ, তাই না?

বললুম : হ্যাঁ।

মামা বললেন : এ সম্বন্ধে কিছু বলছ না কেন?

বললুম : মারাঠার ইতিহাস আমার ভাল জানা নেই।

স্বাতি বলে উঠল : গোপালদা দাম বাড়াচ্ছে বাবা।

মামা বললেন : তুমি যা জান তাই বল।

বললুম : মারাঠা বলতে আমি শিবাজীকে বুঝি। তাঁর আগে মারাঠাদের কী শক্তি ছিল তা আমার জানা নেই। বোধহয় কিছুই ছিল না। হঠাৎ একদিন জানা গেল যে দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব হিন্দুস্থানে শুধু একজনকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন। তাঁর নাম হল শিবাজী। যৌবনে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন, তখনই তিনি শিবাজীকে চিনেছিলেন। বুঝেছিলেন যে তাঁকে বাড়তে দিলে দিল্লীর মোগল সিংহাসনে দস্যুর হাত পড়বে। কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে তিনি পারেন নি। ভাইদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে সিংহাসনের লোভে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে চলে এসেছিলেন। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন।

বল কী।

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : ভারতবর্ষের তিনজন বীর সন্তান নিরক্ষর ছিলেন বলে শুনেছি। মহিসুরের হায়দর আলি, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ আর ছত্রপতি শিবাজী। শিবাজীর লেখাপড়া হয় নি এই কারণে যে তিনি তাঁর পিতার অনাদৃত সন্তান ছিলেন। শিবাজীর পিতা শাহজী ছিলেন বিজাপুরের সুলতানের অধীনে এক কর্মচারী। পুনা জেলায় তাঁর বিস্তৃত জায়গীর ছিল। শিবাজীর জন্ম হয় শিবনেরি গিরি দুর্গে, কিন্তু শৈশব অতিবাহিত হয় পুনায় তাঁর মাতা জিজা বাঈএর কাছে। অভিভাবক ছিলেন দাদাজী কাহ্ন দেব। পিতার সঙ্গ শিবাজী পান নি, তিনি থাকতেন তাঁর বিমাতার সঙ্গে।

মাওলি চাষার ছেলেদের সঙ্গেই শিবাজীর শৈশব কাটল। নিজে নিজেই অস্ত্র চালনা শিখলেন, আর স্বপ্ন দেখলেন স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের। দাদাজী কাহ্ন দেবের মৃত্যু হতেই শিবাজী বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে কয়েকটি গিরি দুর্গ অধিকার করলেন। তার পরে পিতার জায়গীরের কিছু অংশ ও কোঙ্কণ প্রদেশের খানিকটা জয় করেই ছোট একটি মারাঠা রাজ্যের পত্তন করলেন। মারাঠা জাতির অভ্যুদয় হল ভারতের ইতিহাসে।

তার পর বিবাদ শুরু হল প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে। শিবাজীকে শায়েস্তা করবার জন্যে বিজাপুরের সুলতান প্রথমে তাঁর পিতা শাহজীকে বন্দী করে রাখলেন। শিবাজী চুপ করে রইলেন কিছু দিন। শাহজী মুক্তি পাবার পরে আবার বিবাদ শুরু হল। এবারে সুলতান তাঁকে দমন করবার জন্যে সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠালেন বহু সৈন্যসামন্ত দিয়ে। শিবাজী তখন প্রতাপগড় দুর্গে ছিলেন। কিন্তু ঠিক হল যে যুদ্ধ শুরু করবার আগে সন্ধির শর্ত নিয়ে দুজনে আলোচনা করবেন। তাই দুর্গের বাহিরে এক জায়গায়

দুজনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। তার পরের ঘটনা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ?

মামা নির্বিকার ভাবে বললেন : না।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : বাঘনখের গল্প ?

বললুম : হ্যাঁ '

স্বাতি বলল : গল্পটা ভুলে গেছি গোপালদা, আবার বল।

সেই ঐতিহাসিক গল্পটি আবার বললুম। দুজন করে পার্শ্বচর নিয়ে শিবাজী ও আফজল খাঁ এক জায়গায় মিলিত হলেন। শিবাজীকে আলিঙ্গন করবার জন্যে আফজল খাঁ এলেন এগিয়ে, বাঁ হাতে গলা জড়িয়ে ডান হাতে ছুরি ঢোকালেন শিবাজীর পার্শ্বদেশে। কিন্তু ছুরি ঢুকল না। তার বদলে নিজের পেটটাই ছিঁড়ে গেল।

কী করে ?

বললুম : শিবাজী এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পাগড়ি ও পোশাকের নিচে লোহার বর্ম, বাঁ হাতের আঙুলে বাঘনখ আর আস্তিনের ভেতর বিছুয়া ছুরি। অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে শিবাজী আফজলের পেট চিরে ছুরি বসিয়ে দিলেন। তাঁর পার্শ্বচরেরা এসে মাথা কাটল আফজল খানের। যুদ্ধে শিবাজীর জয় হল।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে শিবাজীই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর দরবারে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন শিবাজীর সঙ্গে, সে কথা সবাইকেই মানতে হয়।

মামা বললেন : সে গল্পটাও বল।

বললুম : তার আগে শায়েস্তা খানের গল্প। শিবাজীকে দমন করবার জন্যে ঔরঙ্গজেব তাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন পুনায়। কিন্তু শিবাজী

এক রাতে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করলেন। শায়েস্তা খাঁর ছেলে মারা পড়ল, আর খাঁ সাহেবের একটা আঙুল কাটা যেতেই প্রাণ নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন।

এর পরে কুমার মুয়াজ্জম এসেও কিছু করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অম্বররাজ জয়সিংহ এলেন সেনাপতি দিলির খানকে নিয়ে। ছোটখাটো সব রাজাদের নিয়ে তাঁরা পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলেন। শিবাজী ছিলেন এই দুর্গে। কতকটা বাধ্য হয়ে শিবাজী সন্ধি করলেন। বাধ্যতামূলক সন্ধি। বারোটি দুর্গ নিজের হাতে রেখে বাকি দুর্গ বাদশাহকে ছেড়ে দিতে হল।

তারপর শিবাজী জয়সিংহকে সাহায্য করলেন বিজাপুর দখলে। খুশী হয়ে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে খেলাৎ পাঠিয়ে দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ করলেন। শিবাজীর সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু জয়সিংহের কাছে আশ্বাস পেয়ে দিল্লীতে এসেছিলেন।

তারপর ?

দরবারে শিবাজীকে অপমান করলেন ঔরঙ্গজেব, আর শিবাজী উচ্চস্বরে তার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শোনা যায় যে সেই অপমানের বেদনায় শিবাজী দরবারেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, আর পরদিন তাঁর বাসভবনে দেখলেন মোগল সেনা চারি দিকে পাহারা দিচ্ছে। তিনি বন্দী হয়েছেন। শিবাজী দেশে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ধূর্ত ঔরঙ্গজেব এখন হাতের মুঠোর ভেতর পেয়েছেন তাঁর পরম শত্রুকে, তাঁকে ছেড়ে দেবেন কেন!

কয়েকদিন পরেই শোনা গেল শিবাজীর কঠিন অসুখ। সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ও ওমরাহদের কাছে বড় বড় ঝুড়িতে মিষ্টান্ন যাবে। কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা ছিল কড়া, প্রত্যেকটি ঝুড়ি নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হল প্রহরীরা, বিনা পরীক্ষায় যেতে দিল কয়েকটি ঝুড়ি। তার পরেই জানা গেল যে শিবাজী নেই, তাঁর পুত্রও নেই। দুজনেই পালিয়েছেন। ঝুড়িতে

বসেই বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের দিকে যান নি। ঔরঙ্গজেবের চোখে ধুলো দেবার জন্যে দক্ষিণে না গিয়ে গেলেন পূর্বে মথুরা বৃন্দাবন কাশীর পথে উড়িষ্যায়। শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে তাঁর বুদ্ধির জবাব দিলেন বুদ্ধি দিয়ে।

দেশে ফিরে শিবাজী যুদ্ধ ঘোষণা করলেন বাদশাহর বিরুদ্ধে। উপায়ান্তর না দেখে ঔরঙ্গজেব সন্ধি করলেন, মেনে নিলেন শিবাজীর রাজা উপাধি। নানা জায়গায় তিনি মোগল সেনা পরাজিত করেছেন, দক্ষিণ ভারতের অনেক দুর্গ অধিকার করেছেন। ঔরঙ্গজেবের চোখের সামনেই শিবাজী তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছেন, যথেচ্ছ ভাবে চৌথা ও সরদেশমুখী আদায় করেছেন। নিজের রাজ্য থেকে রাজস্ব, অন্যের রাজ্য থেকে রাজস্বের চতুর্থাংশ চৌথা আর মহারাষ্ট্রের নেতা হিসেবে এ রাজ্যের দশমাংশ সরদেশমুখী আদায় করতেন।

বর্গীর অত্যাচারের কথা বাঙলায় সুবিদিত। এরা ছিল শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্য। রাজার কাছে ঘোড়া পেত, বেতনও পেত। প্রয়োজনের সময় নিজের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যারা আসত, তাদের নাম ছিল শীলাদার। সম্মুখ যুদ্ধ শিবাজী এড়িয়ে চলতেন, কোন বড় যুদ্ধ তিনি করেন নি। কিন্তু মারাঠা শক্তিকে সংহত করেছিলেন স্বল্পকালে।

মামা বললেন: বিদেশীরা তাঁকে দস্যু দলের সর্দার বলত কেন বলতে পার?

রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব আমার মনে পড়ল।—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস,
এই জানে সবে।

কিন্তু তাঁর প্রাণের কথা কি কারও জানা ছিল না?

"এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি "

তাঁর স্বপ্ন সফল হবার আগেই শিবাজী মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রেরণার মৃত্যু হয় নি—

যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে গিরিডি থেকে কবি লিখে পাঠালেন—

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥

বৈরাগীর উত্তরী বসনের কথায় আমার শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর কথা মনে পড়ল। কিন্তু তার আগে আমাকে মামার প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। বললুম: সে কথা তো সত্য নয়। দস্যু দলের সর্দার একটা জাতি গড়তে পারে না। শিবাজী যে মারাঠা জাতির জন্ম দিয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসে সেই কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

মামা পাইপ টানছিলেন। বললেন: তা ঠিক। কিন্তু শিবাজীর কথা তুমি বড় সংক্ষেপে শুনিয়েছ। পিতার স্নেহ কেন তিনি পান নি, সে কথা বল নি।

বলি নি, তা ইতিহাসে পাই নি বলে। পড়েছি তাঁর জীবন-চরিতে। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজী ভোঁসলার দুই পত্নী—জিজা বাঈ ও তুকা বাঈ। শিবাজীর জন্মের পূর্বে শাহজী আহমদনগরের সুলতানের কাজ করতেন। তাঁর পক্ষে মোগলদের সঙ্গে লড়াইয়ে যাবার আগে জিজা বাঈকে শিবনেরি দুর্গে রেখে যান। এই দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয় ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা বৈশাখ শুক্রবার।

স্বাতি বলে উঠল: এতক্ষণে গোপালদা মুড়ে এসেছে।

তাহলে আর একটু বলি। জিজা বাঈএর বিবাহ হয় আট বৎসর বয়সে, শিবাজীর জন্ম হয় তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে। তিনি আটাত্তর বছর বেঁচেছিলেন, মারা যান শিবাজীর মৃত্যুর ছ বছর আগে। শিবাজী বেঁচেছিলেন মাত্র তিপ্পান্ন বছর।

স্বাতি বলল: শিবাজীর স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

বললুম: শিবাজীর বয়স যখন দশ বছর, তখন শাহজী তাঁর বিবাহ দেন সই বাঈএর সঙ্গে। কুড়ি বছর পরে তাঁদের পুত্র হয় শম্ভুজী। শিবাজী নাম কেন হয়েছিল, তা বোধহয় বলি নি। শিবনেরি দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামেই শিবাজী নাম।

আহমদনগর ধ্বংস হবার পর শাহজী বিজাপুরে যান। সুলতান তাঁকে ভাল কাজ দিয়েছিলেন, রাজা উপাধিও দিলেন। শাহজী তাঁর স্ত্রী পুত্রকে বিজাপুরে নিয়ে গেলেন, এই সময়ে তাঁর বিবাহও দিলেন। কিন্তু শিবাজীকে বেশি দিন নিজের কাছে রাখতে পারেন নি। শিবাজী বড় মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। এই ভয়েই শাহজী তাঁকে পুনায় পাঠান। ছেলের সঙ্গে মাও পুনায় চলে আসেন।

শিবাজীকে যারা দস্যু সর্দার বলে, এক হিসেবে তারা ঠিকই বলে। শিবাজীর ধমনীতে ছিল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁর অর্থসামর্থ্য ছিল না। এই জন্যেই তিনি দস্যুদলে যোগ দিয়ে তাদের সর্দার হয়েছিলেন। মুসলমানের সম্পত্তি লুঠ করে অর্থ সংগ্রহ

করলেন। তারপর সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি কয়েকটি গিরি দুর্গ দখল করে সৈন্য পরিচালনা শুরু করলেন।

স্বাতি বলল: 'কথা ও কাহিনী'তে শিবাজীর একটা গল্প পড়েছিলাম।

বললুম: সে তাঁর গুরু রামদাস স্বামীর গল্প।

মামা বললেন: আমার তো মনে পড়ছে না?

ইতিহাসে এই গল্প নেই। অ্যাকওয়ার্থ সাহেব মারাঠী গাথার যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিল, তার ভূমিকায় এই গল্পটি আছে। শিবাজীর পতাকার নাম ভাগোবা ঝাণ্ডা, তার রঙ কেন গেরুয়া হল, সেই গল্প।

গোদাবরী তীরে জম্বু ক্ষেত্রে রামায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বালকের জন্ম হয়। আট বৎসর বয়সেই তিনি পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্র তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, দেশে ধর্ম পুনঃসংস্থাপনের জন্য শিবাজীকে সাহায্য কর। তাঁর মাতা তাঁকে সংসারী করবার জন্য বিবাহের আয়োজন করেন, কিন্তু বিবাহের মণ্ডপ থেকে রামায়ণ পালিয়ে যান, সন্ন্যাসী-জীবনে তাঁরই নাম হয় রামদাস স্বামী।

ইনিই শিবাজীর গুরু ছিলেন। দ্বারে দ্বারে তিনি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। বলতেন—

হে ভবেশ হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি হে ভিখারি, মার কাছ হতে কাড়ি,
করেছ আপন অনুচর।

সাতারার দুর্গে শিবাজী গুরুকে দেখে আশ্চর্য হলেন। গুরুর এ কি কাণ্ড!

সব যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,

তাঁরো নাই বাসনার শেষ।

* * *

কহিলা, 'দেখিতে হবে কত খানি দিলে তবে

ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।'

শিবাজী তাঁর গুরুর পায়ে নিজ রাজ্য রাজধানী সঁপে দিলেন। কিন্তু—

গুরু কহে, 'এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,

চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।'

ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সারা দিন শিবাজী গুরুর সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। কত কী দেখলেন, কত কী জানলেন, বুঝলেনও অনেক কিছু। দিনান্তে গুরু বললেন—

'তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,

রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।

পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,

রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।'

তারপরে গেরুয়া গাত্রবাস দিলেন আশীর্বাদ

'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো;'

কহিলেন গুরু রামদাস।

গৈরিক পতাকায় রাজা তাই ভিক্ষুকের প্রতিনিধি।

মামার পাইপের আগুন ফুরিয়েছিল, চোখও আসছিল বুজে। বললেন: আজও আমরা ঐ রকম রাজারই প্রতীক্ষায় আছি।

স্বাতি আজ আমাকে বাহিরে যাবার জন্যে ডাকল না।

২১

ওয়েটিং রুমে আজ একটু অসুবিধার মধ্যে মামা মামী বিশ্রাম করলেন। স্বাতিও চুপ করে রইল। আজ সে আমার সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছে। বেশি কথা না বলাই ভাল। বাজে কথায় মন বিরক্ত হয়। নীরব থাকলে ভাবের জাল বোনে মানুষের মন। কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না। পুনার গাইড বইখানা শেষ করে ফেললুম।

স্বাতি যে জেগে ছিল, আমি তা বুঝতে পারি নি। মামা চোখ মেলতেই স্বাতি বলল : এইবারে একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যাক।

বলে চায়ের অর্ডার দিতে গেল রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। ফিরে এসে বলল : দেরি হবে বলছিল, রাজী করিয়ে এলাম।

তারপরেই বলল : ডিনারের অর্ডারও দিয়ে দিলাম। সাড়ে সাতটায় আমাদের গাড়িতে দেবে। গোপালদার তো কোন খেয়াল নেই, আজ রাতে না খাইয়ে রাখত আমাদের।

মামা সোজা হয়ে বসে বললেন : আমাদের মেয়ে সঙ্গে থাকতে কারও কিছু ভাববার দরকার নেই।

চা খেয়ে আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লুম।

স্টেশনের বাহিরে বেরিয়ে মামা বললেন : একটা ভাল ট্যাক্সি ধর।

মামী বললেন : ভাল ট্যাক্সি কি তোমাদের বেশি তাড়াতাড়ি দেখাবে—তিন দিনের জিনিস তিন ঘণ্টায় !

মামা বললেন : পথে বেগড়াবে না, চড়েও আরাম পাওয়া যাবে, এমন গাড়ির দরকার। ড্রাইভারটি ভাল হলে আরও ভাল, দেখাবার জিনিস যত্ন করে দেখাবে।

স্টেশনে অটোরিক্সা ও ট্যাক্সির অভাব ছিল না। ড্রাইভারের কথা শুনে মামা একটি গাড়ি পছন্দ করলেন। দেখতে সুপুরুষ নয়, কিন্তু কথা মোলায়েম। ট্যাক্সিতে মিটার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছিল, আপনাদের কাছে মীটারই বা কী, রেটই বা কী! যা ফেলে দেবেন, তাই কুড়িয়ে নিয়ে সেলাম করব।

কথাটা উর্দুতে নয়. ভাঙা হিন্দিতেই বলেছিল। আর তা শুনেই মামা বলেছিলেন: ব্যাটা লক্ষ্ণৌএর কায়দা শিখেছে যখন, তখন আমির ওমরাহ দেখেছে বলে মনে হয়।

নাক সিঁটকে মামী বলেছিলেন: তোমাকেও তো দেখল।

এ কথার পিছনে একটা ব্যঙ্গ আছে। এরা যেন আমির ওমরাহদের পুরুষানুক্রমে ঠকিয়ে খাচ্ছে। খাতির দেখিয়েই ঠকাবে। পৃথিবীটা পালটে যাচ্ছে বলে মামীর চোখে এটা অশোভন লাগছে। এই কিছু দিন আগেও বড়রা ছোটদের দিতে অভ্যস্ত ছিল, ছোটদের কাছে নিতে জানত না। নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে সেই পয়সাই সবাইকে দিত। আজকাল বড়রাই নেয়। যে যত বড়, তার দাবী তত বেশি। পায়ে পয়সা না পড়লে দয়ার অঞ্জলি কারও খোলে না। সে অঞ্জলিতে নিজের সম্পত্তির কিছু নেই, আছে সরকারের জিনিস। দরিদ্রকে দেবার জন্যেই যা গচ্ছিত আছে, দরিদ্রের হাতে তা কদাচিৎ পৌঁছয়।

গাড়িতে বসে মামা বললেন: গোপাল, কী ভাবছ?

স্বাতি বলল: বোধহয় পুনা শহর পত্তনের কথা।

মামা হেসে বললেন: গোপাল কি এই সব কথাই সারাক্ষণ ভাবে?

বললুম: এখনও তার সময় পাই নি। এ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তাই ভাবছি।

ড্রাইভার বলল: এখন আমরা বাঁধ গার্ডেনে যাচ্ছি।

তারপরেই প্রশ্ন করল: আপনারা কি খণ্ডক ভাস্‌লা যাবেন?

তার হিন্দী কথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হল না। কিন্তু মামা বললেন: সে আবার কোথায়?

ড্রাইভার উত্তর দিল: এখান থেকে এগারো মাইল দূরে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি। আর্মি নেভি ও এয়ার ফোর্সের কেডেটরা এখানে ট্রেনিং নেয়। দেশ স্বাধীন হবার পরে সাত কোটি টাকা খরচে নাকি এটি তৈরি হয়েছে।

আমিও শুনেছিলুম যে এমন একটি ট্রেনিং সেণ্টার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সে অন্য কারণে নয়। সেনাবাহিনীর তিন বিভাগের ট্রেনিং নাকি এক জায়গায় আর কোথাও হয় না।

মামা বললেন: ট্রেনিং তো আমাদের দেখতে দেবে না, আমরা কী দেখব?

ড্রাইভার উত্তর দিল: লাল গম্বুজওয়ালা বিরাট অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, আর প্রবেশপথের উপরে ব্যালকনিতে দ্রোণাচার্যের এগারো ফুট উঁচু মূর্তি।

মহাভারতের দ্রোণাচার্য?

স্বাতির প্রশ্নের উত্তর দিলেন মামা, বললেন: উনিই তো কুরু পাণ্ডবকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছিলেন।

আমি বললুম: তার ফল ভাল হয় নি।

কেন?

বললুম: তাঁর শিষ্যরা দিগ্বিজয়ে না বেরিয়ে নিজেরাই যুদ্ধ করে দেশটা ধ্বংস করেছিল।

ড্রাইভার বলল: খণ্ডক ভাস্‌লায় আরও একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন। শুধু নদীর বাঁধ আর জলসেচের ব্যবস্থা নয়, বন্দরের পরিকল্পনা নিয়েও এখানে গবেষণা হয়। ছোট ছোট মডেলগুলি দেখবার মতো।

তার পরে বলল: মুথা নদীর ধারে এই শহর। আর কাইক লেক কিছু দূরে। নানারকমের খেলাধুলো হয় সেখানে। পুনার কাছাকাছি

আরও ছুটি লেক আছে। তাদের নাম কাটরাজ ও পশন লেক।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে আমরা উত্তরে চলেছিলুম। এক জায়গায় এসে গাড়ি থামতেই বুঝতে পারলুম যে বাঁধ গার্ডেনে আমরা পৌঁছে গেছি। সবাই নেমে পড়লুম সেখানে।

বাঁধ গার্ডেন একটি রমণীয় স্থান। মুলা ও মুথা নদীর মিলিত স্রোত বইছে এখানে। শহরের এই শেষ প্রান্তে নদীকে বাঁধা হয়েছে। জলপ্রপাতের মতো জল উপচে পড়ছে নিচে। যেমন রূপ, কলস্বরও তেমনি। তারই পাশে উদ্যান। নদীর ধারে জলের কাছে নেমে এসে আমরা শোভা দেখলুম। তারপর বাগান দেখলুম ঘুরে ঘুরে।

স্বাতি বলল : এ সব নিশ্চয়ই সান্ধ্য ভ্রমণের স্থান। তখন এখানে দলে দলে লোক আসবে বেড়াতে।

বললুম : হয় তো তাই। কিন্তু তারা সাধারণ লোক নয়।

কেন ?

সাধারণ লোকের সময় কোথায়, আর পয়সাই বা কোথায় !

এখানে আসতে পয়সার কী দরকার ?

এই দেড় মাইল পথ, পরিশ্রম করে হেঁটে আসতে হলে এক দিনই আসা যায়, রোজ আসবার রুচি থাকে না। ঘরের কাজও তো আছে। ঘুরে বেড়ানোর শখ হল ধনীর জন্যে।

স্বাতি বলল : দরিদ্র কি তা হলে আনন্দ করবে না ?

করবে না কেন ! কিন্তু সে অন্য রকম আনন্দ। ঘরকন্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করবে, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনো দেখবে, আর কোন রকমে ছুটো পয়সা বাঁচিয়ে ছেলের জন্যে একটা লাট্টু কিংবা মেয়ের জন্যে একটা স্কিপিং রোপ কিনে দিয়ে অপার্থিব আনন্দ পাবে। স্ত্রীকে নিয়ে এই বাঁধ গার্ডেনে বেড়াতে আসা তার কাছে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

মামা বললেন : গোপালকে পাকা সংসারী মনে হচ্ছে।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না।

ফেরার জন্যে গাড়িতে উঠে বসতেই মামা বললেন: এধারে আর কিছু দেখবার ছিল না?

বললুম: নদীর ওপারে বাঁধ পাহাড়ের মাথায় পর্ণকুটীর নামে একটি বাড়ি আছে। লেডি বিঠল দাসের বাড়ি। পুনায় এলে মহাত্মাজী এই বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতেই তিনি একুশ দিন অনশন করেছিলেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তাকে আরও বিস্মিত করবার জন্যে বললুম: নদীর উপরে যে পুল দেখলুম, তার নাম ফিট্জেরাল্ড ব্রিজ। ওপারে গিয়ে বাঁ দিকের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আগা খান প্যালেস। সেখানে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইএর সমাধি আছে।

মামাও এবারে আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে কি কথা!

বললুম: উনিশ শো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীকে ঐ আগা খান প্যালেসে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই ও আরও অনেকে। কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই এই সময়েই মারা যান। সাদা মার্বল পাথরের সমাধি আছে এই বাড়ির কম্পাউণ্ডে। সম্প্রতি এই সমাধি রাজঘাটে মহাত্মাজীর সমাধির মতো করে গড়া হয়েছে।

আমাদের ট্যাক্সি তখন ফেরার পথ ধরেছে। দু ধারের বড় গাছ-পালায় ছায়াচ্ছন্ন পথ। স্বাতি বলল: পুনার বটানিকাল গার্ডেন নাকি—

আমি বললুম: বটানিকাল গার্ডেন এ দিকে নয়, সে একেবারে উল্টো দিকে। পুনার উত্তরে কাকি স্টেশন, তারও খানিকটা উত্তরে। ওষুধের গাছগাছালির জন্যে এই বাগান হয়েছিল, চারা ও বীজ নিয়ে গবেষণা হত। এখন এগ্রিকালচারাল কলেজ হবার পর থেকে এখানে শুধু মালিদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। তবে একটা মিউজিয়াম আর লাইব্রেরি আছে ঐ বাগানের মধ্যে।

তার পরে বললুম : বাগান এখানে অনেক আছে। রেস কোর্সের উল্টো দিকে খুব পুরনো বাগান এমপ্রেস গার্ডেন। পার্বতী মন্দিরে যাবার পথে পেশোয়া পার্ক শিশুদের জন্যে। বাগানে একটি চিড়িয়াখানা আছে, ফুলরানী নামের খেলনা রেল গাড়ি আছে, হাতি আছে ছেলে-মেয়েদের বেড়াবার জন্যে। রাস্তার উল্টোদিকে ছিল গণপতির মন্দির, তার চারিধারেও নতুন বাগান হয়েছে, তার নাম সরস বাগ। শম্ভাজী পার্ক হল সব চেয়ে ভাল।

স্বাতি বলল : তবে সেইখানেই আমরা যাব।

পুনার দুটি নার্সারীর কথাও আমার মনে পড়ল—পোচা ও কুপার। এই অঞ্চলে তাদেরও ভাল বাগান আছে শুনেছি। কিন্তু মামা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

ড্রাইভার বাঙলা বোঝে কিনা জানি না, কিন্তু উত্তর সেই দিল, বলল : শনওয়ার ওয়াডা।

কী ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

ভাল করে শুনে আমি বললুম শনিবার ওয়াডা বলছে। এটি একটি দুর্গ, স্টেশনের কাছেই। সপ্তাহের বারের নামে আরও অনেক নাম এখানে আছে—সোমবার পেঠ, মঙ্গলবার পেঠ, বুধবার পেঠ, গুরুবার পেঠ, শুক্রবার পেঠ, শনিবার পেঠ ও রবিবার পেঠ।

স্বাতি বলল : ভারি অদ্ভুত নাম তো !

বললুম : এ সব জায়গার অন্য নাম ছিল, পেশোয়ারা এই সব নাম রেখেছিলেন। এখন এই নামেই চলছে।

দেখতে দেখতেই আমাদের ট্যাক্সি এসে শনবার ওয়াডার সামনে দাঁড়াল। ভারি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মজবুত দুর্গ। ভারি দরজা দিয়ে ভিতরের পার্কে ঢুকতে হয়। দরজার উপরে লোহার কাঁটা। সেকালে দুর্গ আক্রমণ করলে হাতিকে দিয়ে দরজা খোলানো হত। তাই এই কাঁটার ব্যবস্থা।

গেটের উপরে একটি ব্যালকনি আছে, সিপাহীদের ঘর, আর একটি নক্করখানা। ভিতরে যখন পেশোয়াদের প্রাসাদ ছিল, তখন এই নক্করখানায় দামামা বাজত, কিংবা নহবত। কিন্তু আমরা ভিতরে ঢুকে কোন প্রাসাদ দেখতে পেলুম না, দেখলুম একটি উদ্যান। আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন: আর কিছু নেই!

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: একটা ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। আছে না গোপালদা?

বললুম: আছে বৈকি।

মামা বললেন: তবে বলছ না কেন!

স্বাতি খুশী হল এই কথা শুনে। সকৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে। আর আমি বললুম: আড়াই শো বছরের পুরনো এই দুর্গ। দুবার আগুন না লাগলে এই দুর্গ এমন ভাবে ধ্বসে পড়ত না। এই দুর্গ তৈরির যেমন একটা ইতিহাস আছে, তেমনি ভেঙে পড়বারও একটা ইতিহাস আছে মনে করা হয়।

তার পরে সেই ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে বললুম। শিবাজীর নাতি রাজা সাহু তখন সাতারার দুর্গে অবস্থান করছেন, আর দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও আছেন পুনায়। রাজা তাঁর মন্ত্রী পেশোয়াকে বললেন পুনায় একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য। বাজীরাও এই জায়গাটি পছন্দ করলেন একটি অলৌকিক ঘটনা দেখে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন এই পথ দিয়ে, হঠাৎ দেখতে পেলেন যে একটা খরগোশ কুকুরকে তাড়া করেছে। খরগোশের বিক্রম দেখে তাঁর মনে হল যে এইখানেই প্রাসাদ তৈরি করা উচিত। আর তার পরেই বাজীরাও এই দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। চোদ্দ বছর ধরে এই দুর্গটি তৈরি হয়।

বললুম: এই দুর্গের প্রধান গেটটি দেখুন, এটির মুখ উত্তর দিকে। এর মানে হল, মারাঠাদের দিল্লী জয়ের সংকল্প। এই দিল্লী গেট ছাড়া দুর্গে আরও চারটি গেট আছে—তার একটার নাম মস্তানি গেট।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: মস্তান থেকে মস্তানি নয়, মস্তানি একটি মুসলমান মেয়ের নাম। এখান থেকে খানিকটা দূরে কোথ্‌রুড গ্রামে তার বাস ছিল।

তার নামে একটা গেট হয়েছে?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: পেশোয়া বাজীরাও এই মেয়েটিকে ভালবাসতেন।

স্বাতি আর কোন প্রশ্ন করল না, কিন্তু আমি বললুম: এই মস্তানির গ্রামের বাড়িটি আজকাল রাজা কেলকার মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে ঠিক যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই আছে। সেই সব জিনিসপত্র দিয়েই তৈরি হয়েছে।

মামা বললেন: পুনায় মিউজিয়ামও আছে নাকি?

বললুম: হায়দ্রাবাদে যেমন সালারজঙ্গ, পুনায় তেমনি রাজা কেলকার। হায়দ্রাবাদের মত বিরাট কিছু না হলেও একজন মানুষের সংগ্রহ এই মিউজিয়াম শুক্রবার পেঠে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি যা সংগ্রহ করেছেন, রাজ্য সরকার এখন তা রক্ষা করছে।

স্বাতি প্রশ্ন করল: দেখবার কী আছে?

বললুম: পেশোয়াদের সময়ের প্রায় কুড়ি হাজার পাণ্ডুলিপি, পাথরের মূর্তি, দু হাজার বছরের মুদ্রা ও তাম্রফলক ও পুরাকালের প্রায় দেড় শো রকমের বাতি। মানে একজন গুণী লোকের সংগ্রহ।

মামী বললেন: এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা জাদুঘর দেখবে নাকি!

মামা বেরোবার জন্যে পা বাড়াতেই স্বাতি বলল: এখানে কী দেখবার ছিল, তা বললে না?

বললুম: এই দুর্গের ভিতরে কয়েকতলা উঁচু একটি সুন্দর প্রাসাদ ছিল। সরকারী দপ্তর ও বাসগৃহ ছিল আলাদা। ফোয়ারা, স্নানের ও সাঁতার কাটার জায়গা, জল আসত পাঁচ মাইল দূরের কাটরাজ লেক থেকে।

মামা বললেন : সে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কী করে ?

বললুম : অনেকে মনে করে যে ইংরেজ এই কাজ করেছে। দুর্গ দখল করবার পরে দুবার আগুন লেগেছিল। তারাই নাকি আগুন লাগিয়েছিল।

কেন ?

তারা মনে করেছিল যে মারাঠাদের সমস্ত কীর্তি নষ্ট করে না দিলে আবার তারা দলবদ্ধ হবে। এই দুর্গের দেওয়ালও ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু জনসাধারণ প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিল।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আরও অনেক কথা আমার মনে পড়ল। এক দিন পেশোয়ারা রাজা হয়ে এই দুর্গের ভিতরে দরবারে বসলেন, বিদেশ থেকে রাজদূতেরা এল তাঁদের দরবারে। রঘুনাথ রাও ষড়যন্ত্র করে হত্যা করল নারায়ণ রাও পেশোয়াকে। উপরের ঐ ব্যালকনি থেকে মাধো রাও নারায়ণ পড়ে গিয়েছিলেন, দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন একুশ বছর। অপুত্রক ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর পত্নী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। পেশোয়ার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নানা ফাড়নবিশ পার্বতীর মন্দিরে মানত করেছিলেন একটি পুত্রসন্তানের জন্য। পুত্র জন্মেছিল নারায়ণ রাওএর। নানা ফাড়নবিশ এই শিশু সোয়াই মাধব রাওকে পেশোয়া করেছিলেন।

বাহিরে আমাদের ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। আমরা উঠে বসলুম। স্বাতি তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল : সময় আছে তো গোপালদা ?

বললুম : অনেক সময় আছে।

কিন্তু স্বাতি বলল : না, বেশি দেরি করা ভাল হবে না। শম্ভাজী পার্ক দেখেই আমরা স্টেশনে ফিরব।

মামা বললেন : সেই ভাল।

মুলা ও মুথা নদী মাদ্রাজের কয়ুম নদীর মতো শহরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে। আর অনেকগুলি পুল এই নদীর উপরে। মুলা নদী উত্তরে সমস্ত কার্কি শহর বেষ্টন করে পুনা স্টেশনের কাছে উত্তরবাহী মুথা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই সঙ্গমের কাছে সঙ্গম ব্রিজ। নবপুল বা শিবাজী পুল, লয়েডস্ ব্রিজ, শম্ভাজী পুল হল মুথা নদীর উপরে। আর মুলা নদীর উপরে হোলকার ব্রিজ, দাপুরি ব্রিজ।

শহরের মানচিত্র দেখে এই শহরের সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছিল। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সেই দিকে ফিট্‌জেরাল্ড ব্রিজ পেরিয়ে আহমদনগরের দিকে যেতে হয়। এরোড্রোমের পথ এই দিকেই। ডেকান কলেজ, সেণ্ট্রাল হসপিটাল, সেণ্ট্রাল জেল এই দিকে। আর পর্ণকুটীর ও আগা খান প্যালেস।

কার্কি স্টেশন এলাকায় সেনানিবাস। এক দিকে মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, অ্যামুনিসন ফ্যাক্টরি, হাই এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরি, কার্কি বাজার। অন্য দিকে এগ্রিকালচার কলেজ, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, গভর্ণমেণ্ট হাউস ও ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি।

কেমিক্যাল কথাটি মনে এলেই আমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁকে ভারতের কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রির পিতা বলা যায়। কলকাতায় তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর বম্বেতে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরই দেখাদেখি নানা বিদেশী সংস্থা এদেশে এসেছে। আজও মারাঠারা পি. সি. রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

একটা পুলের উপর দিয়ে আমরা মুথা নদীর উপরে এলুম। নালার মত নদী, তার উপরে ছোট পুল। শহরের এই অংশের নাম শিবাজী নগর। শিবাজী নগর নামে একটি রেলওয়ে স্টেশনও আছে। অবজারভেটরি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সিভিল কোর্ট—সবই কাছাকাছি। কিন্তু আমরা সেদিকে না গিয়ে দক্ষিণের দিকে এগোলুম।

অনেকগুলো কলেজ এই দিকে, আর ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া। সোজা পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে গেলে প্রথমে মস্তানির কোথ্রুড গ্রাম। তার পরে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি। পুনা শহরের অন্য ধারে পার্বতী মন্দিরের পাশ দিয়ে সিংহগড়ের পথেও সেখানে যাওয়া যায়। খাস পুনা শহর এই দিকেই। সিটি পোস্ট অফিস ফুলে মার্কেট ছাড়িয়ে পার্বতী মন্দিরের পূর্ব ধার দিয়ে দক্ষিণ মুখে গেছে সাতারা রোড। এম্প্রেস গার্ডেনের দক্ষিণ দিয়ে পূর্ব মুখে গেছে শোলাপুর রোড।

পিছনে হঠাৎ মামার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। তিনি বললেন: গোপাল এমন মুখ বুজে আছ কেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: শহরটা দেখছি।

মামা বললেন: যা দেখছ বল না।

বললুম: এই রাস্তার নাম দেখছি জঙ্গলি মহারাজ রোড।

এ আবার কী রকমের নাম?

বললুম: এই দিকের এক জঙ্গলে একজন সাধু কুঠিয়া তৈরি করে বাস করতেন। লোকে তাঁকে জঙ্গলি মহারাজ বলত। অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর সমাধি এখনও আছে। ভক্তরা প্রতি বৃহস্পতিবারে আসে এই সমাধিক্ষেত্রে।

সাঁই বাবার কথা আমার মনে পড়ল। বললুম: পুনায় আর একজন মহাপুরুষের মন্দির আছে।

এবারে মামী জিজ্ঞাসা করলেন: কার বল তো?

বললুম : সাঁই বাবার। সে অন্য দিকে—খর্গেট নামে একটি পাড়ায়। পার্বতী মন্দিরের কিছু পশ্চিমে।

মামা বললেন : সাঁই বাবার নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি নে।

বললুম : মহারাষ্ট্রে তাঁর অনেক মন্দির আছে, কিন্তু তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল আমেদাবাদের কাছে সিরিডিতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে তিনি হিন্দু ছিলেন না মুসলমান, কোথাকার মানুষ ছিলেন তিনি, এর বিচার কোনদিনই সম্ভব হয় নি। সিরিডির একটা ভাঙা মসজিদের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সামনে সারাক্ষণ একটা ধুনি জ্বলত, আর একটা প্রদীপ। প্রথম জীবনে ফকিরের বেশ ছিল তাঁর, কিন্তু পরবর্তী জীবনে রাজবেশও পরতেন। ভক্তদের কাছে সব রকমের উপহার নিতেন, আর বিলিয়ে দিতেন দরিদ্রের মধ্যে। নিজে ভিক্ষান্নেই জীবন ধারণ করতেন।

এই সময়ে আমাদের ট্যাক্সি এসে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। মামা বললেন : নামতে হবে নাকি?

ড্রাইভার বলল : শম্ভাজী পার্ক।

আমরা নেমে পড়লুম।

মামা বললেন : তোমার সাঁই বাবার কথা আর শোনা হল না।

বললুম : সব সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত থাকে, সে সব ভক্তরাই প্রচার করেন। কিন্তু আসল কথা হল, তিনি কী দিয়ে গেছেন সেই কথা।

পার্কের ভিতরে ঢুকবার সময়ে মামা বললেন : সংক্ষেপে সেই কথাটি বলে ফেল, তাহলে নিশ্চিন্ত হই আমরা।

বললুম : মানুষে মানুষে যে কোন প্রভেদ নেই, বোধহয় সেই কথাটিই নিজের জীবন দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র সুস্থ ও রুগ্ন মানুষ সমান আদর পেয়েছে তাঁর কাছে।

কিন্তু স্বাতি তখন অন্য কথা ভাবছিল, বলল: শম্ভাজী কে ছিল গোপালদা?

বললুম: শিবাজীর পুত্র। ইতিহাসে তিনি দুশ্চরিত্র বলে চিহ্নিত। ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে পৈশাচিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে। আর তাঁর সাত বছর বয়সের ছেলে সাহু প্রতিপালিত হতে থাকে মোগল শিবিরে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তিনি মুক্তি পান।

শম্ভাজী পার্কের ভিতরটা আমরা এক নজরেই দেখতে পাচ্ছি। চোখের সামনে বালগন্ধর্ব থিয়েটার। প্রথমেই এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পরে ঝাঁসির রাণীর স্ট্যাচু, সরস্বতী ফাউন্টেন। ডান দিকে এগিয়ে গেলে পুনার একটি রিলিফ ম্যাপ ও অ্যাকোয়েরিয়াম দেখতে পাওয়া যাবে শুনে সেই দিকেই আমরা এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল: চলতে চলতেই তোমার ইতিহাসের গল্পটা শেষ কর।

বললুম: শম্ভাজীর মৃত্যুর পরে রাজারাম রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। তারপরে সাহু এসে রাজার গদিতে বসলেন, সাতারায় হল তাঁর রাজধানী। আর পুনায় তাঁর প্রতিনিধি হলেন বালাজী বিশ্বনাথ। এই বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন একজন কোঙ্কণ দেশীয় ব্রাহ্মণ। শিবাজীর মৃত্যুর পরে মারাঠা রাজ্যের শৃঙ্খলা তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর নিজের পেশোয়া পদটি রাজ্যের প্রধান পদে পরিণত করেন। তাঁর পরে তাঁরই বংশধর যে পেশোয়া হবেন, সে ব্যবস্থাও তিনি করে যান। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র বাজীরাও হলেন পেশোয়া। সাহু এক দানপত্রে প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই ছেড়ে দিলেন পেশোয়ার হাতে। তার পরে দেখা গেল যে শিবাজীর বংশধরেরা শুধু নামেই রাজা, কাজে রাজা হলেন পেশোয়ারা।

কথায় কথায় আমরা বাগানের আর এক প্রান্তে পৌঁছে

গিয়েছিলুম। রিলিফ ম্যাপ দেখলুম, দেখলুম অ্যাকোয়েরিয়াম। বোম্বাইএর অ্যাকোয়েরিয়াম দেখবার পরে এ জিনিস আর চোখে লাগে না। ত্রিবেন্দ্রামের অ্যাকোয়েরিয়ামও এর চেয়ে অনেক ভাল।

এর পরে আমরা বাগানের পিছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মুথা নদী বইছে এই দিক দিয়ে। নদীতে জল কম, আগাছায় পরিপূর্ণ চারি ধার। কিন্তু তারের বেড়া ডিঙিয়ে নদীর ধারে যাবার উপায় নেই। ওপারে একটা পুরনো মন্দির দেখা যাচ্ছে। এ কোন্ দেবতার মন্দির তা জেনে নেবার মতো কোন লোক আমি কাছে দেখলুম না।

মামা বললেন : এই বারে তোমার ইতিহাসের কথা শেষ কর।

বললুম : মন্ত্রীর পেশোয়া নাম শিবাজী রেখেছিলেন। ক্রমে তাঁরা মন্ত্রী থেকে অভিভাবক এবং শেষে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। মারাঠার শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন বাজীরাও। উড়িষ্যা থেকে সৌরাষ্ট্র পাঞ্জাব ও হিমাচলে তাঁদের রাজ্য বিস্তার করেছেন। অশোকের পরে এত বড় হিন্দু রাজ্য আর স্থাপিত হয় নি।

তারপরে ভাঙন শুরু হল। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ দুরানীর কাছে হেরে গিয়ে উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেল। মারাঠার চরম উন্নতির সময় সুশাসনের জন্য বাজীরাও কয়েকজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। গোয়ালিয়রে রণোজি সিন্ধিয়া, মালবে মলহর রাও হোলকার, বেরারে ভোঁস্‌লা ও গুজরাতে গায়কোয়াড। পুনার পেশোয়ার ক্ষমতা কমে আসতেই দেখা গেল যে সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র রাজ্য, হোলকার ইন্দোর রাজ্য, ভোঁস্‌লা নাগপুর রাজ্য এবং গায়কোয়াড় বরোদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইংরেজরা ভারতে এসে এঁদের সকলকে কখনও মিলিত হতে দেয় নি। বিচ্ছিন্ন মারাঠা শক্তি আর কোনদিন মাথা তুলতে পারে নি।

স্বাতি আমাকে বাধা দিয়ে বলল: এ বড় নীরস ইতিহাস গোপালদা, স্কুলের ইতিহাসে এসব পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।

তখন আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি, ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল: এবারে কি শিবাজী পুতলা যাব?

ঘড়ির দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: না না, আর কোথাও নয়, এবারে সোজা স্টেশনে চল।

ড্রাইভার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে স্টেশনের দিকে চলতে শুরু করতেই মামা প্রশ্ন করলেন: শিবাজী পুতলা আবার কী?

বললুম: স্ট্যাচুকে এদেশে পুতুল বা পুতলা বলে। এই শিবাজী নগরে শিবাজী প্রিপেয়ারেটরি মিলিটারী স্কুলের কম্পাউণ্ডে শিবাজী মহারাজের একটি চমৎকার ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু আছে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও চমৎকার জায়গা হল লালমহল বা জিজামাতা গার্ডেন। শিবাজী পুল দিয়ে ওপারে গেলেই শনবার ওয়াডার কাছেই এ বাগান। শিবাজী ও তাঁর মা জিজা বাঈএর বাসের জন্যে দাদাজী কাহ্নদেব এই লালমহল অম্বরখানা তৈরি করেছিলেন। মারাঠা জাতির ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল সেইখানে, আর মারাঠা ইতিহাসের শুরুও সেইখান থেকে। কিন্তু এখন আর দেখবার কিছু সেখানে নেই। ছেলেমেয়েদের বেড়াবার বাগান হয়েছে সেইখানে। তবে যে গণপতির মন্দিরে জিজা বাঈ রোজ পূজা করতেন, সেই মন্দিরটি এখনও আছে।

মামী প্রশ্ন করলেন: আর কোন মন্দির এখানে নেই?

বললুম: পাহাড়ের উপরে এক পার্বতী মন্দির ছাড়া আর সব মন্দিরই ছোট ছোট। অম্রুতেশ্বর ও ওঙ্কারেশ্বর মন্দির, চতুরশৃঙ্গী মন্দির, পাতালেশ্বর বা শিব গুহা। তবে এখানে একটি মন্দির আছে, যা কোচিন ছাড়া আর কোথাও দেখি নি।

মামা বললেন: সে আবার কোন্ মন্দির?

বললুম : লাল-দেবল ইহুদীদের সিনাগগ।

স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম : কলকাতায় প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরি হয়েছে, পুনাতেও একটি প্ল্যানেটেরিয়াম আছে। কৃত্রিম আকাশে সৌরজগৎ দেখানো হয়। শুধু শনিবার দেখানো হয় এখানে।

এবারে আমরা সঙ্গম ব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের দিকে চললুম। আর স্বাতি আমাকে তার পুরনো অভিযোগের কথাই শোনাল। বলল : গোপালদার গল্প আজ একেবারেই জমল না। একটাও নতুন কথা বলতে পারল না গোপালদা।

আমি আশ্চর্য হলুম তার মন্তব্য শুনে। দুপুর বেলায় মনোযোগ দিয়ে গাইড বইখানা পড়ে ভেবেছিলুম যে পুনার সম্বন্ধে নতুন কথা বলে সবাইকে আশ্চর্য করে দেব। কিন্তু স্বাতির মন এতে ভরল না। সে যে মারাঠা ইতিহাসের কথা বলছে, তা বুঝতে পেরেছিলুম। কোনও নতুন কথা আমারও মনে পড়ছে না। মহারাষ্ট্রের চাণক্য নানা ফাড়নবিশের গল্প সবার জানা। টিপু সুলতান নাটকে আমরা নানা ফাড়নবিশের পরিচয় পেয়েছি। পেশোয়া বংশে যখন সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, তখন এই বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ অভিভাবকত্ব নিয়েছিলেন অজাত পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের। চারি দিকের লুব্ধ শক্তি টিপু নিজাম ও ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি কঠিন হাতে হাল ধরেছিলেন। কিন্তু সেও এমন কোন কৌতূহলের কথা নয়।

হঠাৎ আমার এক মারাঠী বন্ধুর গল্প মনে পড়ে গেল। তাদের বীরত্বের ব্যাপারে সে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছিল। একটি মারাঠী কবিতায় নাকি সেই কাহিনী আছে। আমি স্বাতিকে বললুম : নতুন কথা শোনাতে পারি, কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না।

স্বাতি বলল : না হলেও ক্ষতি নেই।

বললুম : শিবাজী যে মস্ত বীর ছিলেন, সে বিষয়ে আজ

কোন 'মতভেদ নেই। কিন্তু তাঁর অধীনে যে আরও কত বীর ছিল, তার হিসেব আজ কারও মনে নেই।

তুমি একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যা বলবে তো?

না। বলব মোরারজী নামে এক অশ্বারোহী বীরের কথা। যুদ্ধ করতে করতে তার মাথা কাটা গিয়েছিল, কিন্তু সেই মাথা কাটা অবস্থাতেই সে তিন শো সৈন্যের মাথা কেটেছিল।

স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল। মামাও হাসলেন।

আমি বললুম: এ গল্প শুনে আমিও হেসেছিলুম। যে বন্ধুর কাছে এই গল্প শুনেছিলুম, সে বলেছিল যে কবিতাটি পড়ে সেও হেসেছিল। কিন্তু তার পরে স্বচক্ষে এই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে এই গল্প বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে

স্বচক্ষে দেখেছে!

বললুম: গত লড়াইয়ের সময় সে যুদ্ধে গিয়েছিল। সেখানে এক স্কন্ধকাটা লোককে সে মোটরবাইক চালাতে দেখেছে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: বলছ কী?

বললুম: একটা জীপে করে তারা আসছিল। উল্টোদিক থেকে মোটরবাইক চালিয়ে আসছিল একটা স্কন্ধকাটা লোক। দু হাতে হাতল ধরে সোজা হয়ে বসে ছিল লোকটা। ভয়ে তারা নালাতেই জীপ নামিয়ে দিয়েছিল।

তারপর?

লোকটা বেশি দূর এগোতে পারে নি। খানিকটা এগিয়ে পথের উপরেই পড়ে গিয়েছিল। পরে ওরা দেখতে পেয়েছিল যে ঐ পথে একটা ধারালো তার বাঁধা ছিল। লোকটা দেখতে পায় নি। মুণ্ডুটা কেটে পড়ে গেল। কিন্তু সে পড়ে যায় নি।

স্বাতি বলল: একেবারে গাঁজা।

কিন্তু মোরারজীর গল্পটা সত্য বলে এখনও অনেকে বিশ্বাস করে। তিন শো না হলেও তিনটে মাথা নিশ্চয়ই কেটেছিল।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : কোন বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

স্বাতি আমাকে সতর্ক করে বলল : আর কাউকে বোলো না গোপালদা, লোকে হাসবে।

আমরা তখন স্টেশনে পৌঁছে গেছি।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই স্বাতি বলল : তুমি এর পয়সা মিটিয়ে দাও বাবা, আমি চট করে রিজার্ভেসনটা দেখে আসছি।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর খানিকক্ষণ পরেই প্রফুল্ল মুখে এল ফিরে, বলল : খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।

ড্রাইভারের পয়সা মিটিয়ে মামা অপেক্ষা করছিলেন, বললেন : কী রকম ব্যবস্থা?

স্বাতি বলল : আমরা একখানা কুপে পেয়েছি, আর পাশের গাড়িতে একখানা আপার বার্থ। গোপালদারই বরাত।

মামা বললেন : তবে আর কী! যাত্রা আমাদের ভালই হবে।

দিনের আলো আর নেই। অন্ধকার নামছে অল্প অল্প করে। স্টেশনের দিকে এগিয়ে স্বাতি বলল : তুমি একটু নজর রাখ গোপালদা, ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে টেনে আনলেই ওপরে কুলি পাঠিয়ে দিও। আগেভাগেই আমরা গাড়িতে উঠে বসে থাকব।

মামা বললেন : ও কি তাহলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে!

তা ছাড়া উপায় কী!

বলে স্বাতি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। আর মামা মামী তাকে অনুসরণ করলেন।

সন্ধ্যে সাতটার পরে আমাদের ট্রেনটাকে ইয়ার্ড থেকে প্ল্যাটফর্মে টেনে আনা হল। একেবারে শেষের প্ল্যাটফর্ম এটি। কুলিদের উপরের ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে ট্রেনের কাছে চলে গেলুম। নিজেদের গাড়িও খুঁজে নিলুম সবাই আসবার আগে।

ভাল করে গুছিয়ে বসবার আগেই আমাদের খাবার এসে গেল। বেয়ারারা এই ট্রেনের সঙ্গে যাবে না। বাসনপত্র নামিয়ে নেবে খাবার পরে। মামা বেশ অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন: এই কি খাবার সময়।

মামী বললেন: তবে কি খাবে না এখন?

না খেয়ে আর উপায় কী!

বলে মামাই সকলের আগে তৈরি হয়ে বসলেন।

ট্রেন ছাড়বার আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে গেল। বেয়ারারা খাবারের দাম ও বাসনপত্র নিয়ে নেমে গেল। পাইপ ধরিয়ে মামা বললেন: একটা কথা ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হয়েছে গোপাল, যুদ্ধের এমন প্রেরণা মারাঠারা কোথা থেকে পেত।

এর উত্তর আমি আমার মারাঠী বন্ধুর কাছেই পেয়েছিলুম। কিন্তু সে কথা বলবার আগে স্বাতি বলল: একটুখানি দাঁড়াও গোপালদা, পাশের গাড়িতে তোমার বার্থখানা ঠিক আছে কিনা দেখে আসি।

বলে স্বাতি বেরিয়ে গিয়েই পরক্ষণে ফিরে এল। বলল: ঠিক আছে। এইবারে বল তোমার গল্প।

বললুম: মারাঠারা প্রতিশোধ নিচ্ছিল।

কিসের প্রতিশোধ?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: শম্ভাজীর মৃত্যুর। দিল্লীতে ঔরঙ্গজেব নৃশংস অত্যাচার করে শম্ভাজী ও তাঁর অনুচরদের হত্যা করেছিলেন। প্রথমে সবার জিভ উপড়ে নেওয়া হয় শুনেছি, পরে কী রকমের পাশবিক অত্যাচার করে সবাইকে হত্যা করা হয় তা জানি নে। মারাঠা বীরেরা প্রতি দিন এই অন্যায়কে স্মরণ করেছে। শম্ভাজীর পুত্র সাহু যখন দিল্লীর দরবারে প্রতিপালিত হচ্ছেন, তখন মারাঠা শক্তিকে জাগিয়ে রেখেছেন তাঁর ভ্রাতা। আর তাঁকে বন্দী করবার জন্য মুঘল সৈন্য সারাক্ষণ সজাগ ছিল। বিশ্বস্ত সর্দারেরা সন্ন্যাসীর বেশে যখন রাজারামকে জিঞ্জির দুর্গে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুঘলরা সন্দেহ করে। এক দল রাজারামকে সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, আর এক দল ধরা দিলেন তাদের হাতে। কিন্তু প্রবল অত্যাচারেও কেউ স্বীকার করলেন না যে তাঁরা সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছু। যাঁরা এগিয়ে গেছেন, তাঁদের কথাও কিছু জানালেন না।

মামা বললেন: তার পরে?

বললুম: ঔরঙ্গজেব সারা জীবন এই মারাঠাদের নিয়ে বিব্রত ছিলেন। প্রচুর উৎকোচ দিয়ে এক একটি দুর্গ অধিকার করেছেন, আবার সেখান থেকে সরে যেতেই সে দুর্গ হয়েছে হাতছাড়া। বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে দেখেছেন যে এদের একটিও সৈন্য কোথাও নেই, শান্তশিষ্ট প্রজারা নিশ্চিন্ত মনে জমিজমা চাষবাস করছে। আবার সমগ্র দেশ অধিকার করে রাজধানীতে ফিরে গিয়েই শুনলেন যে হাতছাড়া হয়ে গেছে তাঁর বিজিত সমস্ত ভূখণ্ড। চাষীরাই আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্য হয়েছে। বেশবাসের বালাই নেই তাদের, হাতে অস্ত্র থাকলেই সৈন্য, আর সৈন্য হলেই তাড়াও মুঘল। মুঘল সেনা তাড়ানোই যেন তাদের একমাত্র কাজ।

স্বাতি বলল: এ দেখছি, বাঙলার অগ্নিযুগের ব্যাপার!

বললুম : এরই নাম গরিলা যুদ্ধ। বিরক্ত হয়ে ঔরঙ্গজেব এদের নাম দিয়েছিলেন পার্বত্য মূষিক। এই মূষিকের অত্যাচারে শেষ জীবন তাঁকে ঔরঙ্গাবাদেই কাটাতে হয়েছে। জীবনে তাঁর শান্তি ছিল না এতটুকু।

স্বাতি বলল : ঔরঙ্গাবাদের কাছেই তো আমরা ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখেছি।

দেখেছি বৈকি। কিন্তু তা সমাধি মন্দির নয়, সাধারণ মানুষের মতো একটা কবর। উপরে কোন ছাদ বা গম্বুজ নেই। শুধু একখানা শ্বেত পাথরের বেদী রৌদ্রে দগ্ধ হয়ে বৃষ্টিতে শীতল হচ্ছে। কিন্তু বাদশাহর জীবনে শুধু রৌদ্রই ছিল, মৃত্যুর পরে তাঁর কবরে এখন শিশির পড়ছে। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন : তোমার বন্ধু আর কোন অলৌকিক গল্প বলেন নি ?

বললুম : বলেছে। কিন্তু তা অলৌকিক নয়, একেবারে ঘরোয়া গল্প। প্রথম বাজীরাওএর কথা। মহারাষ্ট্রে তাঁর নাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কেন ?

বাজীরাও নাম এখন চলতি প্রবাদে দাঁড়িয়েছে বাজীরাও মানে হচ্ছে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী, তার অসাধ্য কিছু নেই। 'বাজীরাওএর ব্যাটা' কথাটা ব্যঙ্গে ব্যবহার হয়। অত বড়লোকের ছেলের আবার খেটে খাবার কী দরকার। সেজে গুজে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে।

মামা হাসছিলেন

আমি বললুম : আর একটি নাম আছে বাজীরাওএর নামের সঙ্গে জড়িয়ে। গুজরাতে একজনকে সাহায্য করতে গিয়ে মস্তানি নামে এক কন্যাকে তিনি নাকি উপহার পেয়েছিলেন।

স্বাতি বলল : যার নামে গেট আছে এখানে ?

বললুম : হ্যাঁ, যার বাড়িটি কোথ্‌রুড গ্রাম থেকে তুলে এনে জাদুঘরে এখন রাখা হয়েছে, সেই মস্তানি। তার রূপ নাকি অনির্বচনীয় ছিল। কথায় আজও বলে যে মস্তানি যখন পান খেত, সেই পানের রাঙা রস তার গলা দিয়ে নামতে দেখা যেত।

স্বাতির বোধহয় বিশ্বাস হল না এই কথা, বলল : এত ফর্সা!

বললুম : তাকে দেখি নি তো, শুনেছি তার কথা।

পুনায় আজ বাজীরাও নেই, বাজীরাওএর বেটাও বেশি নেই। শিবাজীর বংশধরেরা সাতারায় রাজত্ব করেছিলেন অনেক দিন। তাও শেষ হয়ে গেছে। পেশোয়া নামও লোপ পেয়েছে ইংরেজের হাতে। মারাঠার গর্বের বিষয় আজ নতুন করে গড়তে হচ্ছে।

ট্রেন যে কখন চলতে শুরু করেছিল, আমি খেয়াল করি নি। কিন্তু স্বাতির নজর ছিল সব দিকে। বলল : গোপালদা গল্প করতে চাও কর, কিন্তু নিজের জায়গাটা আগে দখল করে এস।

বললুম : সে ভয় নেই, পাশের গাড়ির একখানা বার্থ যে আমাদের, তা সবাইকে জানিয়ে রেখেছি।

স্বাতি বলল : তোমার চাদরখানা বিছিয়ে এস।

আমি বললুম : এ গাড়িতে তো তিনজনের জায়গা হবে না, আমার একটা পরামর্শ আছে।

কী?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : স্বাতিকে নিয়ে মামীমা এই গাড়িতে থাকুন, আর আপনি—

কথাটা শেষ করবার আগেই মামা বলে উঠলেন : আর তুমি কোন থার্ড ক্লাসে গিয়ে উঠবে, এই তো!

স্বাতি হেসে উঠল, বলল : গোপালদার বুদ্ধিই এই রকম। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট নিয়ে থার্ড ক্লাসে গিয়ে উঠবে।

মামী বললেন : আমার জন্যে ভেবো না, আমি নিচে শোব।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। স্বাতি উপরের বাঙ্কে উঠবে, মামা শোবেন নিচের বার্থে, আর মামীর জন্যে হোল্ডল বিছানো হবে মেঝের উপরে। কাজেই পাশের গাড়ির উপরের বার্থখানা আমারই ভাগ্যে জুটল। আমি আর দেরি না করে চাদরখানা বিছিয়ে বালিশটা পেতে উপরে রেখে ফিরে এলুম।

মামা বললেন: এমন তাড়াতাড়ি ফেরার কোন মানে হয় না।

মামীর বোধ হয় শোবার ইচ্ছা হয়েছিল। বললেন: তবে কি এখন মুগুর ভাঁজবে?

মামা বললেন: শোয়া আর মুগুর ভাঁজা ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কাজ নেই?

কিন্তু মামী কোন উত্তর দিলেন না বলে দুজনের তর্ক বন্ধ হয়ে গেল।

স্বাতি বলল: এখন আমাদের গোয়ার কথা ভাবতে হবে।

মামা বললেন: কিছু জানা আছে যে ভাবব।

স্বাতি বলল: গোপালদা থাকতে আমাদের কেন জানতে হবে?

বলে সকৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলুম না। মামী হঠাৎ বলে উঠলেন: এখানে সোমনাথের পরে কোন বড় তীর্থস্থান দেখলুম না। এ দেশে কি কোন তীর্থ নেই?

এ প্রশ্ন তিনি আমাকেই করেছিলেন। তাই বললুম: কেন থাকবে না মামীমা। নাসিক একটি বড় তীর্থ, হরিদ্বারের মতো কুম্ভ মেলা হয় সেখানে।

মামী বললেন: তবে সেখানে আমরা গেলাম না কেন?

বলে মামার দিকে তাকালেন।

মামা কোন উত্তর দিলেন না দেখে আমি বললুম: নাসিক কলকাতা যাবার পথে। ইচ্ছে করলে নেমে নাসিক ও ত্র্যম্বকেশ্বর দেখে যাওয়া যায়।

মামা বললেন : সত্যিই দেখবার মতো জায়গা নাকি ?

বললুম : তা বলতে পারব না।

স্বাতি বলল : সূর্পণখার নাক কাটার জন্যেই তো নাসিক নাম হয়েছিল ?

বললুম : হ্যাঁ।

তার পরে কী হয়েছিল বল।

সে তো ত্রেতাযুগের কথা। তখন সে জায়গার নাম ছিল জনদেশ বা জনারণ্য। রাবণের রাজত্ব। সূর্পণখা রাজ্যপালিকা আর শাসন পরিচালনার ভার খর ও দূষণের উপরে। বনবাসী রাম এসে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী বনে বাস করছেন। তার পরের গল্প তো জানা আছে। লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক কাটলেন। গোদাবরীর এ পারে নাসিক, আর ওপারে পঞ্চবটী, স্টেশন থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। রামের পর্ণকুটীর, সূর্পণখার নাক কাটার স্থান, মারীচ বধের স্থান। সীতা গুহা— এই সব দেখবার জায়গা। কিন্তু বন আর নেই, রীতিমতো শহর হয়ে উঠেছে। মোটর বাস চলছে, গাড়িঘোড়া চলছে। ইলেকট্রিক, মাইক, সিনেমা সবই হয়েছে।

মামা আগ্রহ সহকারে বললেন : তারপর ?

বললুম : তার পরে ত্র্যম্বকেশ্বর। কিন্তু সে প্রায় আঠারো মাইল দূরে ব্রহ্মা পাহাড়ের পাদদেশে। গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই পাহাড়ে। একটি গুপ্ত ধারায় প্রবাহিত হয়ে একটি কুণ্ডে এসেছে, তার পরে একটি ক্ষীণ ধারায় নেমেছে নিচে। যত দূর জানি, কুম্ভস্নান হয় এইখানে। গোদাবরীর মন্দির আছে, আছে একটি ছোট শিবের মন্দির। ত্র্যম্বকেশ্বর শিবের মন্দির অনেকটা তফাতে। বিরাট মন্দির, ভিতরে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ।

সে আবার কী রকম ?

বলে মামী আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: নিজের চোখে দেখি নি তো, কাজেই ঠিক বলতে পারব না। শুনেছি নেপালের পশুপতিনাথও এই রকম, শিবলিঙ্গের চারিধারে চারিটি মুখ আছে।

মামা বললেন: কিন্তু শিবের তো পঞ্চ বক্ত্র, তাঁর মুখ পাঁচটি।

বললুম: আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

মামা বললেন: তার পরে বল।

বললুম: আরও একটি শিবের মন্দির আছে বম্বের কাছে, তাঁর নাম অম্বরনাথ। কল্যাণ স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের গায়ে। কিন্তু গান্ধারপুরের মতো তার নামডাক নেই।

গান্ধারপুর আবার কোথায়?

বললুম: জায়গাটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে শুনেছি যে বম্বে থেকে মাদ্রাজে যাবার পথে পুনা থেকে এক শো মাইলের বেশি দূরে কুরুডুয়াড়ি নামে একটি জংশন স্টেশন আছে। সেখানে বড় লাইনের গাড়ি থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠতে হয়। কয়েকটা স্টেশন পরেই এই বিখ্যাত তীর্থস্থান।

মামী বললেন: কোন্ দেবতার মন্দির?

বললুম: বিঠ্ঠল দেবের। বিঠ্ঠল হলেন বিষ্ণু। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এই বিরাট মন্দির বহু দিনের পুরনো। আমার মনে হয় রাজস্থানের নাথদ্বার যেমন, মহারাষ্ট্রের গান্ধারপুরও তেমনি, কিংবা তার চেয়েও প্রসিদ্ধ।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: এ সব জায়গার নামও শুনি নি।

বললুম: তার কারণ আছে। উদয়পুরে আমরা বেড়াতে যাই বলে নাথদ্বারের নাম জানি, কিন্তু এ দিকে আসি না বলেই এ নাম আমাদের অপরিচিত।

মামা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

বললুম: কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনচরিত পড়বার সময়।

তাঁদের মধ্যে তুকারাম হলেন প্রধান। বিঠ্ঠল দেবের মন্দিরেই তিনি শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন।

মামা বললেন : নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে !

বললুম : তুকারাম ব্যবসা করতেন, আর ব্যবসায়ে লোকসান দিতেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন বড়লোকের মেয়ে। নিজের বাপের বাড়ি থেকেও অনেক টাকা-পয়সা এনে স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তুকারাম সব ডুবিয়ে দিয়ে দেবতার পায়ে শরণ নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর খ্যাতি শুনে শিবাজী মহারাজ এসেছিলেন পান্ধারপুরে তুকারামের কাছে। রামদাস স্বামীও তখন সেখানে বাস করছিলেন। তুকারামই শিবাজীকে পাঠালেন রামদাস স্বামীর কাছে। শিবাজী শিষ্য হলেন রামদাস স্বামীর।

কিন্তু আমার মনে হয় যে তুকারামের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল মারাঠী ভাষায় অভঙ্ রচনা। অভঙ্ বা অভঙ্গ হল দেবতার নামে স্তোত্র। চিরকাল এগুলি সংস্কৃতে রচিত হয়েছে। কিন্তু তুকারাম সাধারণ মানুষের উপযোগী করে অভঙ্ লিখলেন মারাঠীতে।

প্রতিবাদ হল। এক ব্রাহ্মণ তাঁর মারাঠীতে লেখা অভঙ্ উপহার ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে এসে বললেন, ধর্ম নষ্ট হচ্ছে, ফেলে দিতে হবে ঐ সব অস্পৃশ্য অভঙ্। তুকারাম কোন প্রতিবাদ না করে নদীর জলে ফেলে দিলেন।

এবারে স্বাতি প্রশ্ন করল : তারপর ?

তারপর তুকারাম অনুতাপে দগ্ধ হলেন।

কেন ?

অভঙ্গুলি তো তাঁর নিজের সম্পত্তি ছিল না, সে সব তিনি দেবতাকে নিবেদন করেছিলেন। অনুতপ্ত তুকারাম উপবাস শুরু করলেন প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তের দিন তের রাত্রি পরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, দেবতা দর্শন দিয়ে বলছেন যে একটি অভঙ্ও নষ্ট হয় নি,

জলের তলায় সবই সযত্নে রাখা আছে। পরদিন সকালে তুকারাম নদীর জলে ডুবে সমস্ত অভঙ্ উদ্ধার করলেন। কালি দিয়ে লেখা অভঙ্ একটিও মুছে যায় নি।

এই অলৌকিক ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না কেউ। এ বিশ্বাসের কথা, প্রতিবাদের কথা নয়। এই ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণ হয় যে শিবাজী যেমন মারাঠা জাতিকে জাগিয়েছিলেন, তুকারাম তেমনি মারাঠী ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্মানের আসনে।

ট্রেন চলছে, ঘুমোবার সময় হয়েছে আমাদের। নতুন কোন কথা না বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম। কেউ আমাকে বাধা দিলেন না।

২৫

ঘুম যখন ভাঙল, দিনের আলো তখন ফুটে উঠেছে। জানালা দিয়ে আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে গাড়ির ভিতরে। উঠে বসে আশ্চর্য হলুম। গায়ের উপরে একখানা চাদর। মনে পড়ল, রাতে একটু শীত বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এই চাদর দিয়ে কে আমাকে ঢেকে দিয়ে গেল! স্বাতি! কিন্তু দরজা তো বন্ধ ছিল। কেমন করে সে এই গাড়ির ভিতরে ঢুকবে! কিন্তু স্বাতি ছাড়া আর আমাকে ঢেকে দিতে আসবে কে!

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। কেউ আসে নি, কেউ ঢেকে দেয় নি আমাকে। নিচের চাদরখানা আমি নিজেই উপরে নিয়েছিলুম। ঘুমের ঘোরেই বোধহয় নিয়েছিলুম।

কিন্তু স্বাতির কথা আমার মনে এল কেন! তার যত্নের কথা!

না থাক, কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় আমি দেব না। চাদরখানা সরিয়ে দিয়ে আমি নিচে নেমে পড়লুম। গাড়ির অন্য যাত্রীরা তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। আমি আমার চাদরখানা ভাঁজ করে বালিশের সঙ্গে জড়িয়ে নিলুম। তার পরে মুখ হাত ধোবার জন্যে আমি বাথ-রুমে চলে গেলুম।

ফিরে এসে দেখলুম যে নিচের এক ভদ্রলোক তখন উঠে বসেছেন। নিজের দিকের জানলাও খুলে দিয়েছেন। আমাকে আসতে দেখে বিছানার এক অংশ ঝেড়ে দিয়ে বললেন: বসুন।

আমি ধন্যবাদ দিয়ে বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন: গোয়া যাচ্ছেন তো?

বললুম: হ্যাঁ।

কাজে, না বেড়াতে?

বললুম : বেড়াতে।

তাহলে তো মাড়গাওয়ে নেমে পানাজি যাবেন?

এবারেও আমি 'হ্যাঁ' বললুম।

ভদ্রলোক হিন্দীতে কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর হিন্দী ঠিক যেন হিন্দী নয়। মনে হচ্ছিল যে হিন্দী তাঁর ভাষা নয়, শিখেছেন সম্প্রতি। পরে বুঝেছিলুম যে মারাঠীরা এই ভাবেই হিন্দী বলেন। তাঁদের হিন্দী বলার ধরনটি একটু অন্য রকম।

বাহিরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন : বম্বে থেকে আসছেন তো? তা জাহাজে না এসে ট্রেনে আসছেন কেন? বেড়ানোই যখন উদ্দেশ্য, তখন বেড়ানোর কোন আনন্দই পেলেন না।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর আমি নিঃশব্দে মেনে নিলুম তাঁর কথা।

ভদ্রলোক বললেন : বম্বের ফেরি হোয়াফে চৌগুলে কোম্পানীর জাহাজে উঠতেন। আর সারা দিন ধরে দেখতেন কোঙ্কণ উপকূলের শোভা সৌন্দর্য, আর কোঙ্কণীদের জীবনযাত্রা।

ভদ্রলোকের মুখে কোঙ্কণ শব্দটি শুনেই আমি তটস্থ হয়ে বসলুম। ভদ্রলোক তা লক্ষ্য করে বললেন : ভাববেন না যে কোঙ্কণ উপকূল একটা ছোট জায়গা, বম্বে থেকে গোয়া আসবার পথে তা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের সমগ্র পশ্চিম উপকূলকেই আপনি কোঙ্কণ বলতে পারেন। উত্তরে গুজরাত থেকে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শো মাইল বিস্তৃত এই উপকূল। আর প্রশস্তও হবে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল। পশ্চিমঘাট পাহাড় আড়াল করে আছে বলে সমুদ্র আমরা দেখতে পাচ্ছি না, উপকূলও না। তাই বলছিলাম যে জাহাজে এলে এই উপকূলের সৌন্দর্য আপনি দেখতে পেতেন।

গুজরাতের উপকূলকেও যে কোঙ্কণ বলে আমি তা জানতুম না।

সৌরাষ্ট্র একটি উপদ্বীপ, গুজরাতেরই অংশ। সৌরাষ্ট্র ও ভারতের মেন ল্যাণ্ডের মাঝখানে আরব সাগরের যে অংশ, তার নাম ক্যাম্বে উপসাগর। মহেঞ্জোদারোর মতো পুরনো প্রাগৈতিহাসিক শহর লোথাল ছিল এই উপকূলেই। নিকটে আমেদাবাদ ও বরোদা। ভৃগুকচ্ছ তো সমুদ্রের ধারেই। তারপরে সুরাত ও বম্বে।

ভদ্রলোক বললেন: কোঙ্কণ উপকূলের প্রধান শহর হল বৃহৎ বম্বে। কিন্তু এই শহরটি আন্তর্জাতিক শহরের মতো বলে কোঙ্কণীদের শহর বলে স্বীকৃত হয় নি। ভৌগোলিক বিচারে তা মানতেই হবে। কোঙ্কণের গৌরব হল বম্বে।

এ কথা মিথ্যা নয়। কোঙ্কণ উপকূলে যে বম্বের অবস্থান, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মারাঠী ও গুজরাতীরা এসে শহর দখল করে বসেছে, কোঙ্কণীদের অধিকার কেউ মানছে না। এ কালের মারাঠীরা তাদের করতলগত করে রেখেছে।

ভদ্রলোক বললেন: জাহাজে চেপে গোয়ায় এলে উপকূলের কয়েকটি সুন্দর জায়গা দেখতে পেতেন।

আমি এই উপকূলের একটি জায়গারও নাম জানি নে। তাই অনেক আগ্রহ নিয়ে বললুম: এ দিকের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

ভদ্রলোক এবারে আমার দিকে ফিরে বসলেন, বললেন: এক ভাঁড় চা হলে সকালের গল্প ভাল জমত।

মুখ হাত ধুয়ে আসবার পর চায়ের কথা আমারও মনে এসেছিল। কিন্তু গাড়ি একটা বড় স্টেশনে না দাঁড়ালে কোন উপায় নেই। তাই বললুম: এবারে ট্রেন দাঁড়ালেই চেষ্টা করব।

ঘড়ি দেখে ভদ্রলোক বললেন: গোক রোডে ট্রেন দশ মিনিট দাঁড়াবে। তখন চেষ্টা করা যাবে।

তারপরেই বললেন: গোক জানেন তো? গোক একটা জলপ্রপাত। গোক রোডে নেমে লোকে এই জলপ্রপাত দেখতে যায়।

গোক জলপ্রপাতের চেয়ে কোঙ্কণ উপকূলের কথা শোনবার আগ্রহ আমার বেশি। তাই ভদ্রলোককে আমি সেই সূত্র ধরিয়ে দিলুম, বললুম: আপনি কোঙ্কণ উপকূলের কথা বলছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন: বম্বেতে আপনি জুহু ভার্সোবা মধ্ মর্ভে মনোরির নাম শুনেছেন তো? আরও উত্তরে দাহালু নামে একটা চমৎকার জায়গা আছে। বম্বে থেকে ট্রেনে যেতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে।

আর দক্ষিণে?

দক্ষিণে প্রথম জায়গা হল আলিবাগ, তারপর মুরুদ। বম্বে থেকে মোটরে আপনি আসতে পারেন। প্রথমে থানা এসে পুনার পথ ধরবেন, তারপর পাবেন আলিবাগের পথ। এ দিকের পথ-ঘাটের ধারণা আপনার আছে তো?

বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: ন্যাশনাল হাইওয়ে বম্বে থেকে পুনা সাতারা কোলাপুর ও বেলগাঁওএর উপর দিয়ে দক্ষিণে গেছে। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের পূর্ব দিকে এই পথ, আর পশ্চিমেও মোটর চলাচলের পথ আছে। এই পথেও আপনি রত্নগিরি আসতে পারেন, রত্নগিরি থেকে কোলাপুর, কিংবা ভেনগুরলা হয়ে বেলগাঁওএ আসতে পারেন। কোলাপুর জানেন তো? দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল আগে। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের জন্যে অনেকে দক্ষিণ কাশী বলে। পঞ্চগঙ্গার তীরে শহর, তীর্থস্থানও বটে। আধুনিক শহরও বটে।

ভদ্রলোক কোলাপুর বলছিলেন না, উচ্চারণ করেছিলেন কোল্হাপুর। তারপরে বললেন: রাতে আমরা ওয়াদার নামে একটা স্টেশন ছেড়ে এসেছি, সেখান থেকে মহাবলেশ্বর যায়। আর সাতারা রোড থেকে যায় সাতারায়। মহাবলেশ্বর থেকে সাতারা খুব কাছে। লোকে মোটরেই যাতায়াত করে।

বললুম : আপনি আলিবাগের কথা বলছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ। ছত্রপতি শিবাজী সেখানে একটা পাহাড়ের উপরে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এখনও এই দুর্গের ভিতরে কয়েকটি মন্দির ও ভাঙা বাড়ি আছে। তবে এ দিকের সবচেয়ে মজবুত দুর্গ হল জঞ্জিরায়। আবিসিনিয়ার সিদ্দিরা এই দুর্গ নির্মাণ করেছিল প্রায় তিন শো বছর আগে। রাজাপুরী ক্রীক্ নামে সমুদ্রের একটা খাঁড়ি আছে। তার দক্ষিণে জঞ্জিরা, আর উত্তরে মুরুদ। মুরুদের সমুদ্রবেলা অতি সুন্দর। জঞ্জিরার নবাব এখানে পাহাড়ের উপরে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সেখানে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখবেন। কয়েক মাইল দক্ষিণে শ্রীবর্ধন নামে আরও একটি সুন্দর জায়গা আছে। এ সমস্তই কোঙ্কণের কোলাবা জেলায়। বম্বে থেকে জাহাজে চেপে জঞ্জিরায় এসে নামবেন, তার পর ঘুরে ঘুরে সব দেখবেন।

সে সৌভাগ্য যে আমার হবে না, তা বললুম না। বরং আরও কিছু শোনবার আশায় বললুম : রত্নগিরির কথা বলছিলেন!

ভদ্রলোক বললেন : রত্নগিরি কেন, জাহাজে এলে আরও অনেক সুন্দর জায়গা দেখবেন। হরেশ্বর ডাভল বিজয় দুর্গ মালবান ভেনগুরলা—

বললুম : একে একে বলুন এই সব জায়গার কথা।

রত্নগিরি নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন অপরিমিত, বললেন : শোনেন নি! বম্বের আম খান নি?

বললুম : এখন তো আম পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক নিজেই বলতে লাগলেন : বম্বের আম আসে রত্নগিরি থেকে। কিন্তু এখানকার আসল রত্ন আম নয়, রত্নগিরির রত্ন হলেন এখানকার মানুষ। মহারাষ্ট্রের মানুষ বলে যাঁদের আপনারা শ্রদ্ধা

করেন তাঁদের অনেকেই জন্মেছেন এই কোঙ্কণ উপকূলের রত্ন-গিরিতে।

তারপরে একটি একটি করে নাম বললেন: লোকমান্য তিলক, গোখেল, মাভ্‌লঙ্কার, বি. জি. খের ও এস. কে. পাতিলও এখানকার লোক। আর উত্তর প্রদেশের গোবিন্দবল্লভ পন্থের পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন রত্নগিরির অধিবাসী।

ভদ্রলোক থামলেন একটুখানি। আর কোনও নাম বোধহয় তার মনে পড়ল না। তাই বললেন: রত্নগিরি জেলার প্রধান শহর এটি, সমুদ্রের ধারে অপরূপ সুন্দর শহর। বন্দরে জাহাজ এসে ভেড়ে। পুরনো দুর্গও আছে একটি, পাঁচ-ছ শো বছরের পুরনো দুর্গ। শিবাজী এটিকে সংস্কার করে ব্যবহার করেছিলেন।

আরও অনেক দুর্গ আছে এই উপকূলে—জয়গড় দেবগড় পদ্মগড় সিন্ধু দুর্গ বিজয় দুর্গ—

হেসে বললুম: এক সঙ্গে এত নাম বললে সব গোলমাল হয়ে যাবে। রত্নগিরিতে আর কী দেখবার আছে তাই বলুন।

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললেন: রত্নগিরির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা ঐতিহাসিক প্রাসাদ আছে। ব্রহ্মদেশের নির্বাসিত রাজা থিবা সেই প্রাসাদে বাস করতেন।

তারপরেই বললেন: রত্নগিরির কালেক্টর এখন এই বাড়িতে থাকেন।

ট্রেন এখন ধীরে ধীরে চলছে। তা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন: গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

গলা শুকোবার কথাই। শুকনো গলাতেই তিনি অনেক কথা বলেছেন। বললুম: আর ভাবনা নেই। গাড়ি থামলেই চায়ের যোগাড় করে ফেলব।

ভদ্রলোক বললেন: কোন কষ্ট করতে হবে না। গাড়ি থামলেই চাওয়ালারা এগিয়ে আসবে।

তাই হল। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়েই আমরা চা পেয়ে গেলুম। রুমালের উপরে চায়ের ভাঁড় রেখে যখন মনের আনন্দে চা খাচ্ছি, তখন হঠাৎ দরজার বাহিরে একটি পরিচিত শব্দ পেলুম। চুড়ির হাল্কা আওয়াজ। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু ভদ্রলোক কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কজন আছেন?

বললুম: চারজন।

এর পরে ভদ্রলোক কী প্রশ্ন করবেন ভেবে পেলেন না।

নিঃশব্দে আমি আমার চায়ের ভাঁড়টি শেষ করে জানলা দিয়ে বাহিরে ফেলে দিলুম। তারপর আবার গল্প শুরু করলুম ভদ্রলোকের সঙ্গে। বললুম: কোঙ্কণী ভাষা সম্বন্ধেও আপনার একটা ধারণা আছে নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক চায়ে একটা চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার কথা শুনে হেসে বললেন: আপনি আমাকে কি মহারাষ্ট্রী ভেবেছেন নাকি?

আমার হিসেবে যে একটু ভুল হয়ে গেছে, তা বুঝতে পারলুম। ভদ্রলোক যখন লোকমান্য তিলক প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম গৌরবের সঙ্গে বলেছিলেন, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে ইনিও এই অঞ্চলের লোক। তাই ভুলটা অস্বীকার করবার জন্যে বললুম: প্রথমে তাই ভেবেছিলুম বটে, কিন্তু—

বুঝেছি।

বলে ভদ্রলোক নিজের চা শেষ করে ভাঁড়টা বাহিরে ফেলে দিলেন। অনেকক্ষণ আগেই ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: সময় তো বেশি নেই, সংক্ষেপে বলতে হবে। কোঙ্কণী একটা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত। কোঙ্কণীকে যারা মারাঠীর উপভাষা মনে করে, তারা ভুলই করে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন : আপনি কি বাঙালী ?

কেন এই প্রশ্ন করলেন তা বুঝতে না পেরেও বললুম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে একটা জিনিস আপনাদের লক্ষ্য করা উচিত। আমরা যত দূর জানি, গৌড় হল প্রাচীন বাঙলার নাম। আর গৌড় ব্রাহ্মণ হল বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ। এ দিকেও আপনি গৌড় ব্রাহ্মণ পাবেন, গৌড় সারস্বত কথাটিও প্রচলিত। আর একটি কথা আপনাকে বলব। দূর থেকে কোঙ্কণী ভাষার একটি রেকর্ড শুনে এক বাঙালী ভদ্রলোক বাঙলা গান বলে ভুল করেছিলেন। পরে সেই গান কোঙ্কণী শুনে কাছে থেকে শুনে বললেন, ভাষাটা অন্য বটে, কিন্তু সুর ও শব্দ বাঙলার মতো।

এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম আর ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন : আমি এর একটা কারণ বলতে পারি। কোঙ্কণী ভাষায় প্রাচীন প্রাকৃত শব্দ খুব বেশি প্রচলিত, আর উচ্চারণে সানুনাসিক ধ্বনির ব্যবহার বেশি।

কিন্তু এর জন্যে বাঙলার মতো কেন শোনাবে তা বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম : এ ভাষার সাহিত্য কি খুব সমৃদ্ধ ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন : মোটেই না। তার জন্যে হিন্দুরাই দায়ী।

কেন ?

তারা কথা বলে কোঙ্কণীতে, কিন্তু লেখাপড়া করে মারাঠী ভাষায়। কোঙ্কণী সাহিত্য বলে আমরা যা পাই, আসলে তা খ্রীষ্টান কোঙ্কণী সাহিত্য, বা গোয়ান খ্রীষ্টান সাহিত্য। পর্তুগীজ পাদরিরা তাদের রোমান লিপিতে কোঙ্কণী ভাষা লিখতে শিখিয়েছে, তারাই কোঙ্কণী ভাষার ব্যাকরণ লিখেছে। হিন্দুরা কোঙ্কণী

ভাষায় সাহিত্য রচনা করলে এই ভাষার অনেক উন্নতি হতে পারত।

ভদ্রলোক আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কি বেশি দূর যাবেন না?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: বেলগাঁওএ নামব। বেলগাঁও থেকে যাব রত্নগিরি।

তার পরেই বললেন: বেলগাঁওএ মাঝে মাঝেই গোলমাল হচ্ছে। মারাঠীরা বলছে, এ আমাদের শহর, আর মহিসুরের লোক বলছে, এ শহর আমাদের। রাজনৈতিক নেতারা প্রবল আন্দোলন করছে, আর সরকার একেবারে নীরব। কোন পক্ষ নেবার উপায় নেই। আপনারা তো গোয়ায় যাচ্ছেন?

বললুম: হ্যাঁ।

সেখানে গিয়েও গোলমাল দেখবেন।

কিসের গোলমাল?

ভদ্রলোক বললেন: ক্ষমতার লড়াই। মারাঠীরা বলছে, দেশ আমাদের। আর গোয়ানিজরা বলছে, গোয়া আমাদের।

ভদ্রলোক এবারে সাবান তোয়ালে নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: গোয়া দেখতে আমাদের কদিন লাগবে বলুন তো?

কদিন থাকবেন ভাবছেন?

বললুম: দিন দুই।

তবে এক কাজ করুন। মাড়গাওএ নেমে একখানা ট্যাক্সি নিন, আর পোণ্ডার মন্দিরগুলো দেখে এগিয়ে যান। সময় থাকলে ওল্ড্ গোয়াও দেখে পানাজি চলে যান, পানাজি যাবার পথেই এ সব দেখতে পাবেন।

তারপর?

তার পরদিন সকালে মাণ্ডভী নদীর ওপারে গিয়ে মাপুসা আর

কোলাংগুট বীচ দেখে আসুন, বিকেলে দেখুন পানাজির ডোনা পাওলা আর মীরা মার। পানাজিতে যদি টুরিস্ট হস্টেলে ওঠেন তো সেখানেই গোয়ার বইপত্র পাবেন।

বাথ-রুমে যাবার জন্যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: আর এক দিন যদি থাকেন তো ট্যাক্সি নিয়ে জুয়ারি নদী পেরিয়ে ভাস্কো-ডা-গামায় চলে যাবেন। মার্মাগাও হারবার দেখে এসে রাতে একটা হোটেলে থাকবেন, সকাল বেলায় ধরবেন পুনার ট্রেন।

বলে আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। অন্য দুজন যাত্রীও তখন উঠে বসেছেন। যিনি উপরে ছিলেন, তিনি তড়াক করে নেমে এলেন নিচে। কিন্তু এঁরা দুজনেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। আমার দিকে মোটেই তাকালেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে আমি পাশের গাড়িতে চলে এলুম।

২৫

আমাকে দেখতে পেয়েই মামা বলে উঠলেন : বুঝলে গোপাল, ভাঁড়ের চা খেয়ে একেবারে জুত হল না।

বললুম : বেলগাঁওএ ভাল চায়ের চেষ্টা করা যাবে।

স্বাতি বলল : আর আমাদের কোন ভাবনা নেই বাবা, গোপালদা সব খবর সংগ্রহ করে ফেলেছে।

বলে সকৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

বেলগাঁওএ ট্রেন পৌঁছল সকাল আটটার পরে। চা খাবার পর মামীর ভাবনা হল দুপুরের আহারের। মাড়গাওএ আমরা নামব দুপুর আড়াইটেয়, কাজেই তার আগেই আমাদের খেয়ে নিতে হবে। লোন্ডা জংশনে আমরা পৌঁছব দশটার পরে। এর পরে লোন্ডা মার্মাগাও ব্রাঞ্চ লাইন। কোনও স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় কিনা জানা নেই।

স্বাতি টাইম টেব্‌ল বার করলে দেখা গেল যে পুনা থেকে ব্যাঙ্গালোর মেলে ডেকান এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেনগুলি লোন্ডার উপর দিয়ে হুব্‌লি চলে যায়। শুধু এই ভাস্কো এক্সপ্রেসটি পশ্চিমে বেঁকে সমুদ্রের ধারে ভাস্কো-ডা-গামা যাবে। অন্য ট্রেনে এলে লোন্ডায় নেমে রাত তিনটের প্যাসেঞ্জার ধরতে হয়, তা না হলে এই এক্সপ্রেস। দুপুরে কোথাও খাবার পাওয়া যাবে কিনা, ব্রাডশর টাইম টেব্‌ল দেখে তা বোঝা গেল না।

পাশের গাড়িতে এসে দেখলুম যে আমার সঙ্গী ভদ্রলোক নেমে গেছেন। আর অন্য দুজনে তেমনি গম্ভীর মুখে আছেন বসে।

ফিরে আসতেই মামী বললেন : তাহলে সামনের স্টেশনেই যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে নাও।

মামা বললেন : অসম্ভব। সকাল দশটায় ভাত গিলতে পারব না।

লোন্ডায় পৌঁছে সমস্যা মিটল। কাস্‌ল্ রক নামে একটি স্টেশনের বেয়ারা এল খাবারের অর্ডার নিতে। বলল : সাড়ে এগারটায় খাবার দেব।

কিন্তু টাইম টেব্‌লে আমরা দেখেছিলুম যে এগারটার পরেই ট্রেন পৌঁছয়। কিন্তু বেয়ারা বলল যে ট্রেন এক-আধটু লেট থাকেই, আর দাঁড়ায় অনেকক্ষণ, আর সেও ট্রেনের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। এ কথাও জানিয়ে দিল যে এর পরে আর কোন স্টেশনে খাবার পাওয়া যাবে না। কাজেই মামী এবারে নিজেই খাবার অর্ডার দিলেন : চারজনের খাবার দিও। আর মাছ মাংস থাকলে নিরামিষ দিও না।

কাস্‌ল রকেই আমরা দুপুরের আহার সেরে নিলুম। নিশ্চিন্ত হলেন মামী। আমরা আশ্বস্ত হলুম। স্টেশনটি বেশ বড়সড়। মনে হল যে গোয়া ভারতভুক্ত হবার আগে এইটেই বোধহয় ভারতীয় রেলের শেষ স্টেশন ছিল, কিংবা শেষ বড় স্টেশন। এর পরে পর্তুগীজ রেলওয়ে পশ্চিমঘাট পাহাড় ভেদ করে গোয়ায় প্রবেশ করেছে।

রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারা বকশিশ পেয়ে বলেছিল : এর পরে পাহাড়ের দৃশ্য খুব সুন্দর। বাঁ দিকে নজর রাখবেন। দুধসাগর ফল্‌স্ ট্রেন থেকেই দেখা যায়। দুধসাগর নামে একটি ছোট স্টেশনও আছে।

গোয়ায় যেতে পশ্চিমঘাট পাহাড় ভেদ করে যেতে হয়। একটার পরে একটা টানেল—ছোট বড় মাঝারি—সব রকম টানেল। স্বাতি প্রথমটায় গুনতে শুরু করেছিল, পরে হিসেবের গোলমাল হয়ে গেল। দুধসাগর জলপ্রপাতও আমরা দেখতে পেলুম। এমন কিছু ভাল না হলেও মন্দ নয়। পানাজি শহরের কাছে হলে আমরা আর একবার এসে দেখতুম।

ট্রেন এখানে খুব ধীরে ধীরে চলে। ছোট ছোট স্টেশন। সব স্টেশনে দাঁড়ায়। গোয়া রাজ্যের পূর্ব সীমানার পাহাড়ে দুধসাগর কল্‌স্‌, আর মাড়গাও স্টেশন হল পশ্চিমে আরব সাগরের কাছে। কোল্‌ভা নামের একটি সুন্দর বীচ—সমুদ্রবেলা মাইল তিনেক দূরে। ইচ্ছা করলে মাড়গাওএ নেমে এই জায়গাটি দেখে পানাজি যাওয়া যায়। রেল লাইন এখান থেকে সমুদ্রের ধারে ধারে উত্তর পশ্চিমে গেছে। ভাস্কো-ডা-গামা স্টেশন সমুদ্রের ধারে। একটুখানি এগিয়েই মার্মাগাও বন্দর। এই দুটি স্টেশনের মাঝে শাট্‌ল ট্রেন যাতায়াত করে।

ভাস্কো-ডা-গামা থেকে পানাজি আরও কাছে, কিন্তু নৌকোয় করে জুয়ারি নদী পেরুতে হয়। মার্মাগাওএ নামলেও জুয়ারি নদী পেরুতে হয় পথে। কিন্তু নদী এখানে প্রশস্ত ও উত্তাল নয়, পুল আছে নদীর উপরে। আর পোণ্ডা তালুকের অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির দেখে ওল্ড্‌ গোয়ার ভিতর দিয়ে পানাজি পৌঁছনো যায়।

এ সব কথা আমি পরে জেনেছিলুম। টুরিস্ট অফিসের পুস্তিকায় ম্যাপ দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলুম। কিন্তু পরে এ সব জানার জন্যে অসুবিধা কিছুই হয় নি। মাড়গাও স্টেশনে নেমে পড়তেই জনকয়েক কুলি এসে মালপত্র টেনে নামিয়েছিল। আমি স্টেশনের বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ঠিক করছিলুম। এমন সময় সবাই এসে পৌঁছে গেলেন।

অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, আমি একটি বিদেশী গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে দরাদরি করছিলুম। কুড়ি মাইলের কিছু বেশি পথ নিয়ে যাবার জন্যে তাদের তিরিশ টাকা দাবী। আমরা পোণ্ডার মন্দিরগুলো দেখে যেতে চাই বলে আরও পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে। আমি বলছিলুম : ওল্ড্‌ গোয়াও দেখিয়ে দেবে।

সে বলছিল : তাহলে চল্লিশ টাকা দিতে হবে।

আমি বললুম: পথ তো বেশি নয়, শুধু শুধু পয়সা কেন বেশি নেবে?

সে বলল: অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে তো।

পিছন থেকে মামা বলে উঠলেন: অত সময় নষ্ট করছ কেন, উঠে পড়।

বাঙলায় কথা, কিন্তু সবাই বুঝতে পারল। ড্রাইভার পিছনের বুট খুলে মালপত্র গুছিয়ে নিল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধাল কুলিরা। বলল, দু টাকার কম কেউ নেবে না।

এক একটা কুলি দু টাকা নেবে শুনে মামী বললেন: ঠিকই চিনেছে।

কিছুতেই তারা মানবে না। শেষ পর্যন্ত ছ টাকার বদলে পাঁচ টাকা দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

গাড়ি ছাড়বার পরে মামা বললেন: দেশটা সুবিধার নয় গোপাল, একটু সমঝে চলতে হবে।

আমি বললুম না যে ট্যাক্সির ভাড়া বোধহয় আমরা বেশি কবুল করেছি। তাইতেই আমাদের বড়লোক ঠাওরেছে এরা।

পথের দিকে আমি নজর রেখেছিলুম। ছোট একটি ছিমছাম শহর এই মাড়গাও—সুন্দর ঘরবাড়ি, পরিচ্ছন্ন পথ। যানবাহন কম, লোকজনও। শহরের বাস স্ট্যাণ্ড স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে। যারা বাসে পানাজি যাবে, মালপত্র নিয়ে তাদর বাস স্ট্যাণ্ডে আসতে হবে।

একটুখানি এগিয়েই শহর শেষ হয়ে গেল। বাঁ হাতে একটি রাস্তা দেখে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই পথটিই কোল্‌ভা বীচে যাবে। কোল্‌ভা বীচের কথা তখন আমি জানতুম না।

মামা বললেন: কদিন আগেও গোয়ার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতুম না।

বললুম: না জানাই স্বাভাবিক। গোয়া তো আমাদের অধিকারে ছিল না। গোয়া ছিল পর্তুগীজ রাজ্য—গোয়া দমন আর দিউ।

মামা বললেন: ভূগোলে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু এ সব জায়গা যে কোথায় তা ভুলে গেছি।

বললুম: দিউ সোমনাথের কাছে, আর দমন হল সুরাতের নিকটে। খুব ছোট জায়গা বলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

স্বাতি সকৌতুকে বলল: রামায়ণ মহাভারতে গোয়ার উল্লেখ নেই?

আমি তার মতলব বুঝতে পেরেও বললুম: আছে।

আছে?

বলে মামা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: তখন এই দেশকে গোমন্তক বলত। যে পাহাড় ভেদ করে আমরা এলুম, তার নাম সহ্যাদ্রি, নদী হল গোমতী আর অঘনাশিনী। সূর্পারক ও গোমন্ত ছিল পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্গত। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে, হরিবংশে ও স্কন্দ পুরাণে এই সবের উল্লেখ আছে।

স্বাতি বলল: গোপালদা তৈরি করে এই সব কথা বলছে বাবা।

বললুম: তাতে আমার কোন লাভ নেই।

মামা বললেন: কেরালার কথাতেও তুমি পরশুরামের কথা বলেছিলে।

বললুম: পরশুরাম সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন ভারতের এই অংশ। গোয়ার লোকে বলে যে গোমন্তের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে একটি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন সেই বীর ব্রাহ্মণ। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল যত দূর তাঁর বাণ যাবে, তত দূর সরে যেতে হবে সমুদ্রকে। এই নতুন জমি তিনি ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্যে দিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল : কেরালায় তুমি কুঠার ছোড়ার গল্প বলেছিলে।

বললুম : এখানে বাণের গল্প। বাণ দিয়ে নাম, এমন একটি গ্রামও নাকি গোয়ায় আছে।

মামা বললেন : তারপর ?

বললুম : এদেশের ব্রাহ্মণেরা বলে যে তাদের এ দেশে এনেছিলেন পরশুরাম নিজে। তারা গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ, বাঙলা দেশ থেকে এসেছে।

সত্যি নাকি ?

বললুম : তারা বোধহয় ত্রিহুত বা মিথিলার ব্রাহ্মণ। সে অঞ্চল তখন বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত ছিল, পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্গত।

তারপর ?

টলেমির ভূগোলে কট্টবা নামে একটা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকে বলে যে কর্ডবাই গোয়া। খ্রীষ্টের জন্মের আগে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। খুব সমৃদ্ধ ছিল সে যুগে। ইজিপ্সিয়ান আর ফিনিসিয়ানরা আসত বাণিজ্য করতে। তার পরে ভোজ রাজারা এল, এল গুপ্ত রাজারা। কদম্ব রাজারা রাজত্ব করল, তারপর বিজয়নগর। বিজাপুরের সুলতানদের আমলে গোয়া গেল পর্তুগীজদের হাতে। সেও প্রায় সাড়ে চার শো বছর আগের কথা।

কথা বলতে বলতে যে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছি, তা বুঝতে পারি নি। মনে হল যে একটা ছোট শহর বা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি। এবং হঠাৎ এক সময় আমাদের ড্রাইভার সোজা পথ ছেড়ে অন্য পথে ঢুকে পড়ল।

স্বাতি বলে উঠল : এ কোথায় চলল ?

বললুম : বোধহয় কোন মন্দির দেখাবে।

ঠিকই বলেছিলুম আমি। খানিকটা পথ এগিয়েই ড্রাইভার গাড়ি থামাল। নিজে নেমে দরজা খুলে দিল মামাকে নামবার

জন্যে। কেউ নামবার আগে আমিই নেমে পড়লুম, আর বাকি নামল আমার সঙ্গে সঙ্গেই।

মামা একটু কষ্টেসৃষ্টে নেমে বললেন : এ কোথায় আনলে ?

ড্রাইভার বলল : শান্ত দুর্গার মন্দির।

মামী নেমে বললেন : দুর্গার মন্দির ?

ড্রাইভার উত্তর দিল : হ্যাঁ, শান্ত দুর্গা। মহিষমর্দিনী দুর্গা নন, এখানে তাঁর শান্ত রূপ।

তার পরে একটা গল্প শোনাল আমাদের। একবার নাকি শিব আর বিষ্ণুর যুদ্ধ বেধেছিল। ব্রহ্মা ডেকে আনলেন দুর্গাকে। দুর্গা শান্ত করলেন যুদ্ধোন্মত্ত দুই দেবতাকে। তার পরে বলল : মন্দিরের ভিতরে তিন দেবতার মূর্তি দেখতে পাবেন। মাঝখানে চতুর্ভুজা জগদম্বা, আর দুপাশে শিব ও বিষ্ণু।

এই মন্দিরের ঐতিহাসিক কথাও শুনতে পেলুম। অনেক দিন আগে নাকি মার্মাগাওএর কাছে কদলীবন নামে একটা জায়গায় ছিলেন এই দেবী। পরে এইখানে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাতারার রাজা সাহু নরোরাম মন্ত্রীর কথায় এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শান্ত দুর্গাকে গোয়ার লোকে দেবী শান্তেরি বলে। গ্রামে গ্রামে তাঁর পূজা হয়। এই মন্দিরটি সর্বপ্রধান, আর একটি বড় মন্দির আছে ধারগালে। সে জায়গা বোধহয় উত্তর গোয়ায়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ একেবারে স্বতন্ত্র জাতের মন্দির, এ রকম মন্দির আমরা অন্য কোথাও দেখি নি। বলে না দিলে একে মন্দির বলেই ভাবা যায় না। সামনে একটি টাওয়ারের মত স্তম্ভ, এখানে বোধহয় খাম্বা বলে। দীপস্তম্ভ বলে আমার মনে হল। পিছনেও একটি টাওয়ার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটির ব্যাস অনেক বড়, কয়েকতলা উঁচু ও তার মাথায় একটি গম্বুজ। তার উপরেও চূড়া আছে একটি। সামনে

ভোগমণ্ডপ ও নাটমণ্ডপের মতো গৃহ আছে, দু পাশে তার জানলা আছে, কিন্তু উপরে ত্রিকোণাকৃতি ছাদ চালাঘরের মতো। চতুষ্কোণ ছাদবিশিষ্ট আরও দুটি ছোট শিখর আছে দু পাশে। সিঁড়ি দিয়ে মণ্ডপে উঠতে হয়, সবচেয়ে পিছনের টাওয়ার বোধহয় দেবতার গর্ভগৃহের উপরে।

মামা মামী মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু স্বাতি ঢুকল না, বলল: দাঁড়াও গোপালদা, এই মন্দিরের একখানা ছবি তুলে রাখি।

কিন্তু দক্ষিণের আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলে পড়েছিল। তাই সূর্য তার সামনে এসে পড়েছে। বলল: এধার থেকে তো হবে না, পিছনের দিকে যেতে হবে।

বলে সে মন্দিরের পিছনের দিকে চলে গেল।

আমি ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখলুম। না, আমাদের দেশের মন্দিরের সঙ্গে কোন মিলই নেই। পিছনের যে অংশ গর্ভগৃহ বলে মনে করছি, সেই রকমের গম্বুজ রাজা-মহারাজার বাড়িতে দেখেছি— রাজপ্রাসাদের যেমন, তেমনি গর্ভগৃহের উপরে তিনতলা উঁচু গম্বুজ। বাইরে থেকে সব কিছু দেখবার পরে আমরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেবতাকে প্রণাম করলুম।

কোনও পাণ্ডা নেই, দর্শনীর জন্যে ব্রাহ্মণের চাপ নেই। শান্ত সমাহিত পরিবেশে শান্ত দুর্গাকে প্রণাম করতে পেরে মন আমাদের প্রসন্ন হয়ে উঠল। মন্দিরের বাহিরে এসে আমরা আবার গাড়িতে বসলুম।

রামনাথের মন্দির নাকি খুব কাছে ছিল, কিন্তু ড্রাইভার আমাদের সেদিকে নিয়ে গেল না। রামনাথও অন্যত্র ছিলেন, পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই মন্দিরের সভামণ্ডপ নাকি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। সে কথা আমরা পরে জেনেছিলুম।

আরও দুটি মন্দির ছিল এই অঞ্চলে। মহালক্ষ্মী ও চন্দ্রনাথ মন্দির। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কদম্ব রাজাদের চন্দ্রনাথ মন্দির। পথে যেতে যেতে ড্রাইভার আমাদের দুটি মন্দির দেখিয়ে দিল। নাগেস আর গণপতির মন্দির। কিন্তু দাঁড়াল না। মামী বললেন: এ সব মন্দির কি দেখাবে না?

ড্রাইভার যেন বাঙলা কথা বুঝতে পারে, এমনি ভাবে বলল: শ্রীমহল্‌সা মন্দির দেখাব, আর শ্রীমঙ্গেশ মন্দির।

বলতে বলতেই সে পুরনো রাজপথে ফিরে এল। মনে হল যে আমরা মাইল দুই ভিতরে চলে গিয়েছিলুম। এবারে পানাজির দিকে চলতে চলতেই মহল্‌সা মন্দিরে এসে উপস্থিত হলুম।

ভিতরে ঢুকে স্বাতি বলল: এ যেন একই মন্দিরে আমরা আবার এলাম।

সত্যিই এই কথা মনে হয়। একই ধরনের স্থাপত্য, কোন পার্থক্য সহসা চোখে পড়ে না। আর তা দেখবার জন্যেও কারও উৎসাহ দেখলুম না। মামা বললেন: তাড়াতাড়ি দেখে নাও গোপাল, সন্ধ্যার আগেই আমাদের নতুন জায়গায় পৌঁছতে হবে।

তাড়াতাড়ি স্বাতি একখানা ছবি তুলে নিল, আর মামা মামী দেখে এলেন দেবতা। আমরাও তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে এলুম। কে একজন বলেছিল, এটা বিষ্ণুর মন্দির। কিন্তু পরে শুনলুম যে মহল্‌সা দেবী। ড্রাইভার বলল, মহল্‌সা হলেন কালী। মহল্‌সা নাম কেন হল, সে কথা জানতে পারলুম না।

কিন্তু মঙ্গেশ মন্দিরে পৌঁছে তাঁর সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী শুনতে পেলুম। পার্বতী যখন কঠোর তপস্যায় রত, তখন শিব হিমালয় থেকে অন্তর্হিত হলেন। পরে একটি বাঘ এল তাঁর সামনে। ভয়ে ভীত হয়ে পার্বতী স্মরণ করলেন শিবকে—ত্রাহি মাম্ গিরীশ, হে গিরীশ আমাকে রক্ষা কর। এই প্রার্থনাই কালক্রমে মাং গিরীশ থেকে মঙ্গেশ হয়েছে।

আরও একটি কথা শুনলুম এইখানে। ভারতবিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকারের নাম হয়েছে এই দেবতার নামে।

মহল্‌সা মন্দির থেকে মঙ্গেশ মন্দির খুব নিকটেই মনে হল। কিন্তু রাজপথ থেকে মন্দিরে পৌঁছতে অনেকটা পথ হাঁটতে হল। সরু পথ বলে যানবাহন সে পথে যায় না। পাহাড়ের ধারে এই মন্দির অনেকটা উঁচুতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল সব কিছু। তাল নারিকেলের মতো উঁচু গাছপালায় চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। অন্য একটি পথ এসেছে এইখানে, তারই উপরে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মামা বলে উঠলেন: কাণ্ড দেখেছ গোপাল, হতভাগা ড্রাইভার আমাদের কতটা পথ হাঁটাল?

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই গাড়িগুলি পানাজি থেকে সোজা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। আমাদের একটু ঘুরে আসতে হত বলে আমরা বড় রাস্তার উপরেই নেমেছি। কিন্তু তখন আমরা মন্দিরের সিঁড়ির কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলুম। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলুম।

সেই একই ধরনের মন্দির। সামনে দীপস্তম্ভ, পিছনে গর্ভগৃহ। মাঝখানে সভামণ্ডপ ভোগমণ্ডপ। আরও একটি নতুন নাম শিখলুম এখানে। সেটি হল অগ্রশালা। মন্দিরের চারিধার ঘিরে বারোটি অগ্রশালা আছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলুম যে যাত্রীদের বাসের জন্য ধর্মশালাকেই এখানে অগ্রশালা বলে। একটি পুষ্করিণীও আছে দক্ষিণ ভারতের মতো। উৎসবের সময় বাতি দেওয়া হয়।

মন্দিরে ঢুকে শিবের দর্শন পেলুম সবাই। এখানেই যাত্রী সবচেয়ে বেশি দেখলুম। একেবারে পাহাড়ের গায়ে পরিবেশটি সুন্দর। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মামা তাড়া

দিয়ে বললেন : না না, দেরি করা ঠিক নয়। এখনও অনেক পথ আছে।

ড্রাইভার বলল : বারো মাইলের বেশি।

সূর্য তখন পশ্চিমের দিকে অনেকটা হেলেছে, কিন্তু অস্ত যেতে দেরি আছে এখনও। পথের ধারে কোকা কোলা দেখে স্বাতি বলল : গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

সত্যিই কোকা কোলা। ভেজাল নয়। কোকা কোলার ফ্যাক্টরি আছে গোয়ায়। পথের ধারেই তা দেখতে পাওয়া যায়।

চলতে চলতে মামা বললেন : গোয়ার মন্দির বোধহয় সবই দেখা হয়ে গেল।

কিন্তু ড্রাইভার বলল : না। গোয়ায় অসংখ্য মন্দির। প্রত্যেক তালুকেই দু-একটা মন্দির আছে। আর এই পোণ্ডা তালুকেই সবচেয়ে বেশি মন্দির।

পোণ্ডা একটি ছোট শহর, মাড়গাও ও পানাজির মাঝপথে। তাইতেই এই মন্দিরগুলো দেখা সম্ভব হল।

মঙ্গেশ মন্দিরটিও যে আগে কুশস্থলী নামের একটি জায়গায় ছিল, তা জানলুম পরে। এই মন্দির অপসারণের কারণও জানলুম। ষাট ঘর গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ এসে এই দেশে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁরাই সঙ্গে করে এনেছিলেন এই সব দেবতা। ছোট ছোট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেই সব গ্রামেরও পছন্দ মতো নাম রেখেছিলেন। তার পর পর্তুগীজ দস্যুরা এল, নিজেদের ধর্ম স্থাপনের জন্য ভেঙে ফেলতে লাগল হিন্দুদের মন্দির। ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে নিয়ে সরে এলেন নিরাপদ স্থানে। নতুন জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি হল পুরনো দেবতার জন্যে।

আমাদের ট্যাক্সি তখন প্রশস্ত পথ ধরে পানাজির দিকে ছুটেছে।

২৬

মামা আমাকে নীরবে থাকতে দিলেন না, বললেন : মনে একটা খট্‌কা লেগেছে গোপাল, কিছুতেই জট ছাড়াতে পারছি না।

কোন কথা না বলে আমি তাঁর পরের কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মামা বললেন : ইংরেজ ভারত জয় করেছিল প্রায় দু শো বছর আগে, মানে প্রায় দু শো বছর তারা ভারতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু এখানকার পর্তুগীজরা কি আরও আগে এসেছিল ?

বললুম : তারা সাড়ে চার শো বছর গোয়ায় রাজত্ব করেছে।

স্বাতি বলল : হিসেবের ভুল হচ্ছে না তো গোপালদা ?

বললুম : না। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা যখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে এসে উপস্থিত হলেন, চোদ্দ বছরের বালক বাবর তখন সমরখন্দ রাজ্য জয় করেও বিতাড়িত হন। ভাস্কো-ডা-গামা যে ভারত আবিষ্কারে বেরোন নি, তা জানো। তিনি কলম্বসের মতো আমেরিকায় যাচ্ছিলেন, এসে উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষে। কালিকটের নিকটে তিনি পদার্পণ করলেন। তার পরে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা। পর্তুগীজরা প্রথমে বাণিজ্যে প্রাধান্য অর্জনের চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু কয়েক বছর পরে অলবুকার্ক এলেন এদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। প্রথমে মিশর ও তুরস্ক দেশের বণিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। গুজরাতের মুসলমান বণিকদের সঙ্গেও যুদ্ধ করলেন। এই সব জলযুদ্ধে জয়ী হল পর্তুগীজরা। গোয়া জয় হল ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে, আঠারো বছর পরে বম্বের সলসেটি জয়, তার কয়েক বছর পরে বেসিন। এর পরে তাদের দস্যুবৃত্তিই প্রধান হয়ে উঠল। বিজাপুর রাজ্যের বন্দরগুলি

তারা পুড়িয়ে দিল, লুঠতরাজ করতে লাগল কোঙ্কণ উপকূলে। দেখতে দেখতেই তারা বাঙলার হুগলি ও চট্টগ্রামে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

নিজেদের দোষেই এরা জনসাধারণের বিরাগভাজন হল। এরা ছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান, মুসলমানদের চেয়েও বেশি গোঁড়ামি ছিল তাদের। তাই হিন্দু ও মুসলমানের উপরে সমান অত্যাচার শুরু করল। গোয়ার ইনকুইজিসন কালাপাহাড়ের মতো ধ্বংস করল হিন্দুর মন্দির ও দেবতা। জলপথে তাদের দস্যুবৃত্তির জন্য প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল সকলের। কিন্তু এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউই কিছু করতে পারছিল না। এমন কি বিজাপুর ও আহমদনগরের সুলতানরাও যুদ্ধ করে হেরে যাচ্ছিল।

তারপর ?

বলে মামা কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

বললুম : তারা সায়েস্তা হল শাহজাহান বাদশাহ রেগে যাবার ফলে। চারটি জাহাজ ভর্তি মুসলমান মক্কায় হজ করতে গিয়েছিল, সেই জাহাজ অধিকার করল পর্তুগীজরা। সেই খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন, তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত পর্তুগীজকে জেলে ঢোকাও, বন্ধ করে দাও সমস্ত গির্জা, আর প্রকাশ্যে তাদের কোন ধর্মানুষ্ঠান চলবে না। আর তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার জন্যে ওলন্দাজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু তবু এই পর্তুগীজরা খুব বেশি কাবু হয় নি। ভারতীয়দের উপরে তারা নানা রকমের অত্যাচার করত। ক্রীতদাসের ব্যবসা ছিল তাদের। হিন্দু মুসলমানের অনাথা শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টান করত। তার পরে শাহজাহান বাদশাহর কোপদৃষ্টিতে পড়ল তারা। মমতাজ মহলের দুই বাঁদীকে তারা আটক করেছিল। বাদশাহ কাশেম খাঁকে বললেন, বাঙলার সুবেদার নিযুক্ত করলাম তোমাকে, সেখান থেকে পর্তুগীজদের উচ্ছেদ কর। কাশেম খাঁ

এসে হুগলি অবরোধ করলেন, তিন মাস পরে দখল করলেন হুগলি। শহর বিধ্বস্ত করে চার হাজার পর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দিলেন বাদশাহর কাছে। বার্নিয়ারের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে এই সময়ে বাঙলায় পর্তুগীজের অত্যাচারে অশান্তির শেষ ছিল না। নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জের অনেক জায়গা থেকে লোক-জন পালিয়ে গিয়েছিল, অরণ্যে পরিণত হয়েছিল অনেক গ্রামাঞ্চল।

স্বদেশের বাইরে পর্তুগীজরা অনেক জায়গা অধিকার করেছিল। ইংরেজের চেয়েও বড় শক্তি হতে পারত তারা। কিন্তু ধর্মের নামে অত্যাচারের জন্যেই তাদের পতন আরম্ভ হয়েছিল। তার পরে নিজের দেশে রাজনৈতিক গোলমালের জন্যে সেই পতন সম্পূর্ণ হল। ভারতে শুধু তিন জায়গায় তাদের অধিকার রয়ে গেল—এই গোয়ায়, আর গুজরাতের দিউ ও দমনে।

কথায় কথায় অনেকটা পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছিলুম। হঠাৎ মনে হল যে আমরা একটা পরিত্যক্ত লোকালয়ের কাছাকাছি এসে গেছি। প্রচুর কৌতূহল নিয়ে চারি দিকে তাকাতেই ড্রাইভার বলল : ভেল্হা গোয়া।

ভেল্হা শব্দটি আমার কাছে নতুন। বোধহয় তা অনুমান করে ড্রাইভার বলল : ওল্ড্ গোয়া। পানাজি এখান থেকে সাড়ে সাত মাইল।

মামা আকাশের দিকে তাকালেন। অন্ধকার নামবার আগেই পানাজি পৌঁছতে পারবেন কি না, সেই কথাই বোধহয় ভাবলেন। তার পরে বললেন : এখানে পরে এলে হয় না ?

স্বাতি বলল : এখানে কী দেখবার আছে জিজ্ঞেস করে নাও না গোপালদা।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। ড্রাইভার নিজেই বলল : ব্যাসিলিকা অব বম্ জিসাস্ আর সি ক্যাথিড্রাল দেখাব আপনাদের।

আমি বললুম : বেশি সময় লাগবে না তো ?

বাইরে থেকে দেখলে আর কতটুকু সময় লাগবে ?

ভিতরে কিছু দেখবার নেই বুঝি ?

ড্রাইভার বলল : আছে ব্যাসিলিকার ভিতরে। কিন্তু তা তো দেখতে পাবেন না।

বলে যেখানে তার গাড়ি দাঁড় করাল, তা ব্যাসিলিকা না ক্যাথিড্রাল, তা বুঝতে পারলুম না। মামা বললেন : ভিতরে যাবার দরকার নেই; বাইরে থেকেই দেখে নাও।

দূর থেকেই আমরা এই পুরাতন গির্জাটি দেখলুম। দোতলা বাড়ির উপরেও এমন ভাবে একখানি ঘর আছে যে তিনতলা বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। বাঁ দিকে চারতলা একটি টাওয়ার। ডান দিকে সে রকম কোন টাওয়ার নেই দেখে ন্যাড়া বলে মনে হচ্ছিল। ড্রাইভার বলল যে প্রায় দু শো বছর আগে সে দিকটা ভেঙে পড়েছে। একবার ঠিক হয়েছিল যে সে দিকটা নতুন করে গড়া হবে। তার জন্যে দু লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি দরকার। বিয়ে প্রভৃতি কাজে ট্যাক্স নিয়ে সেই টাকা তোলা হবে বলেও স্থির হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তা সম্ভব হয় নি।

গির্জার পিছন দিকেও ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছিল বলে আমি ড্রাইভারের দিকে তাকালুম। সে বলল : এরই নাম সি ক্যাথিড্রাল।

সি ক্যাথিড্রাল মানে ? সি কি সমুদ্র ?

ড্রাইভার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু পরে জেনেছিলুম যে এস্. ই. সি। সি প্রাইমাসিয়াল ডি গোয়া। সবার কাছে সি ক্যাথিড্রাল নামেই পরিচিত।

অন্ধকার হবার আগেই আমরা পানাজি পৌঁছতে চাই বলে গাড়ি থেকে আমরা আর নামলুম না। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বলল : এই গির্জা তৈরির একটি গল্প আছে। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আলবুকার্ক যেদিন এই জায়গা দখল করেন, সেদিন ছিল

সেন্ট ক্যাথারিনের উৎসবের দিন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আলবুকার্ক সেদিন এইখানে তাঁর সহকর্মীদের জড়িয়ে ধরেন। আর হাঁটু গেড়ে বসে ধন্যবাদ দেন সেন্ট ক্যাথারিনকে। আর সেই দিনই সংকল্প করেন যে নদীর ধারের এই জায়গাতেই একটি গির্জা নির্মাণ করবেন সেন্ট ক্যাথারিনের নামে। দিন কয়েক পরেই তিনি আদেশ জারি করলেন।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : এক দিনেই এত বড় একটা গির্জা তৈরি হয়ে গেল!

ড্রাইভার বলল : না। এক দিনে হয় নি, পঁচাত্তর বছর ধরে এই গির্জাটি তৈরি হয়েছে। প্রথমে একটি ছোট চ্যাপেল তৈরি হয়েছিল, আর একটি অল্টারের সামনে ছবি টাঙানো হয়েছিল সেন্ট ক্যাথারিনের। সেদিনের সেই চ্যাপেল থেকে এই ক্যাথিড্রাল হয়েছে। গাইডরা বলে, এর বাইরেটা আধা টাস্কান ও আধা ডোরিক স্টাইল, আর ভেতরটা মোজাইক—করিন্থিয়ান।

বলতে বলতেই সে আর একটি গির্জার সামনে গাড়ি এনে দাঁড় করাল। এই গির্জাটি চারতলা উঁচু আর ডান দিকে আরও বাড়ি ঘর আছে তিনতলা উঁচু। সামনে নারকেলের গাছ। ড্রাইভারের দিকে তাকাতেই সে বলল : এরই নাম ব্যাসিলিকা অব বম্ জিসাস্।

পিছন থেকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ব্যাসিলিকা মানে কী গোপালদা?

বললুম : গির্জারই অনেক নাম—চ্যাপেল চার্চ ব্যাসিলিকা মাইনর ক্যাথিড্রাল, আর এরই মর্যাদা অনুযায়ী পাদ্রি সাহেব। বড় বড় গির্জায় থাকে বিশপ আর্চ বিশপ, আর রোমে আছেন পোপ।

রোমের নাম শুনে ড্রাইভার বলল : এই ওল্ড্ গোয়াকে আগে রোম অব দি ঈস্ট বলত।

পরে আমি জেনেছিলুম যে তিন বছর আগে ডক্টর ফ্রায়ার

নামে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন যে সি ক্যাথিড্রালের মতো জমকালো গির্জা গ্রেট বৃটেনে আছে কিনা সন্দেহ। এর প্রায় দেড় শো বছর পরে ডক্টর বুকানন বলেছিলেন যে ইয়োরোপের যে কোন বড় শহরে এটি গর্বের বস্তু হতে পারে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এই গির্জা তৈরির কোন গল্প নেই?

আমি ড্রাইভারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল: না। তবে শুনেছি যে প্রায় চার শো বছর আগে এক ভদ্রলোকের দানের টাকায় এই গির্জাটি তৈরি হয়েছে। এর দুটি অংশ আছে। একটি হল হোলি স্যাক্রামেণ্ট আর একটি ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সমাধি। একটি রূপোর কাস্কেটের ভিতরে তাঁর দেহ রক্ষা করা আছে। বিশেষ দিনে তা দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাতি বলে উঠল: মমি!

কিন্তু ড্রাইভার এ কথায় কোন উত্তর দিল না। গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে সে বলল: টাস্কানার গ্র্যাণ্ড ডিউকের টাকায় এই সমাধি তৈরি হয়েছে।

পথের ধারে এক জায়গায় দেখলুম যে বোগেন ভিলার লাল ফুলে চারি দিক আলো হয়ে আছে। এক সঙ্গে এত ফুল আমি কখনও দেখি নি।

প্রধান রাজপথ ধরে পানাজির দিকে চলতে চলতে ড্রাইভার বলল: ক্যাথিড্রালে এখনও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতি দিন প্রার্থনা হয়। আর শুনে আশ্চর্য হবেন যে সেখানকার পাদ্রিরা সবাই এ দেশেরই মানুষ।

হঠাৎ এক সময় যে আমরা নদীর ধারে পৌঁছে গিয়েছিলুম, তা খেয়াল করি নি। ডান দিকে নদী, আর বাম দিকে গাছে গাছে আচ্ছন্ন শীতল পরিবেশ। মনে হল যে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি নদীর ধারে ধারে। পথের উপরে আলো কমে এসেছে, বাতাস

আসছে নদীর দিক থেকে। কেন জানি না, এক রকমের অদ্ভুত আনন্দে মন আমার ভরে গেল।

স্বাতিও যে ঠিক আমার মতোই ভাবছিল, তা বুঝতে পারলুম তার কথা শুনে। সে বলল: বেশ চমৎকার জায়গাটি, তাই না?

কিন্তু মামার মনে তখন দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন: কোথায় উঠবে, তা কি ঠিক করেছ?

বললুম: টুরিস্ট হস্টেলে জায়গা পেলে অন্য কোথাও যাব না।

হস্টেল মানে?

বললুম: নাম হস্টেল। কাজে বোধহয় হোটেল। বিরাট ব্যাপার বলেই বোধহয় টুরিস্ট বাংলো নাম হয় নি।

সত্যিই তাই। খানিকটা এগিয়েই আবার লোকালয় দেখা গেল। একটি দুটি করে বাড়ি ঘন বসতিতে পরিণত হল। যে নদীর ধার দিয়ে আসছিলুম, তার নাম মাণ্ডবী নদী। সহসা দেখতে পেলুম যে নালার মতো চওড়া একটি ছোট নদী এসে মাণ্ডবী নদীতে পড়েছে। তার উপরের পুল পেরিয়েই দেখতে পেলুম যে পানাজি শহরের কর্মব্যস্ত এলাকায় আমরা পৌঁছে গেছি।

টুরিস্ট হস্টেলে যাবার কথা আমি আগেই বলেছিলুম। বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়ে এগিয়ে মোড় ফিরেই ড্রাইভার এনে একটি নতুন ধরনের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বলল: জায়গা আছে কিনা জেনে আসুন।

আমি বললুম: আপনারা বসে থাকুন, আমি দেখে আসছি।

কিন্তু স্বাতি আমার সঙ্গেই নেমে পড়ল। বলল: তুমি পারবে না গোপালদা, আমি যাচ্ছি।

বলে তরতর করে অনেক কটা সিঁড়ি ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমি এগোলুম তাকে অনুসরণ করে।

ভারি অদ্ভুত এই হস্টেলের নিচের তলাটা। কয়েকটি দোকান, টুরিস্ট অফিস এক দিকে, অন্য দিকে রিসেপ্সনিস্ট বসেছে।

শাড়ি-পরা একটি মেয়ে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করল বাঁ হাতের কাউন্টারে। স্বাতি আমার দিকে তাকাল, আমি প্রশ্ন করলুম ইংরেজীতে : আমাদের ছখানা ডবল বেড ঘরের দরকার।

মেয়েটি জবাব দিল : পাবেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তিন বেডের ঘর নেই একখানা ?

মেয়েটি এবারে হেসে বলল : তাও আছে।

আর একটা সিঙ্গল বেডের ঘর ?

যা চাইবেন, তাই পাবেন।

স্বাতি বলল : তবে তাই দিন আমাদের। এক ঘরে আমরা তিনজন থাকব আর এক ঘরে একজন।

মেয়েটি ছুটি চাবি দেওয়ালের বোর্ড থেকে তুলে নিয়ে একটি বেয়ারার হাতে দিল। ঘরের নম্বর বলে মালপত্র পৌঁছে দিতে বলল।

আমরা লক্ষ্য করি নি যে ড্রাইভার এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বেয়ারাকে সে ডেকে নিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : দোতলায় আমাদের ঘর দিলেন তো ?

মেয়েটি বলল : না। দোতলায় আমাদের রেস্তোরাঁ। আপনাদের চারতলায় দিয়েছি।

মামার কথা ভেবে আমি আঁতকে উঠলুম। স্বাতি বোধহয় মামা মামীকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, সেও থমকে দাঁড়াল। আর মেয়েটি আগের মতো হেসে বলল : ভয় নেই, আমাদের লিফ্‌ট্‌ আছে। লিফ্‌ট্‌ না বেগড়ালে আপনাদের ভাবনা নেই।

লিফ্‌ট্‌ বেগড়ায় বুঝি ?

সচরাচর বেগড়ায় না, কিন্তু কলকব্জার ব্যাপার তো।

লিফ্‌টের কথা শুনেই স্বাতি মামা মামীকে ডেকে আনল। তাদের খাতায় আমরা নাম লিখে দিলুম। ভাড়া এমন কিছু বেশি নয়। জানা গেল যে সব ডবল বেড রূমে একখানা খাট বেশি থাকে।

একজনের ভাড়া অতিরিক্ত দিয়ে তিনজন করা যায়। মামী এই ব্যবস্থায় খুব খুশী হলেন। আর স্বাতি বলল: এইজন্তেই গোপালদার হাতে ছেড়ে দিই নি।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে আমরা উপরে চলে গেলুম। বেয়ারা মালপত্র নিয়ে এল। বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় বদলে দিয়ে বেড কভার দিয়ে ঢেকে দিল বিছানা। তোয়ালেও দিয়ে গেল বাথ-রূমে। এই বাথ রুম দেখে মামী খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা আছে। প্রচুর জল, খুব পরিচ্ছন্ন চারি দিক। বাহিরের বারান্দায় দাঁড়ালে মাণ্ডবী নদী দেখা যায় খানিকটা দূরে। সামনে রাজপথের ধারে সুন্দর বাগান। খানকয়েক চেয়ার রাখা আছে বারান্দায়। সন্ধ্যার বাতাস আসছে ঝির ঝির করে। মামাও খুশী হলেন, বললেন: একটু চা পেলে মন্দ হত না।

স্বাতি বলল: এই কাজটি গোপালদা ভাল পারে।

কী রকম?

ভেবেছিল কেউ শুনতে পায় নি।

আমি বললুম: আমাদের রূম-বয়কে বলে দিয়েছি। সে ব্যবস্থা করতে গেছে।

খুশী হয়ে মামা বললেন: তোমার ঘরটি কেমন হল?

বললুম: দরজার সামনেই আমার ঘর।

তার পরে বুঝিয়ে দিলুম যে লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরিয়ে একটি লম্বা বারান্দা, তার দুধারে সারি সারি ঘর। এক ধারে সব ডবল বেড, অন্য ধারে সিঙ্গল বেড ঘর। ডবল বেড ঘরগুলো রাস্তার ধারে বলে ওধারেও একটি সরু বারান্দা আছে।

বলতে না বলতেই আমাদের চা এসে গেল। মামা একখানা গদির চেয়ারে বসে পকেট থেকে পাইপ ও তামাক বার করলেন। বললেন: এই জন্তেই গোপালকে এত খাতির করি।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল।

চা শেষ করে স্বাতি বলল : বসে বসে গল্প করলে চলবে না গোপালদা, গোয়ায় আমাদের সময় খুব কম।

মামা বললেন : এখনই কোথাও বেরোবে নাকি ?

স্বাতি বলল : না বেরোলে চলবে কেন বাবা ? কালকের ব্যবস্থা তো আজই করে রাখতে হবে।

মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। মুখে খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন : তা বটে।

তার পরেই বললেন : একা বেরিয়ো না, গোপালকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বাহিরে তখন অন্ধকার গভীর হয়েছে, ঘরে বাতি জ্বেলেছি আমরা। মামীর চোখে খানিকটা দুর্ভাবনা যেন দেখতে পেলুম। তাই বললুম : বাইরে যাওয়া এখন ঠিক হবে না। রিসেপসন অফিসেই খবর সংগ্রহ করে ফিরে আসব।

মনে হল, মামী খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু স্বাতি আপত্তি করল, বলল : না না, ফাঁকি দিলে চলবে না। এরা কিছু বলতে না পারলে বাইরে গিয়েই খবর সংগ্রহ করতে হবে, দরকার হলে কাল সকালের জন্যে ট্যাক্সিও ঠিক করে আসতে হবে।

বাধা দিয়ে কোন ফল হবে না জেনে মামী বললেন : বেশি দেরি কোরো না যেন।

অত্যন্ত বাধ্য মেয়ের মতো মাথা দুলিয়ে স্বাতি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লিফ্‌ট্‌ তখন উপরে ছিল না, আমি বেল বাজাতে হাত

বাড়িয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি বলল: এসো না গোপালদা, চারতলা থেকে নামতে কেমন লাগে দেখি।

বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। আমিও নামলুম তার পিছনে।

এই সিঁড়ির পাশেই রিসেপসনিস্টের কাউণ্টার। স্বাতি তার সামনে এসে বলল: আপনাদের ব্যবস্থা খুব পছন্দ হয়েছে। এবারে কী দেখতে হবে, আর কেমন করে দেখব, তাই বলুন।

মেয়েটি কিছু কাগজ পত্র বার করল। টুরিস্ট লিটারেচার। একখানা কাগজ খুলে বলল: আমাদের তিনটে কণ্ডাক্টেড টুর আছে। তাতে দু দিনেই সব দেখতে পাবেন।

বলে কাগজখানি স্বাতির হাতে দিতেই আমরা এক নিঃশ্বাসে তা পড়ে দেখলুম। এক নম্বর টুর সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে বারোটা, ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। আর দু নম্বর টুর দুপুর আড়াইটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা, ভাড়া চার টাকা। সকালে দেখাবে পানাজি শহর, ডোনা পাওলা অন্তরীপ, গ্যাস্‌পার ডায়াস বীচ, ওল্ড্ গোয়ার গির্জা আর পোণ্ডার মন্দির।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: এ সব আর দেখতে চাই নে।

বলে দুপুরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখলুম। আল্‌টিন্‌হো পাহাড় থেকে পানাজির দৃশ্য, গুইরিম নামের একটি টিলা, মাপুসা শহর ও কলংগুটে বীচ।

স্বাতি বলল: এটা চলতে পারে। কিন্তু দুপুর বেলায় বেরোতে বাবা রাজী হবেন না।

তারপরে আমরা দ্বিতীয় দিনের টুর দেখলুম। সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে, ভাড়া ছ টাকা। প্রথমে পিলার নামে একটা মিশনারীদের জায়গা, তারপরে ভাস্কো-ডা-গামা শহর দেখিয়ে নিয়ে যাবে মার্মাগোয়া বন্দর। সেখান থেকে মাড়গাও হয়ে কোল্‌ভা বীচ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে।

এই কাগজের উপরে একটা মানচিত্রও ছিল। তিন রকমের লাইন দিয়ে এই টুরগুলি দেখানো আছে। ভাল করে দেখে স্বাতি বলল : এটাও আমাদের চলবে না।

কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : মাড়গাও দেখেছি, আর ভর দুপুরে সমুদ্রের ধারে যায় পাগলে।

হেসে বললুম : সত্যি কথা।

অতএব ?

প্রোগ্রাম নিজেদেরই করতে হবে।

স্বাতি বলল : আমরা কি কিছু কাগজপত্র পেতে পারি ?

মেয়েটি বলল : এগুলো আপনাদের জন্যেই।

দাম ?

দাম লাগবে না। গোয়া দমন দিউএর গভর্নমেণ্ট এগুলো বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য ছেপেছে। পাশের বইএর দোকানে একখানা গাইড বই বিক্রি হয়। আর ঐ টুরিস্ট অফিস মহারাষ্ট্র সরকারের। এখন বন্ধ আছে, কাল ওদের বই পাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনাদের টুরিস্ট অফিস ?

মেয়েটি বলল : কাছেই। কিন্তু সেও দিনের বেলায় খোলা পাবেন।

বলে পথঘাটের হদিস জানিয়ে দিল। হস্টেল থেকে নেমে বাঁ দিকে চলতে হবে। প্রথমে যে সুন্দর দোতলা বাড়ি, তার নাম আইডালকাও প্যালেস, এখন গোয়ার সেক্রেটারিয়েট। তারই সামনে আবে ফেরিয়ার স্ট্যাচু। ডান দিকে মোড় নিলে মণ্ডিটী নদী। টুরিস্ট অফিস যেতে হলে সোজা যেতে হবে।

আবে ফেরিয়া কে ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। কিন্তু উত্তর দিল মেয়েটি।

বলল : গোয়ার একজন পাদ্রি, বিদ্বান ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন তিনি। আর হিপনটিজমের পদ্ধতি আবিষ্কার করে নাম করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডুমা পড়েছেন তো? তাতে নাকি এর উল্লেখ আছে।

এর বেশি মেয়েটি জানে না। স্বাতিরও গল্প শোনার আগ্রহ কম। বলল : চলে এস গোপালদা।

বলে এক রকম লাফিয়েই নেমে এল ফুটপাথে। অত্যন্ত লঘু পায়ে এখন সে হাঁটছে। মুক্তির আনন্দ তার চলার ছন্দে। কিন্তু কেন এই আনন্দ সে তা বলল না।

একটুখানি এগিয়েই আমরা সেক্রেটারিয়েটের সামনে পৌঁছে গেলুম। দোতলা বাড়ির উপরে চালার মতো লাল রঙের টালির ছাদ। দরজা জানলা বন্ধ। কোন বারান্দা নেই সামনে, ভিতরের কোন আলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না। সেক্রেটারিয়েট বলতে আমরা কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং বুঝি, কিংবা ঐ ধরনের বিরাট কিছু। একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদে গোয়ার এই সেক্রেটারিয়েট দেখে আমরা আশ্চর্য হলুম। একদা বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন, সাড়ে তিন শো বছর আগে নিজের বাসোপযোগী করে নিয়েছিলেন এক পর্তুগীজ ভাইসরয়।

কিন্তু স্বাতি দাঁড়াল না, এগিয়ে গেল আবে ফেরিয়ার স্ট্যাচুর দিকে। এখানেও অভিনবত্ব আছে। যে রকম স্ট্যাচু দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এ সে রকম কিছু নয়। আবে ফেরিয়া এখানে একা নন, একটি নারীকে তিনি হিপ্‌নটাইজ করছেন, সেই দৃশ্য। ধরাশায়ী নারী, বাঁ পা ঈষৎ উঁচু, ডান হাতখানা ডান পায়ের উপর, আর মাথা উঁচু করে আছে অনেকটা। আবে ফেরিয়া তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দু হাত প্রসারিত করে। একটি তেমাথা পথের উপরে এই মূর্তি উঁচু থামের উপরে।

তার চারি দিক ঘিরে পথ। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। স্বাতি বলল : এদের পোশাক দেখেছ গোপালদা ?

বললুম : মেয়েটির পরনে বোধহয় শাড়ি।

মাথায় খোঁপাও আছে।

আর আবে ফেরিয়ার জামার উপরে একখানা চাদর জড়ানো।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ কত দিনের পুরনো গোপালদা ?

বললুম : আলেকজাণ্ডার ডুমার সমসাময়িক হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। সে সময়ে ইয়োরোপের লোক নাকি এঁকে হিপ্‌নটিজমের জনক বলে মানত। কাউন্ট অব মন্টিক্রস্ট বইএ এঁর উল্লেখ আছে।

স্বাতি বলল : পাথরের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে না।

বললুম : ব্রোঞ্জের মনে হচ্ছে।

নদীর দিকে এগিয়ে স্বাতি বলল : আমাদের বাঙলায় মহাত্মাজীকে দাঁড় করিয়েছে লাঠি হাতে, আর নেতাজীকে বসিয়েছে ঘোড়ার উপরে। কিন্তু এমন আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে নি।

বললুম : সে মূর্তিও খারাপ নয়। চরিত্রের দৃঢ়তা তাতে প্রকাশ পেয়েছে।

আর কোন কথা হবার আগেই আমরা নদীর ধারে পৌঁছে গেলুম। প্রশস্ত নদী, তার কূলে কূলে জল, ওপারে পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে। এখানে সেখানে বাতি জ্বলছে দু-একটা। যে রাস্তায় আমরা পৌঁছলুম তা আরও প্রশস্ত, আরও জনবহুল। স্বাতি বাঁ হাতে ফিরে হাঁটতে লাগল।

লোকজন এই দিকেই বেশি, বেশ একটু ব্যস্ত ভাব। এক জায়গায় এসে তার কারণ বুঝতে পারলুম। ফেরি ঘাট এইখানে। নৌকো ছাড়ছে ওপারে যাবার জন্যে। কলে চলে, কিন্তু আমাদের দেশের স্টীম লঞ্চের মতো নয়। এ নৌকোয় দু-চারখানা মোটর গাড়িও পার হতে পারে যাত্রীদের সঙ্গে।

তারপরেই দেখতে পেলুম যে ওপার থেকে এই রকমের একখানা নৌকো এগিয়ে আসছে। এই নৌকো ভেড়বার জন্তে পাশে আর একটা জায়গা আছে। পথের ধারেই টিকিটের ঘর। যাত্রীরা টিকিট কেটে নেমে যাচ্ছে নৌকোয়। দেখতে দেখতেই নৌকো ছেড়ে দিল। আর ওধারের ঘাটে এসে ভিড়ল আর একখানি নৌকো। স্বাতি বলল : ভারি মজার ব্যাপার তো।

মজার চেয়ে তৎপর বেশি। নৌকো এসে দাঁড়াতে আর ছাড়তে সময় লাগছে না একটুও। নৌকো এসে ঘাটে ভিড়তেই একটা লোহার র‍্যাম্প ফেলে দিচ্ছে, সড় সড় করে নেমে আসছে মোটর গাড়ি, তার পরেই বাঁধানো রাস্তার উপরে উঠে আসছে। যাত্রীরা নিঃশব্দে নামছে। নতুন যাত্রী উঠছে, কিন্তু এবারে কোন গাড়ি উঠল না, আর একখানা নৌকো এসে ভিড়বার আগেই এ নৌকো ছেড়ে দিল।

স্বাতি যে ঘড়ি দেখছিল, আমি তা বুঝতে পারি নি। বলল : দু মিনিট সময় লাগে।

কিসের সময় ?

নদী পার হতে।

খানিকটা তফাতে আমরা জাহাজের জেঠি দেখতে পেলুম। সেও নদীর ধারে বাঁধানো ঘাটের মতো। একটা সরু পথ নদীর ভিতরে এগিয়ে গেছে। এখানেই যে জাহাজ এসে ভিড়বে তা বোঝা যাচ্ছে। স্বাতি বলল : দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা।

বলে রাস্তার আলোয় তার হাতের একখানা বই খুলে একখানা মানচিত্র বার করল। সেই মানচিত্রে আমি পানাজির অবস্থান দেখতে পেলুম এক নজরে। ওল্ড্ গোয়া ও পানাজির মধ্যে আরও দুটি শাখা নদী এসে মাণ্ডবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর এর পরেই তার সমুদ্রসঙ্গম। এপারে পানাজি ও ওপারে বেতিম নামের একটি ছোট জায়গা। বেতিমের উত্তরে মাপুসা শহর,

আর পশ্চিমে কলংগুটে বীচ। রিস মেগস ও আগোয়াডা নামে দুটি দুর্গও আছে মাণ্ডবী নদীর ধারে। এপারে একটুখানি এগিয়ে সমুদ্রের ধারে গ্যাসপার ডায়াস বীচ ও ডোনা পাওলা শৈলান্তরীপ মার্মাগাও উপসাগরের তীরে। শেষ বিন্দুতে ক্যাবো রাজনিবাস।

কিছু দক্ষিণে জুয়ারি নামে আর একটি নদী এসে মার্মাগাও উপসাগরে পড়েছে। তারই ধারে ভাস্কো-ডা-গামা শহর ও মার্মাগাও বন্দর। ডোনা পাওলায় দাঁড়িয়ে এই শহর ও বন্দর দেখা যাবে বলে মনে হচ্ছে। ফেরি থাকতে পারে, কিন্তু পথ গেছে ঘুরে সমগ্র উপসাগরটি বেষ্টন করে। জুয়ারি নদীও পার হতে হবে মাণ্ডবী নদীর মতো।

সহসা স্বাতি এই মানচিত্র বন্ধ করে বলল: কালকের প্রোগ্রাম আমাদের তৈরি হয়ে গেল।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: কী রকম?

স্বাতি বলল: খুব সোজা। সকাল বেলায় ব্রেকফাস্টের পরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসব এই ফেরি ঘাটে। ওপারে ট্যাক্সি না থাকলে এপারের ট্যাক্সি নিয়েই মাপুসা আর কলংগুটে দেখে আসব। সময় থাকলে আলটিনহো পাহাড় দেখে একটা ভাল গোয়ান রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ। বিকেলে ডোনা পাওলা আর গ্যাসপার ডায়াস বীচ।

তারপর?

তার পরের ভাবনা পরে ভাবব।

বলেই সে ফেরার পথ ধরল।

আমি ভেবেছিলুম যে এবারে হয়তো কোনখানে সে বসবে। কিন্তু তা বসল না, হন হন করে হেঁটে চলতে লাগল। ফেরি ঘাটের কাছেই একজনকে জিজ্ঞাসা করল: ওপারে ট্যাক্সি পাওয়া যায়?

প্রথমটায় সে ভদ্রলোক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে সামলে নিয়ে বললেন: অপর্যাপ্ত। কিন্তু বেশি দিন পাবেন না।

কেন ?

দেখতে পাচ্ছেন না, নদীর ওপরে পুলটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। যানবাহন চলাচল শুরু হলেই বেভিমের সমস্ত ট্যাক্সি পানাজিতে চলে আসবে।

অন্ধকারে আমরা কোন পুল দেখতে পাই নি। এই বারে তাঁর কথা শুনে সেই দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দীর্ঘ একটি সেতু নদীর এপার-ওপার যুক্ত করেছে। বাকি কী আছে, তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক নদীর দিকে নেমে গিয়েছিলেন। আর আমরাও দেরি না করে হস্টেলে ফিরে এলুম।

রিসেপসনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল সিঁড়ির উপরে। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ দেশের খাঁটি খাবার কোথায় পাওয়া যাবে ?

মেয়েটি বলল : আমাদের রেস্তোরাঁতেও খাবার ভাল, কিন্তু দাম একটু বেশি। মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে ক্যাপুসিনায় খেয়ে আনন্দ পাবেন।

স্বাতি বলল : এই নামটি মনে রেখো গোপালদা, কাল আমরা লাঞ্চ খাব।

রাতে আমরা হস্টেলের রেস্তোরাঁতেই ডিনার খেলুম। টেবিলে স্বাতি বলল : আজ একটু বেশি খরচ হবে মা, কিন্তু উপায় নেই।

বলে মেনুর বই নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। তার পরে নানা আজগুবি নামের খাবার অর্ডার দিল।

বেয়ারা চলে যাবার পরে আমাকে বলল : এই সব নাম মনে রেখো গোপালদা, তোমার কাজে লাগতে পারে। অ্যাপেটাইজারকে এরা Hors D'ocuvres বলে, সুপকে বলে Potages, Poisson-কে বিষ ভেবো না, এ হল Sea food.

সহাস্যে মামা বললেন : এ সব কি পর্তুগীজ কথা নাকি!

নিশ্চয়ই তাই।

স্বাতি বলল: কোল্ড্ বুফে হুম মেয়োনেজ্, চিকেন রোস্ট প্রভৃতি এন্ট্রিস্। গ্রীক ইটালিয়ান খাবারও আছে—ইটালিয়ান রেভিওলি নেপোলিটান। কিন্তু আমি খাঁটি এ দেশী খাবারের অর্ডার দিয়েছি—ভিন্দালু বাল্চাও বাফাদ আর বোর্দালিস এক এক প্লেট।

মামী বললেন: এ সব খাবার খেতে পারবে তো!

স্বাতি হেসে বলল: সব মাছ। পম্ফ্রেট প্রন সী কিং আর ম্যাক্রেল। সঙ্গে ভাত দিতে বলেছি। সবাই আমরা সব প্লেট থেকে তুলে তুলে খাব, যার যেটা ভাল লাগে।

ভারি সুন্দর সাজানো এদের খাবার ঘর। দেওয়ালে নানা রকমের কারুকার্য, বাতিও নানা রকম। অনেক লোকজন খাচ্ছে। ড্রিঙ্কস্এর ব্যবস্থাও আছে। তারই জন্যে বেয়ারাদের ছুটোছুটি বেশি।

আমাদের খাবার আসতে একটু সময় লাগল। স্বাতি জিজ্ঞাসাবাদ করে নাম ধাম জেনে নিল। ভিন্দালু নাম কলকাতায় শুনেছি, কোর্মা কালিয়ার মতো একটা নাম। বাল্চাও বাফাদ বোর্দালিসও এই ধরনের নাম। সী কিং মাছের একটা পিসেই প্লেট ভরে গেছে, তেমনি একটি গোটা পম্ফ্রেট। ম্যাক্রেল মাছের দুটো টুকরো পাওয়া গেছে, আর প্রন ছোট চিংড়ি, সেটা ভাগ করে খাওয়া সম্ভব। এই সব মাছের দিশী নামও স্বাতি জেনে নিল। সী কিংএর নাম বিসবোঁ, ম্যাক্রেলকে চাঙ্রা বলে। এ ছাড়াও চোলাক মাছ আছে, আছে সার্ডিন নামের ছোট ছোট মাছ, তাকে বলে তালে।

মামী বললেন: দাঁড়াও, আমি সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি।

বলে ছুরি দিয়ে তিনি সী কিং আর পম্ফ্রেট মাছ কাটলেন। আর ম্যাকরেলের প্লেট আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

খেতে খেতেই স্বাতি বলল: ভারি চমৎকার রান্না।

চেহারা দেখে ঝাল আর মশলা বেশি আছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু খেয়ে দেখলুম যে রঙই শুধু লাল, ঝাল নেই, মশলাও নেই। তার বদলে বোধহয় নারকেল আর পেঁয়াজ আছে। বেশ সুস্বাদু খাবার।

মামারও ভাল লেগেছিল। বললেন: এই জন্যেই রাজা মহারাজারা গোয়ানিজ কুক রাখতেন।

পরে জেনেছিলুম যে খাদ্যের মতো গোয়ার পানীয়ও ভাল। বম্বের বড়লোকেরা ছুটি পেলেই এখানে পালিয়ে আসে। পান করেই পেট ভরায় এখানে। কাজুর ফল থেকে এক রকমের পানীয় তৈরি হয়, তার নাম ফেনি। পর্তুগীজের আমলে এক টাকায় এক বোতল পাওয়া যেত, এখন সাত টাকা দাম হয়েছে বলে গোয়ানরা দুঃখ করছে—দেশ স্বাধীন হয়ে দুর্দশা হয়েছে দেশের জনসাধারণের।

দুর্দশা কার হয় নি!

পর দিন হস্টেলের রেস্তোরাঁতেই ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। স্বাতিকে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে দেখে মামা বললেন: আজ কি হেঁটেই বেড়াতে হবে নাকি?

সকৌতুকে স্বাতি বলল: এখানে আমাদের সব রকমের অভিজ্ঞতা হবে।

বলে সেক্রেটারিয়েট মামাকে চিনিয়ে দিল, তার পরে দেখাল আব্বে ফেরিয়ার স্ট্যাচু। তার পরে নদীর ধারে পৌঁছে বলল: ওমা, এ যে জাহাজ এসে ভিড়েছে দেখছি! এস গোপালদা, জাহাজটা ভাল করে দেখে আসি।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমরা জাহাজখানা ভাল করে দেখলুম। চৌগুলে কোম্পানীর জাহাজ, বম্বে ও গোয়ার মধ্যে চলাচল করে। কাল সকাল দশটায় এই জাহাজে চাপলে আমরা এখানে ভোর বেলায় এসে পৌঁছে যেতুম। যাত্রীরা নেমে গেছে, তাই জাহাজ এখন খালি। কিছুক্ষণ পর থেকে হয় তো নতুন যাত্রী আসতে শুরু হবে। তখন এই চার পাঁচ তলা জাহাজ লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। স্বাতি বলল: এই জাহাজে এলে কী মজা হত বল তো!

বললুম: রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই হত।

কী রকম?

আরব সাগর আর কোঙ্কণ উপকূল দেখা হত, আর দেশে ফিরে বলতে পারতুম যে সমুদ্র যাত্রা করে এসেছি।

কিন্তু স্বাতি সময় নষ্ট না করে বলল: আর দেরি কোরো না, রোদের তাপ বাড়লে সমুদ্রের ধার আর ভাল লাগবে না।

বলে ফেরি ঘাটে এসে চারখানা রিটার্ন টিকিট কাটল। বলল : দেখলে তো, নৌকোতেও রিটার্ন টিকিট পাওয়া যায়।

এ কথা সে নিজেই জানত না। সে চারখানা টিকিট চেয়েছিল আর ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিল, রিটার্ন টিকিট চাই কিনা। তাতে ভাড়া কম লাগে।

ঢালু পথ ধরে আমরা নৌকোয় গিয়ে উঠলুম। এ নৌকো দেখতে নৌকোর মতো নয়, লম্বা ও চওড়ায় প্রায় সমান। সামনে পিছনে দুখানা করে চারখানা মোটর গাড়ি উঠতে পারে। যাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকে চারি ধারে। সব সময় যে মোটর ওঠে তাও নয়, আমাদের নৌকোয় একখানাও মোটর উঠল না।

মামা বললেন : কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে বল তো?

স্বাতি বলল : ছ মিনিট।

মামা আশ্চর্য হলেন, আর স্বাতি বুঝিয়ে দিল যে এই যে কড়-কড় করে শব্দ হচ্ছে, এ হল লোহার র‍্যাম্প তোলার শব্দ। এইবারে নৌকো ছাড়বে, ওপারে পৌঁছতে লাগবে ছ মিনিট।

ঠিক এই সময়ে খানিকটা জল নৌকোর ভিতরে চলে এল। আমাদের নতুন যাত্রী দেখে একজন বললেন : জোয়ারের জল।

তার পরে নৌকো ছাড়ল। স্বচ্ছন্দ গতি এই নৌকোর। সুন্দর প্রশস্ত নদী, নীল জল ছলছল করছে। এইবারে পানাজি শহরটি দেখা যাচ্ছে নদীর ধারে। টালির ছাদে নিচু নিচু বাড়ি, তারই পিছনে মাথা উঁচু করে আছে টুরিস্ট হস্টেল, আর এদিকটায় হোটেল মাণ্ডবী। এই রকমের বড় হোটেল আরও কয়েকটি আছে। মাণ্ডবীর উপরে নতুন পুলও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। পরপারের কাজ কিছু বাকি আছে মনে হচ্ছে। ছোট বড় দেশী নৌকোও চলেছে। পাল টাঙাবার ব্যবস্থা আছে। আবার মালবাহী জাহাজও দেখছি ভেসে আসছে। স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : মাটি নিয়ে এই সব জাহাজ কোথায় যাচ্ছে গোপালদা?

বললুম : মাটি নিশ্চয়ই নয়। গোয়ায় লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় জানি। এ হয় তো সেই মাটি।

দেখতে না দেখতেই পরপারের বেতিম জায়গাটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছোট জায়গা, দুধারে পাহাড়ী এলাকা। কিন্তু পাহাড় ঠিক পাহাড়ের মতো নয়, টিলার মতো। নৌকো এসে পারে ভিড়ল, র‍্যাম্প পড়ল, আমরাও নেমে পড়লুম।

উপরে উঠেই দেখলুম বাস আর ট্যাক্সি। তার চারি ধার ঘিরে নানা রকমের দোকানপাট। আমাদের দেখতে পেয়ে ট্যাক্সিওয়ালারা এল এগিয়ে। স্বাতিই একটা ট্যাক্সি ঠিক করে ফেলল। বলল : মাপুসা হয়ে কলংগুটে যেতে হবে, তারপর ফিরিয়ে আনবে এইখানে।

ভাড়া ঠিক হতেই আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম।

ড্রাইভারের পাশে বসে বেশ সুবিধা আছে। নানা কথা জেনে নেওয়া যায়। এই ছোট শহরটি ছাড়িয়ে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এই পথ ধরে কোথায় যাওয়া যায় ?

ড্রাইভার বলল : বম্বে। রত্নগিরি হয়েও যেতে পারেন, কোল্হাপুরও যাওয়া চলে।

তার পরেই বলল : কিন্তু বেলগাঁও ব্যাঙ্গালোর বা কারোয়ার যেতে হলে পানাজি থেকেই যেতে হবে। কারোয়ার হল ম্যাঙ্গালোরের পথে।

উঁচু নিচু পথ ধরে আমরা চলেছিলুম। মাঝে মাঝে ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার আমাকে আরও একটি খবর দিল, বলল : কোঙ্কণ উপকূল দিয়ে বম্বে-গোয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে, তখন এই অঞ্চল জমজমাট হয়ে উঠবে।

গোয়া একটি ছোট রাজ্য। উত্তর দক্ষিণে পঁয়ষট্টি মাইল, আর মাইল আটত্রিশেক পূর্ব পশ্চিমে। কাজেই কোন জায়গাই দূর নয়। দেখতে না দেখতেই আমরা মাপুসায় পৌঁছে গেলুম। ছোট শহর, দর্শনীয় স্থান বলতে তেমন কিছুই নেই। বাজারের ভিতর

দিয়ে যেতে যেতে ড্রাইভার বলল: শুক্রবার হলে হাট দেখতে পেতেন। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মেয়ে পুরুষ আসত, সে দৃশ্য আপনাদের ভাল লাগত।

স্বাতি বলল: অন্য দিন এখানে কী দেখতে লোক আসে?

ড্রাইভার বলল: কলংগুটে যাবার সোজা পথ থাকলেও সরাই মাপুসা হয়ে যায়। কলংগুটে এখান থেকে পাঁচ মাইলের কিছু বেশি।

বলে বোধহয় সেই দিকেই গাড়ি চালাল।

প্রথমে আমরা একটি তিন মাথার মোড়ে এলুম, সোজা পথ বেতিমের দিকে গেছে। আমরা পশ্চিম মুখে সমুদ্রের ধারে চললুম। পথের ধারে চাষবাস হচ্ছে, নারকেলের গাছ আছে ঘন হয়ে, আর দু-একটা ঘর বাড়ি। পথের শেষে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি, তার পরেই বেলাভূমি। ট্যাক্সি এসে এই বাড়ির গা ঘেঁষেই দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

দোতলা বাড়িটির পাশ দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাবার সময় দেখলুম যে এটি সরকারী টুরিস্ট রিসর্ট। অনেক বিদেশী মেয়ে পুরুষ এখানে আছে। নির্জনে অবকাশ যাপনে আসে এরা, ছুটি ফুরোলেই দেশে ফিরে যায়।

কলংগুটে বীচ বিস্তীর্ণ বেলাভূমি বলব না, অপ্রশস্তও নয়। নিকটেই সমুদ্র, উত্তাল তরঙ্গ নয়, ছোট ছোট ঢেউ পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। একজন স্থূল দেহের বিদেশী মহিলা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে স্নানের চেষ্টা করছেন। এগিয়ে যাবার সাহস নেই, আবার পিছিয়ে আসতেও পারছেন না।

উত্তরের দিকে এই বেলাভূমি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নারিকেলের ঘন বন দেখা যাচ্ছে তীরের কাছে। সেদিকে দু-একজন লোকও দেখা যাচ্ছে। আর স্নানের পোশাকে দুটি বিদেশী নরনারী দেখলুম একান্তে। পুরুষটি বসে আছে, আর মেয়েটি বালির উপরে শুয়ে

আছে তার সঙ্গীর কোলে মাথা রেখে। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : একটা ছবি তুলে আনব ?

কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে গেল। কাছাকাছি গিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে ক্যামেরা খুলতেই তারা ফিরে দেখল। কিন্তু কোন ভাবান্তর হল না, তেমনি করেই শুয়ে বসে রইল। ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে স্বাতি ছবি নিল তাদের, তার পরে ফিরে এল।

মামা মামী এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন : লোকে যে কেন এই সব জায়গায় আসে বুঝি নে।

গম্ভীর ভাবে মামী বললেন : বয়স নেই বলেই বোঝ না।

ঠিক এমনি সময়ে জন কয়েক বিদেশী মেয়ে পুরুষ স্নানের পোশাকে বেরিয়ে এল টুরিস্ট রিসর্ট থেকে। তাদের কলরবে বেলাভূমি মুখর হয়ে উঠল। কাঁধে এক একখানা তোয়ালে নিয়ে তারা স্নান করতেই বেরিয়েছে। কিন্তু সবাই জলে নামল না। একজন গিয়ে লাফিয়ে পড়ল জলে, আর সাঁতার কেটে অনেক দূরে এগিয়ে গেল। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জলের ভিতরে হেঁটে এগিয়ে এল অনেকখানি। আর সবাই বালির উপরেই বসে পড়ল, খানিকক্ষণ পরেই চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। যারা জলে নেমেছে, তারা বেপরোয়া জল ছেটাচ্ছে অন্য ছেলে মেয়েদের গায়ে। কিন্তু যে দুজন মেয়ে পুরুষ আগে থেকে শুয়ে বসে ছিল, তারা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না।

পরম পুলকে স্বাতি বলল : আমরাও জলে নামব গোপালদা।

এগোবার ভান করে বললুম : এস।

মামী চেঁচিয়ে বললেন : সে কি, তোমাদের কাপড় গামছা কোথায় যে জলে নামবে !

স্বাতি বলল : কেমন সুন্দর হাওয়া দেখছ না, একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকলেই শুকিয়ে যাবে।

গুরুজনরা না থাকলে বলতে পারতুম যে ওদের মতো আমাদেরও স্নানের পোশাক আছে, আমার কোন অসুবিধাই হবে না। কিন্তু কিছু বলা উচিত হবে না ভেবে আমি ফিরে এলুম।

কাল রাতে টুরিস্ট লিটারেচার পড়ে বুঝেছিলুম যে গোয়ার সব চেয়ে প্রিয় সৈকত হল এইটি। বাগা নামের একটি বড় বেলাভূমি আছে নিকটে, মাপুসা থেকেই সেখানে যেতে হয়। কিন্তু টুরিস্টদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। আরও কয়েকটি বীচ আছে। কিন্তু টুরিস্টদের জন্যে শুধু কলংগুটে, কোল্‌ভা আর পানাজির উপকণ্ঠে গ্যাস্‌পার ডায়াস বা মীরামার।

রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে মামার ভাল লাগছিল না, বললেন: চল।

বলে ফেরার পথ ধরলেন।

ট্যাক্সির কাছে পৌঁছে আমরা একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। ছোট একটি চালা ঘরের মধ্যে অনেকগুলি বিদেশী ছেলে মেয়ে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে। কোন ছেলে দাড়ি কামাচ্ছে, লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে কোন মেয়ে। আর ডুগ ডুগ করে একটা শব্দ আসছে। চোখের নিমেষে স্বাতি সেখানে পৌঁছে গেল। আমিও এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, একজন হিপি।. বিচিত্র তাদের সাজ-পোশাক। কোন মেয়ে শাড়ি পরেছে, কোন ছেলে পরেছে পাজামার উপরে পাঞ্জাবি, আবার লুঙ্গিপরা ছেলেও আছে। মেঝেয় বসে একটা ছেলে বাঁয়া তবলায় চাঁটি দিচ্ছে এক মনে। আর একজন একটা কলকে নামিয়ে রেখে চোখ বুজে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। চালা ঘরের বারান্দা এটা, ভিতরে কী হচ্ছে, অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

একটি ছেলে হাতছানি দিয়ে স্বাতিকে ডাকল, আর ভয় পেয়ে স্বাতি পালিয়ে এল তখনই। আমি বললুম: কী হল?

স্বাতি মাথা নেড়ে বলল: দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এবারে অন্য পথে আমরা বেতিমে ফিরে এলুম। নৌকোয় নদী পার হয়ে পানাজি। পানাজি নতুন নাম, আগে নাম ছিল পান্‌জিম। বিদেশীরা চলে যাবার পরে সর্বত্রই নাম বদলাচ্ছে।

ওপারে গিয়ে স্বাতি বলল: এবারে আল্‌টিন্‌হো পাহাড়ে ওঠা যাক। আল্‌টিন্‌হো পাহাড় যে পানাজি শহরেরই একটি অভিজাত এলাকা তা বই পড়েই জেনেছি। গোয়ার প্রধান মন্ত্রী দয়ানন্দ বন্দোদকার সাহেবের বাসভবন এই পাহাড়ে। তাঁর দল হল মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল। দলের সেক্রেটারী তাঁর কন্যা শশিকলা কাকোদকর। বিদ্রোহী দলের নেতা হলেন এণ্টনী ডিসুজা। পরিবর্তন একটা আসন্ন হয়েছে বলে শুনলুম।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠলুম। শহরের মাঝখান দিয়ে এই পথ পাহাড়ের দিকে গেছে। প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। এই পর্যন্তই মোটর আসে, এইখান থেকেই নিচের দৃশ্য দেখতে হয়। আমরাও দেখলুম, তার পরে নেমে এলুম পাহাড়ের উপর থেকে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, এবারে কোথায় যেতে হবে। স্বাতি বলেছিল: সেই চার্চের নামটা বলে দাও।

মস্ত বড় নাম, মনে রাখা দায়। কোন রকমে স্মরণ করে বললুম: চার্চ অব আওয়ার লেডি—

স্বাতি হাসল।

বললুম: বাকিটার জন্যে বই দেখতে হবে। আওয়ার লেডি অব ইমাকুলেট কন্‌সেপসন।

মামা বললেন: এত বড় নাম এরা মনে রাখতে পারে!

পাহাড়ের ঢালুতেই এই গির্জা। আমাদের ট্যাক্সি গড় গড় করে গড়িয়ে গির্জার সামনে এসে দাঁড়াল। উপরে উঠবার সিঁড়ি দেখে সবাইকে আশ্চর্য হতে হয়। অদ্ভুত কায়দায় অনেকখানি জায়গা

জুড়ে এই সিঁড়ি উপরে উঠেছে। সিঁড়িতেই বহু লোকের সমাবেশ হতে পারে। পিছনে গির্জার তিনটি তলা দেখা যাচ্ছে, আর একেবারে মাথার উপরে একটি বিরাট ঘণ্টা।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠবার আগে মামা বললেন: এই ব্যাপারে গোপাল কিছু বলবে না?

বললুম: সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন না।

স্বাতি বলল: বলেই দেখ না।

বললুম: কিছুই জানি না। মানে ধারণা খুবই অস্পষ্ট।

তাই বল।

বলে মামা গাড়িতে উঠলেন। আমরাও উঠলুম। তার পরে ড্রাইভারকে মহালক্ষ্মী মন্দিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললুম: এদেশে প্রথম এসেছিল ডোমিনিকান পাদ্রিরা, তার পর ফ্রান্সিসিয়ান ও জেসুইটরা এসেছিল। সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মতো সফলতা আর কেউ অর্জন করেন নি। ইনকুইজিসন ডায়োসেস কাকে বলে, জেসুইটদের কেন তাড়ানো হল, আর ইনকুইজিসন বন্ধ হল কেন, এ সব কথা খ্রীষ্টানরাই ভাল জানেন।

কিন্তু মামী আমাদের প্রসঙ্গান্তরে টেনে আনলেন। বললেন: এখানে যে কোন মন্দির আছে, এ কথা তো আগে বল নি।

স্বাতি বলল: এই মন্দিরের নাম তুমি কোথায় শুনলে?

বললুম: তোমার বই পত্রেই আছে। অসাধারণ কিছু নয় বলেই মনে হয়।

ড্রাইভারকে চলতে দেখে মনে হল যে হিসেবের বোধহয় একটু ভুল হয়েছে। আলটিনহো পাহাড় থেকে নেমে এই মন্দির দেখলে পথ সংক্ষেপ হত, তার পরে গির্জা দেখে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে নামতে পারতুম। কিন্তু এদিকে কারও নজর ছিল না। একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

এই পাড়ার অনেক ঘর বাড়ি নতুন মনে হয়েছিল, কিন্তু মন্দিরটি পুরনো। পোণ্ডায় যে রকম মন্দির দেখেছি, সে রকম মন্দির নয়। কোন বৈশিষ্ট্য নেই এই মন্দিরের। শুধু যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্যে বিরাট একটি নাটমণ্ডপ আছে। উড়িষ্যার মতো নাটমণ্ডপ নয়, গোয়ার নাটমণ্ডপ কতকটা চালা ঘরের মতো।

মামী ভক্তিভরে প্রণাম করলেন দেবতাকে, কিছু দক্ষিণাও দিলেন, পুজার ফুল চরণামৃত নিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিলেন।

চারিদিকে রৌদ্র তখন ঝক ঝক করছে। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী। বেলার দিকে তাকিয়ে মামী বললেন: এইবারে ফেরার কথা বল।

স্বাতি বলল: এ বেলা তো আমরা বাইরে খাব।

মামী বললেন: তাহলে সেইখানেই চল।

ড্রাইভারকে আমি ক্যাপুসিনার নাম বললুম।

দেখতে না দেখতেই আমরা শহরের মাঝখানে ফিরে এলুম। একটি চতুষ্কোণ বাগানের নাম মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন। তার চারিধার ঘিরে চওড়া রাস্তা, আর দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ। বাগানে বড় বড় গাছ আছে, বসবার বেঞ্চি আছে, আছে নানা জাতের ফুলপাতার গাছ। বাতি আছে, গান শোনাবার ব্যবস্থাও আছে। এই বাগানের একটা কোণায় এসে পৌঁছবার সময়েই সেই গির্জাটি ডান হাতে দেখতে পেয়েছিলুম। একটুখানি এগিয়ে গেলেই গির্জা। তার মানে, এই গির্জায় নেমে এইটুকু পথ আমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসতে পারতুম। কিন্তু আমাদের ট্যাক্সি এই বাগানের ধারে ক্যাপুসিনার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে মামা ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

ড্রাইভারকে আমি টুরিস্ট হস্টেলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

খুব কাছে বলেড্রাইভার আঙুল দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে দিল। বাগানের অন্য ধারটা মাণ্ডবী নদীর আরও কাছে। সে দিক থেকে কয়েক পা এগোলেই নদীর ধার, আর এদিক থেকে এগোলে টুরিস্ট হস্টেলও কাছে। শুনে নিশ্চিন্ত হলুম অনেকটা। ট্যাক্সি না পেলে হেঁটেই আমরা হস্টেলে পৌঁছতে পারব।

সারা দুপুর আমরা ঘুমিয়েছিলুম। স্বাতি বলেছিল : রোদ মাথায় করে আমরা সমুদ্রের ধারে যাব না। মাথায় তাপ না লাগলে পায়ের উত্তাপ সহ্য করা যায়।

মামা মেনে নিয়েছিলেন তার কথা। তাই আমরা বিকেলের চা খেয়ে পথে বেরিয়েছিলুম। আর একখানা ট্যাক্সি ধরে এগিয়েছিলুম ডোনা পাওলার দিকে।

মামা বললেন : স্বাধীনতার জন্যে গোয়ার মানুষ যখন বিদ্রোহ করেছিল, খবরের কাগজে তখন পাঞ্জিম নাম দেখতুম। এই পাঞ্জিম কেমন করে পানাজি হল জানি নে।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি বলল : বল না গোপালদা।

বললুম : কোঙ্কণীরা এই জায়গাকে পোন্‌জী বলত। পর্তুগীজরা নাম দিয়েছিল পাঞ্জিম। গোয়া স্বাধীন হবার পরে বিশেষজ্ঞরা বলল, পোন্‌জী নয়, আসল শব্দ হল পানাজি।

স্বাতি বলল : এ সব কি তোমার তৈরি কথা?

বললুম : না। কাল যে বইগুলি সংগ্রহ করেছিলে, এ সব কথা তাতেই আছে। এই শহরের বয়স যে মাত্র এক শো বছরের কিছু বেশি, সে কথাও আছে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : তবে যে শুনলাম এখানকার সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং বিজাপুরের সুলতানের প্রাসাদ ছিল!

বললুম : সে কথাও ঠিক। পাঁচ-ছ শো বছর আগে যখন তিনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তখন এটি জেলেদের একটি গ্রাম ছিল। মাঝে মাঝে তিনি অবসর যাপনের জন্যে এখানে আসতেন।

তারপর ?

গোয়ার এক গভর্নর এই বাড়িতে বাস করবার জন্যে চলে আসেন। পানাজি তখনও গোয়ার রাজধানী হয় নি।

খুব প্রশস্ত একটি রাস্তা ধরে আমাদের ট্যাক্সি চলেছিল দক্ষিণ পশ্চিম মুখে। পথের এক ধারে মাণ্ডবী নদী, অন্য ধারে এক একটি সুন্দর বাড়ি, বাগান, আর বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে এক একটা স্ট্যাচুও দেখতে পাচ্ছি। যেমন আবেব ফেরিয়ার স্ট্যাচু, তেমনি আরও কয়েকজন গোয়ার বিশিষ্ট মানুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পর্তুগীজ শাসকদের মূর্তি নামিয়েও দেশের মানুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠার নমুনা আছে। আলবুকার্কের স্ট্যাচু আছে গ্যাসপার ডায়াসে। এই সুন্দর পথের নাম বোধ হয় ক্যাম্পাল। গ্যাসপার ডায়াস পৌঁছবার পরে সেই পথ সংকীর্ণ হয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণে চলল। গ্রাম নয়, শহরতলী বলা উচিত। শহর থেকে বাস যাতায়াত করে ডোনা পাওলা পর্যন্ত। অনেকটা পথ এগিয়ে আমরা এইখানে পৌঁছলুম।

সমুদ্রের ধারে এই জায়গা। একটি টিলার মতো পাহাড়ের উপরে বসবার জায়গা আছে, আর পাহাড়টি সমুদ্রের জলে ঘেরা। ইংরেজীতে একে প্রমণ্টরি বলে, ভূগোলের ভাষায় শৈলান্তরীপ। টিলার মতো উঁচু না হলে অন্তরীপ বলত, ইংরেজীতে কেপ। পথের ধারে অনেকখানি জায়গা বাঁধানো। অনেক লোক এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে পারে।

সত্যিই সমুদ্রের শোভা এখানে দেখবার মতো। মার্মাগাও উপসাগর ঠিক অর্ধবৃত্তাকার। এক মাথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অন্য মাথায় ভাস্কো-ডা-গামা শহর ও মার্মাগাও বন্দর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর সমগ্র উপকূল ঘিরে কলা নারিকেল ও শ্যামল বৃক্ষরাজি। না, ছেদ আছে মাঝখানে। মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র ঢুকে গেছে দেশের মধ্যে। তার পরেই এ অঞ্চলের মানচিত্র ভেসে

উঠল চোখের সামনে। জুয়ারি নামের একটি নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, ওটি তারই মোহনা।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: ছোট ছোট জাহাজ দেখতে পাচ্ছ গোপালদা?

বললুম: জাহাজ ছোট নয়, দূরে আছে বলে ছোট দেখাচ্ছে।

ধোঁয়াও দেখতে পাচ্ছি।

বললুম: মার্মাগাও বন্দর। কাল আমাদের ঐখানে যাবার কথা।

স্বাতি বলল: স্টীমার হলে অল্প সময়েই পৌঁছনো যেত।

বললুম: ইচ্ছে করলে ফেরিতেও যেতে পার। দেখতে পাচ্ছ না ফেরি ঘাট।

সত্যিই ফেরি আছে। বহু যাত্রী ফেরিতে ওপারে যায়। তাতে খরচ কম হয়, সময়ও বাঁচে। বাসে যেতেও নাকি বেশি সময় লাগে না, কিন্তু মালপত্র সঙ্গে থাকলে নদী পারাপারের ঝঞ্ঝাট আছে। নৌকোয় বাস পার করা হয় না। পানাজির বাস এধারে দাঁড়িয়ে থাকে, নৌকোয় নদী পার হয়ে ওপারে ভাস্কোর বাস পাওয়া যায়, মাড়গাওএর বাসও আছে। মাইল বিশেক পথ, ট্যাক্সি নিলে গাড়িতে বসেই নদী পার হওয়া যায়।

সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বাতি বলল: ওপরে উঠবে গোপালদা?

উপরে মানে টিলার উপরে সুন্দর বসবার জায়গাটিতে। রাস্তার ধার থেকেই বাঁধানো সিঁড়ি শেষ পর্যন্ত উঠে গেছে। আমি জানি যে মামা মামী উঠতে চাইবেন না, তাই বললুম: অকারণে সময় নষ্ট করে লাভ কী আছে।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: ভাবছ অন্ধকার হয়ে গেলে গ্যাসপার ডায়াস বীচে সূর্যাস্ত দেখা হবে না।

সূর্যাস্ত।

বলে মামা স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : পশ্চিমের সমুদ্রে তো লোকে সূর্যাস্তই দেখে। এখানে দক্ষিণের সমুদ্র, নিচে কোথাও বসবার জায়গা নেই। তাই মামা বললেন : তাহলে সেই দিকেই চল।

ফিরে এসে আমরা গাড়িতে বসলুম। ক্যাবো রাজভবনে যাবার পথ বোধহয় এই দিক দিয়েই গেছে, এই পথেরই শেষ প্রান্তে। কিন্তু পাহাড় ঘুরে গেছে বলে এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। গ্যাসপার ডায়াস বীচ থেকে হয় তো দেখতে পাওয়া যাবে। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আমরা সেই দিকেই চললুম।

চলতে চলতেই স্বাতি বলল : কাল আমরা কী দেখব জানি নে।

বললুম : কাল তো আমাদের ভাস্কো যাবার কথা।

সে তো বিকেলে। সকাল বেলায় কী করব ?

মামা গম্ভীর মুখে বললেন : বিশ্রাম।

একই পথ ধরে আমরা গ্যাসপার ডায়াস বীচে ফিরে এলুম। রাজপথ এখানে খুবই প্রশস্ত, কাজেই অনেক গাড়ি এখানে স্বচ্ছন্দে পার্ক করতে পারে। বাহিরে গাড়ি রেখে সবাই সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি পেরিয়ে সমুদ্র। বহু মেয়ে পুরুষ ও শিশু এই বেলাভূমিতে এসেছে। ছেলে মেয়েরা খেলা করছে, তাদের জন্মে নাগরদোলা আছে।

অন্ত ধারে একটি বড় হোটেল দেখা যাচ্ছে। বেলাভূমির প্রান্তে একটা রেস্তোরাঁ। কয়েকটি রঙবেরঙের ছাতার নীচে টেবিল চেয়ারে বসেছে কিছু মেয়ে পুরুষ। পিছনে গাছপালা বনভূমির মতো।

সেদিকে আমরা এগোলুম না। সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে স্বাতি বলে উঠল : এখানকার বালি তেমন পরিষ্কার নয় গোপালদা।

বললুম : কোন জিওলজিস্ট থাকলে বলতে পারত কোনও ধাতু সেখানে আছে কিনা।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল সায়াহ্নের আকাশ। জাহাজের কথা আমার মনে পড়ল। গোয়ার জাহাজ এই বেলাভূমির সামনে দিয়েই বোধহয় পানাজিতে যায়। এ তো শুধু সমুদ্র নয়, মাণ্ডবী নদীর মোহনাও এইখানে। এই দুএর সীমানা বোধহয় নির্ধারিত করা নেই, সমুদ্রের ধার পর্যন্ত গিয়ে আমরা আবার ফিরে এলুম।

স্বাতির পরামর্শে পর দিন আমরা বাজার দেখতে বেরোলুম। স্বাতি বলেছিল : এ সব জায়গায় শুনেছি অনেক বিদেশী জিনিস বিক্রী হয়।

কিন্তু অনেক দেখে শুনেও কিছু পাওয়া গেল না। পানাজির জাহাজ বিদেশ থেকে আসে না বলেই কিছু পাওয়া গেল না। জানা গেল যে ভাস্কোর বাজারে কিছু পাওয়া যায়। মার্মাগাও বন্দরে বহু মালবাহী জাহাজ আসে, সে সব জাহাজের নাবিকেরা আনে অনেক কিছু।

হস্টেলে ফেরার পথে আমরা একখানা ট্যাক্সি ঠিক করে এলুম। পঁচিশ টাকায় সে আমাদের ভাস্কো পৌছে দেবে, নদী পার হবার ভাড়াও দেবে সে। মামী বললেন : দুপুরে বেরোব না।

আর মামা বললেন : বিকেলেও না। অন্ধকারে নদী পার হওয়া উচিত হবে না।

শেষ পর্যন্ত স্বাতি একটা রফা করল। ট্যাক্সি তিনটেয় আসবে, এক এক পেয়ালা চা খেয়ে আমরা সাড়ে তিনটেয় যাত্রা করব। সাড়ে চারটের আগেই নদী পার হওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ট্যাক্সি এল। টুরিস্ট হস্টেলের ভাড়া মিটিয়ে আমরাও নির্দিষ্ট সময়ের আগে ট্যাক্সিতে উঠলুম। শুভবাই পানাজি বলে যাত্রা করলুম নূতন পথে। ওল্ড্ গোয়ার দিকে একটুখানি এগিয়েই ডান হাতে বেঁকে ট্যাক্সি ভাস্কোর পথ ধরল।

এই পথেই গোয়ার এয়ার পোর্ট ডাবোলিম, জুয়ারি নদী পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ভাস্কোর কাছে এটি একটি ছোট রেলওয়ে স্টেশন।

গোয়ার প্রধান পথঘাট সব বাঁধানো। তাই খুব অল্প সময়েই আমরা জুয়ারি নদীর ধারে পৌঁছে গেলুম। নদী তখনও দেখা যাচ্ছিল না। তাই গাড়ি যখন একটা ছোট ঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। ড্রাইভার নেমে গিয়ে টিকিট কেটে আনল। তার পর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গড় গড় করে নেমে চলল।

সামনে হঠাৎ নদী দেখতে পেয়ে পিছন থেকে মামা বলে উঠলেন: দাঁড়াও দাঁড়াও।

কিন্তু ড্রাইভার একেবারে নৌকোর উপরে গাড়ি তুলে দাঁড়াল। এমন স্বচ্ছন্দে এই কাজ করল যেন সারা জীবন ধরে সে এই কাজই করছে। মামী দুর্গা নাম করেছিলেন, আর গাড়ি স্থির হবার পরে মামা বললেন: কাণ্ড দেখ এদের।

ড্রাইভার নেমে পড়ল, তাই দেখে আমিও নামলুম। পরক্ষণেই দেখলুম যে স্বাতিও নেমে পড়েছে। নদীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ নদীর মাণ্ডবীর চেয়ে প্রশস্ত, আর নদীতে তরঙ্গও আছে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিমে আরও চওড়া হয়েছে। সে দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে মার্মাগাও উপসাগরই যেন দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ আসছে সেই দিক থেকেই।

নদী পার হবার জন্যে এখানেও অপেক্ষা করতে হয় না। ওপার থেকে একখানা নৌকো ছাড়তেই এপারের নৌকোও ছাড়ল। একটুখানি এগিয়েই নৌকো দুলতে লাগল প্রবল ভাবে। ছল ছল করে জলের শব্দ হচ্ছে, আর জলের ছিটে আসছে ভিতরে। নদীর মাঝামাঝি এসে মনে হল যেন সমুদ্র পার হচ্ছি। কিন্তু যাত্রীদের মুখে কোন দুর্ভাবনা নেই। পরিচিতরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলছে

নিজেদের মধ্যে। এই পারাপারে যে কোন ভয়ের কারণ আছে, তা আমরা ছাড়া আর কেউই ভাবছে না।

শেষ পর্যন্ত নৌকো এসে পারে ভিড়ল। র‍্যাম্প পড়ল। লাফিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে রাস্তার উপরে উঠে দাঁড়াল। আমরা এগোলুম অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। নৌকোর উপরে জলোচ্ছ্বাস এসে পড়ছিল। আমাদের চটি ভিজে গেল সেই জলে। রাস্তায় উঠে আমরা গাড়িতে বসলুম। আর গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই মামা বললেন : যত সব অসভ্য ব্যাপার !

স্বাতি বলল : এ আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা হল।

দরকার নেই এ রকম অভিজ্ঞতার।

বলে মামা পকেট থেকে তাঁর পাইপ বার করলেন।

জুয়ারি নদীর এপার থেকে তিনটে পথ বেরিয়েছে। একটা সোজা পথ মাড়গাও গেছে, আর একটা পথ ঘুরে গেছে নদীর ধারে ধারে। আমরা অন্য দিকে ভাস্কো-ডা-গামা শহরের দিকে চললুম।

এ পথ চলেছে সোজা পশ্চিম মুখে। সূর্যকে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতেই দুপাশে লোকালয় এল। দূরে দূরে ঘর বাড়ি, তার পরে কাছাকাছি। একটি পথ অনেক পথ হল। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারলুম আমরা ভাস্কো পৌঁছে গেছি।

প্রথমে আমরা স্টেশনে যাব বলেছিলুম। স্টেশনে পরের দিনের জন্যে টিকিট কেটে কোনও হোটেলে উঠব। ড্রাইভার তাই সোজা আমাদের স্টেশনে নিয়ে এল। একটা বাজার এলাকার মতো চৌরাস্তায় এসে বাঁ হাতে ফিরে একটুখানি এগিয়েই যে একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তাই রেলওয়ে স্টেশন। এই এলাকাতেই অনেক ট্যাক্সি ও বাস দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লোকজন বেশি নেই। মামা বললেন : তোমরা বসে থাক, গোপালের সঙ্গে গিয়ে আমি টিকিট কেটে আনি।

বলে নেমে পড়লেন। ড্রাইভারের সঙ্গে আমি আগেই নেমেছিলুম।

টিকিট কাটতে আমাদের সময় লাগল না। পুনা থেকে রিজার্ভেসনের জন্যে আমরা যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, তা পেয়েছিল তারা। কিন্তু টিকিটের নম্বর ছিল না বলে ফেলে রেখেছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল যে যাত্রী নেই বলে গাড়িতে জায়গা হল। নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসে মামা বললেন: এইবারে একটা ভাল হোটেলে চল।

ভাল হোটেল বলতে ড্রাইভার আমাদের ভাস্কোর সেরা হোটেলে নিয়ে এল। ভাড়া অনেক, কিন্তু ব্যবস্থা দেখে মামা প্রসন্ন হলেন। পরে জেনেছিলুন যে বাজার এলাকায় যে সব হোটেল আছে, তা অত্যন্ত নোংরা। তবে কম পয়সার চলনসই হোটেলও হয়েছে।

স্বাতি বলল: তাড়াতাড়ি আমাদের বেরোতে হবে বাবা, যা কিছু দেখবার আছে তা আজই দেখে ফেলতে হবে।

কাল সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে ছাড়বে আমাদের ট্রেন। মনে মনে আমি স্বাতিকে সমর্থন করলুম।

মামা বললেন: পানাজিতে চা খেয়ে তেমন জুত হয় নি।

বলতে না বলতেই বেয়ারা আমাদের চা এনে উপস্থিত করল। চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে, সেই সমস্যা দেখা দিল সকলের আগে। স্বাতি বলল: একটা ট্যাক্সি নিয়ে মার্মাগোয়া বন্দরটা সকলের আগে দেখে আসা যাক।

মামা বললেন: সেই ভাল।

মাইল ছয়েক দূরে মার্মাগোয়া বন্দর। রেল লাইন আছে, মালগাড়ি চলাচল করে, যাত্রীদের জন্যে সাট্‌ল ট্রেনও আছে। কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে ভাস্কো-ডা-গামা স্টেশন থেকে। যাত্রীরা বাসেই বেশি যাতায়াত করে, বাস দাঁড়ায় বন্দরের গেটের সামনে। আমরা

ট্যাক্সি নির্দুল একটা।···সুন্দর পথ। মনে হল যেন একটা পাহাড়ী এলাকার উপর দিয়ে বন্দরে এসে উপস্থিত হলুম। বন্দর দেখবার জন্যে অনুমতিপত্র নিতে হয়। কিন্তু মামা বললেন: বন্দরের ভিতরে আবার দেখবে কী? বাইরে থেকে যা দেখা যায়, তাই দেখেই ফেরা যাক।

বাইরে থেকে আর দেখা যাবে কী! মাদ্রাজে যেমন কিছু দেখতে পাই নি, এখানেও তেমনি। মনে মনেই কল্পনা করে নিলুম সব কিছু। সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ এসে নোঙর করেছে এইখানে, বড় বড় ক্রেন দিয়ে মাল খালাস্ হচ্ছে, লোকজন, ব্যস্ততা—এরই নাম বন্দর। অনুমতি না নিয়ে যতটা দেখা যায়, ততটুকুই দেখে আমরা ফিরে এলুম।

ফেরার পথে ড্রাইভার বলল: ভাস্কো থেকেও হারবার দেখা যায়।

স্বাতি বলল: তবে আমরা সেইখানেই যাব।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে ভাস্কো শহরের সম্বন্ধে আমি একটা ধারণা করে নিলুম। শহরের দুটো অংশ আছে। যেখানে আমরা উঠেছি, তা হল শহরের প্রধান অংশ—রেলওয়ে স্টেশন, বাজার হাট, বড় বড় রাস্তা ঘাট, হোটেল ক্লাব গির্জা, সব এই দিকে। দক্ষিণ অংশের নাম বেয়না, ডক ও রেলকর্মীরা থাকে সেই দিকে, আর সমুদ্রের একখণ্ড বেলাভূমি আছে সে দিকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: জুয়ারি নদী কোন্ দিকে?

ড্রাইভার বলল: সেইখানেই আপনাদের নিয়ে যাব।

অল্পক্ষণেই আমরা ভাস্কোর সেই চৌমাথায় ফিরে এলুম। শহরের সব চেয়ে কর্মব্যস্ত এই এলাকা। এই চৌমাথার খুব কাছে অ্যাভেনিউ-এর মতো ছায়াচ্ছন্ন একটা প্রশস্ত পথের শেষে এসে ড্রাইভার থামল। তার কথা মতো আমরা নেমে পড়লুম। দু ধারে পথ, মাঝখানে বসবার জায়গা। একটা স্ট্যাচু ছিল এক সময়,

এখন আর তা নেই। একটুখানি এগিয়েই একটা উৎকট গন্ধ পেলুম আমরা। মামা মামী পিছিয়ে এলেন, কিন্তু আমাকে এগোতে দেখে স্বাতিও এগিয়ে এল। বলল: কিসের গন্ধ গোপালদা?

মনে হচ্ছে শুঁটকি মাছের।

ঠিকই বুঝেছিলুম। পথের শেষে নিচু দেওয়াল, সেই দেওয়ালের নিচেই সমুদ্রবেলা, সেখানে জেলেরা মাছ শুকোচ্ছে।

স্বাতি বলল: এ কি জুয়ারি নদী, না সমুদ্র?

বললুম: জুয়ারি নদীর মোহনা মনে হচ্ছে। মার্মাগোয়া উপসাগরও হতে পারে। পশ্চিমের ঐ সব জাহাজ দেখতে পাচ্ছ তো?

স্বাতি বলল: ডোনা পাওলা থেকে আমরা এই জাহাজই দেখতে পেয়েছিলুম, তাই না?

কিন্তু মাছের গন্ধে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি আমরা ফিরে এলুম।

হোটেলে ফিরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। সামান্য কিছু কথাবার্তার পর তিনি বললেন: গোয়া দেখতে এসেছেন বুঝি?

বললুম: দেখা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন: গোয়ার মানুষ আপনাদের কেমন লাগল?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। গোয়ার মানুষ তো আমরা দেখি নি, দেখার চেষ্টাও করি নি কোন। বললুম: আমাদের দুর্ভাগ্য যে কারও সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

ভদ্রলোক বললেন: গোয়ার চেয়ে গোয়ার মানুষ অনেক ইণ্টারেস্টিং।

তার পরে সংক্ষেপে বললেন গোয়ার মানুষের কথা। পুরাকালে

এ দেশে দ্রাবিড় জাতির কালাডিগ রাজারা রাজত্ব করতেন, তাঁরাই এ দেশে পুরোহিতের কাজের জন্য গৌড় থেকে সারস্বত ব্রাহ্মণদের আনিয়েছিলেন। এই ভাবেই এ দেশের লোক হিন্দু হয়েছে। পর্তুগীজরা এসে খ্রীষ্টান করেছে তাদের। শতকরা নব্বুই জনের ভাষা কোঙ্কণী, কিন্তু ইংরেজী পর্তুগীজ ও ফরাসী, আবার হিন্দী মারাঠী ও কানাড়া—এ সব ভাষাও অনেকে জানে। সংস্কৃতির ব্যাপারে হিন্দু ও ল্যাটিন দুই-ই তাদের মজ্জাগত। এ দেশের খাবার নিশ্চয়ই খেয়েছেন, তারিফ আপনাদের করতেই হবে। আর একটি গুণের জন্যে এ দেশের মানুষকে আপনাদের মনে রাখতে হবে। সে এ দেশের সঙ্গীতপ্রিয়তা। কথায় বলে যে ঠোঁটে গান নিয়ে গোয়ান শিশু জন্মায়।

এ কথা না শুনে থাকলেও গোয়ানদের সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা আমরা শুনেছি। তাই মেনে নিলুম তাঁর কথা। ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: ম্যানডো হল এ দেশের পল্লীগীতি; সংস্কৃত মণ্ডল শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। গুম্মত নামে তবলার মতো একটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এই নাচ গান হয়। কোঙ্কণী গানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচে। ডাকিনী জানেন?

বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: আপনি কি ডাকিনী-যোগিনীর কথা বলছেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: ঐ নামেরই নাচ-গান। হিন্দু মেয়েরা নাচে অঙ্গভঙ্গি সহকারে। বর্ণনা করে তো এ সব জিনিস বোঝানো যায় না, নিজের চোখে একবার দেখলে মনে গেঁথে যায়।

ভদ্রলোক দুটি উৎসবের কথাও বললেন, তার নাম আমি আগে কখনও শুনি নি। উত্তর ভারতের হোলির মতো একটি উৎসব, তার নাম সিগমো। আর দ্বিতীয়টি হল ধর্মনির্বিশেষে সবার উৎসব কার্নিভাল, ফ্রান্সের মর্দি গ্রাসের মতো। ফেব্রুয়ারী মাসে তিন দিন ধরে এই উৎব হবে। বিচিত্র পোশাক পরে নানা রকমের মুখোশ

পরে লোকেরা পথে বেরিয়ে পড়বে, সঙ্গে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র—ড্রাম ট্রাম্পেট সিম্বল, পথে ঘাটে ক্লাবে সর্বত্র লোকে বেপরোয়া ভাবে আনন্দ করবে।

তার পরে একটু নিম্নস্বরে বললেন: গোয়ানদের অনেক গুণ আছে—তারা বুদ্ধিমান সাবধানী আমুদে ও অতিথিবৎসল, কিন্তু—

ভদ্রলোক থামতেই আমি বললুম: বলুন।

চারিদিকে একটু তাকিয়ে তিনি বললেন: কাজের বেলায় একটু ঢিলেঢালা, মানে খানিকটা অলস।

ভদ্রলোক আমাদের আর কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না, অন্য একজন ভদ্রলোক এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা স্টেশনে চলে এলুম। ট্রেন ছাড়ল সময় মতো। এক গাড়িতেই মামা ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই সবাই এক গাড়িতেই উঠেছিলুম। কিন্তু স্বাতিকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে গোয়া ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের সঙ্গে খাবার দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যে দেড়টার আগে খাবার পাওয়া যাবে না। কিন্তু স্বাতি বলেছিল, তার দরকার নেই। পথে যা পাওয়া যায়, তাই খাওয়া যাবে।

ভাস্কো থেকে এ গাড়িতে বেশি যাত্রী ওঠে নি। সকাল সোয়া নটায় ট্রেন যখন মাড়গাওয়ে পৌঁছল, তখন কিছু যাত্রী উঠল ট্রেনে। তারা বাসে চেপে পানাজি থেকে এসেছে। চলেছে পুনার দিকে। টাইম টেব্‌লে পুনার নাম পুনে। সমুদ্রের ধারে যে বন্দর আমরা দেখে এলুম, তার নাম দেখলুম মোর্মুগাও। মানচিত্রে দেখেছি মার্মাগাও নাম, আর বইএর পাতায় মার্মাগোয়া। স্থানীয় লোকেরা কী বলে তা জেনে নেওয়া হয় নি।

স্বাতির ইচ্ছা মতো কাস্‌ল্‌ রকে আমরা ভাত খেলুম, বিকেলের চা খেলুম বেলগাঁওএ, আর রাত নটায় মিরাজে পেলুম রাতের আহার। আর ভোর প্রায় ছটায় পৌঁছে গেলুম পুনায়।

ইচ্ছা করলে আমরা সাতটার পরে ডেকান কুইনে চেপে বম্বে চলে যেতে পারতুম। কিন্তু মামী রাজী হলেন না, বললেন: যে ট্রেনে ফিরব বলে জানিয়েছি, সে ট্রেনেই চল।

জো রায়কে যে টেলিগ্রাম করেছি, সে কথা আমি ভুলি নি।

দুপুর তিনটের পরে ডেকান এক্সপ্রেস ধরে ফিরব বলে জানানো হয়েছে, বম্বে পৌঁছব রাত আটটার আগে। কিন্তু স্বাতি প্রস্তাব করেছিল : পুনা দেখা তো হয়েই গেছে, ডেকান কুইনে চেপেই ফেরা যাক।

এর উত্তরেই মামী বলেছিলেন : না, তা হয় না।

আর আমি বলেছিলুম : পার্বতী মন্দির দেখা আমাদের বাকি আছে।

ফেরার পথে স্বাতি এই মন্দির দেখবে বলেছিল। কিন্তু আমার কথায় সে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি আর বলবার সাহস পেলুম না।

রিটায়ারিং রুমে নয়, মালপত্র নিয়ে আমরা ওয়েটিং রুমে উঠলুম। মামী বললেন : কয়েক ঘণ্টার জন্যে রিটায়ারিং রুমের ভাড়া আর গুণতে হবে না।

তাঁরই তাগিদে আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করে চা খেয়ে নিলুম। কিন্তু তিনি নিজে কিছুই খেলেন না। এই রকমই তাঁর অভ্যাস। কোনখানে মন্দিরে যাবার কথা হলে কিছু না খেয়েই তিনি যান, পুজো দেন, তার পরে ফিরে এসে জলযোগ করেন। আজও তাই করলেন। আমরা একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলুম পার্বতীর মন্দিরে।

কিন্তু মন্দির কোথায়! ড্রাইভার যে আমাদের একটা পাহাড়ের নিচে পৌঁছে দিল। গাড়ি যেখানে থামল, পাহাড়ের শুরু সেইখান থেকে। ধাপে ধাপে অসংখ্য সিঁড়ি উঠে গেছে। প্রশস্ত সিঁড়ি। এমন প্রশস্ত সিঁড়ি আমরা কোথাও দেখি নি। গাড়ি থেকে নেমে মামী বললেন : মন্দির কোথায়?

মন্দির এই পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড় উঁচু না হলেও সিঁড়ির বহর দেখে ভয় হয়। কিন্তু স্বাতি এক মুহূর্ত দেরি করল না, তরতর করে উপরে উঠে গেল অনেকখানি। মামী বোধহয় বাধা দেবার

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পারলেন না। স্বাতি কোন সুযোগ তাঁকে দেয় নি। মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : এ আমার কর্ম নয়।

কিন্তু মামীর চিন্তা হয়েছে মেয়েকে নিয়ে। বললেন : কিন্তু মেয়েটা যে একা গেল !

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি যাচ্ছি, এ কথা আমি ইচ্ছা করেই বললুম না।

মামা বললেন : গোপাল দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

আর মামী তখনই বললেন : তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা ?

মামা হাসলেন। তাঁর হাসির অর্থ যেন আমি বুঝতে পারি। মামী ভাবেন যে গোপালের সঙ্গটা খুব নিরাপদ নয়, কিন্তু মেয়েকে একা ছেড়ে দেওয়াও বিদেশে বিপজ্জনক। আজ এই সমস্যার সময়ে আমাকে তাঁর বেশি নিরাপদ মনে হল। আর মামা তাই দেখে কৌতুক বোধ করলেন।

আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লুম না, ধীরে ধীরে উঠতে লাগলুম। যেন আমার মন উপরে ছুটে যায় নি, যেন আমি আজ্ঞা পালন করছি অনিচ্ছায়। কিন্তু খানিকটা উঠেই দেখতে পেলুম যে স্বাতি একটা ধাপের উপরে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই মুচকি হাসল।

নিচে থেকে যতটুকু দেখা যায়, তার আড়ালে এসেই সে বসেছিল। আমি জানি, সে আমার অপেক্ষাই করছিল। কিন্তু ভাবখানা এমন দেখাল যে আমি তার অনুসরণ করে আসবই। তাই তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কাছে এসে বললুম : মামীমার অনুরোধেই উঠতে হল।

সত্যি !

বলে আবার সে তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল।

তার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে অবিশ্বাসই যেন বেশি প্রকাশ পেল।

সেই সঙ্গেই বুঝতে পারলুম যে আক্রমণের বদলে আমার আত্মরক্ষার চেষ্টাই তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কথাটাকে তাই ঘুরিয়ে বললুম: মামা বললেন, মেয়ে তোমার বেশি দূরে যায় নি। গোপালের জন্যে কাছেই অপেক্ষা করছে।

কিন্তু স্বাতির উত্তর শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সে বলল: কিন্তু তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, তাঁরাও ধীরে ধীরে উঠছেন।

পিছন ফিরে আমি কাউকে দেখতে পেলুম না।

আর স্বাতি যেন আরও তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল।

হঠাৎ আমার জো রায়ের কথা মনে পড়ে গেল। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললুম: জো রায় চমৎকার ছেলে।

স্বাতি বলল: এ কার কথা? তোমার?

বললুম: পরিচয় নিবিড় হলে তুমিও এই কথাই বলবে।

তোমার সঙ্গে বুঝি নিবিড় পরিচয় হয়েছে?

নিবিড় নয়, স্বাভাবিক বলতে পার। তাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখছি না।

আমার চোখেই যে সন্দেহের ঠুলি আছে, তা ভাবছ কেন?

বললুম: তাহলে আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারতে।

স্বাতি বলল: তোমার সঙ্গে আমার মতের কোন পার্থক্য নেই।

তার মুখে হাসি আর দৃষ্টিতে কৌতুক দেখে বললুম: এ আবার কী কথা?

ঠিক কথা। আমি যা ভাবি তা বলি না, আর তুমি যা বল তা ভাবো না। সেই জন্যই দুজনের মত দু রকম মনে হচ্ছে। এবারে অন্য কথা বল।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই জিজ্ঞাসা করলুম: হঠাৎ এমন পাগলামি কেন করলে?

স্বাতি যেন আশ্চর্য হয়ে বলল: পাগলামি আবার কী করলাম!

তোমার আচরণ আজ পাগলামি মনে হচ্ছে।

তোমার মনটাই তাহলে পাগল হয়েছে।

হেসে জবাব দিলুম : সে আজ নয়, অনেক দিন আগে।

কিন্তু স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : সত্যি পাগল হলেই ভাল ছিল। তোমার লক্ষ্য স্থির হত, দোমনা হয়ে কষ্ট পেতে না।

তুমি বুঝি সত্যিই পাগল হয়েছ ?

তোমার শেক্সপীয়র যেন কী বলেছেন ? The lunatic, the lover, and the poet—

বললুম : Are of imagination all Compact.

Compact মানে কী ?

একই উপাদানে তৈরি। পাগল প্রেমিক আর কবি, কল্পনায় তারা একই রকম। তোমার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে ? পাগল ওগো, প্রেমিক ওগো, সাধক ওগো ধরায় এসো।

এ আবার কোথায় পেলে ?

মনে নেই।

তার চেয়ে শেক্সপীয়র বল। ওই দু লাইনের পরে কী আছে ভুলে গেছি।

হেসে বললুম : তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার যা মনে হয়, সেই কথা।—Sees Helen's beauty in a brow of Egypt

আমি কি নিগ্রোর মতো ?

হেলেনের মতোও নও।

তামাশা নয়, সবটুকু বল।

বললুম : The lunatic, the lover, and the poet,
Are of imagination all Compact.
One sees more devils than vast hell can hold ;

That is the mad man ; the lover, all as frantic,
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt ;
The Poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven ;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation, and a name.

তারপর ?

বললুম : এর পরেও কয়েকটি সুন্দর লাইন আছে, তা মনে নেই।

এই প্রসঙ্গে স্বাতি আর কোন কথা কইল না।

আমরা অনেক দূর উঠে এসেছিলুম, হাঁপাচ্ছিলুম অল্প অল্প। স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : তোমার হাতটা এগিয়ে দাও তো !

বললুম : হাত দেখবে বুঝি !

না, হাত ধরে উঠব।

নিজের ডান হাতখানা আমি এগিয়ে দিচ্ছিলুম, তার কথা শুনে টেনে নিলুম। স্বাতি হেসে ফেলল।

বললুম : নিচে থেকে ওঁরা দেখে ফেলবেন।

দেখতে না পেলে বুঝি দিতে ?

এ কথার জবাব দিতে আমি পারলুম না, হেরে গেলুম তার কাছে। স্বাতির কৌতুকের যেন আর শেষ নেই।

পাহাড়ের উপরে পার্বতীর মন্দির, কিন্তু খুব উঁচু পাহাড় নয়। মাত্র আড়াই শো ফুট উঁচু। আর সিঁড়ির সংখ্যা মাত্র এক শো আটটি। খুব চওড়া সিঁড়ি বলেই নিচে থেকে ভয়াবহ মনে হয়েছিল। দু শো বছরের কিছু বেশি আগে পেশোয়া বালাজি বাজীরাও তাঁর মায়ের ইচ্ছায় এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পার্বতী ও দেবদেবেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই পাহাড়ে আরও কয়েকটি মন্দির আছে—গণপতি কার্তিক সূর্য ও বিষ্ণুর মন্দির।

কার্তিকের মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। এই নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যুবক পেশোয়া নারায়ণ রাও অপুত্রক মারা গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নানা ফাড়নবিশ এই কার্তিকের মন্দিরে মানত করেছিলেন যে বিধবা রাণীর যেন একটি পুত্রসন্তান জন্মে। ছেলে হয়েছিল রাণীর, তার নাম সোয়াই মাধব রাও। তার উপনয়ন হয়েছিল এই মন্দিরে।

শনিবার ওয়াডা প্রাসাদ থেকে এই মন্দিরে আসবার জন্যে নাকি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। বালাজি বাজীরাওএর পুত্র মাধব রাও এই মন্দিরেই মারা গিয়েছিলেন। অসুখে নয়, কোন ঘাতকের হাতেও নয়। পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা সেনার পরাজয়ের সংবাদ পেয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন। আর তাঁরই জীবিতকালে এই কার্তিকের মন্দিরে এক দিন বাজ পড়েছিল।

মূল মন্দিরের গবাক্ষ দিয়ে সমগ্র পুনা শহরের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সব দেখে শুনে এসে আমি হাত জুড়ে দেবীকে নমস্কার করতে যাচ্ছিলুম, স্বাতি বলল : প্রণাম কর।

নিজে হেঁট হয়ে মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। আমি তার পাশে বসে তাকেই অনুকরণ করলুম। চোখ মেলতেই দুজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। তারপরেই দেখলুম, অদূরে এক দম্পতি আমাদের লক্ষ্য করছেন।

আমরা উঠে দাঁড়াতেই তাঁরা আমাদের কাছে এসে উপস্থিত

হলেন। কোন ভূমিকা না করেই মহিলাটি স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করল: আপনার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?

একটা সামান্য কৌতূহলের নিতান্ত সরল প্রশ্ন। স্বাতি যে চমকে উঠল, তা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। মহিলার হিন্দী শুনে তাঁকে মারাঠী বলে চিনতে আমাদের সময় লাগে নি, তাঁর ভুল বুঝতেও দেরি হয় নি। আমরা যেমন তাঁদের দম্পতি ভাবছি, তাঁরাও আমাদের তাই ভেবেছেন। বাঙালী বলেও যে চিনতে পেরেছেন, তা তাঁর প্রশ্নেই বোঝা গেছে। বিবাহিত বাঙালী মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। স্বাতির সিঁথিতে সিঁদুর না দেখে তাঁর অন্য কিছু সন্দেহ হয় নি, শুধু বিস্ময় জেগেছে। অপরিসীম কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসংলগ্ন প্রশ্নে। আগে পরিচয় করে পরে এই প্রশ্ন করলে যেন কিছু শোভন হত। অশোভন মনে হল বলেই আমি রুদ্ধ-শ্বাসে স্বাতির উত্তর শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

স্বাতি বলল না যে সে বিবাহিত নয়, বলল: সিঁদুর সবাই পরে না।

কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু মহিলার প্রশ্নের সঠিক উত্তর এ হল না। বলা উচিত ছিল যে তার বিবাহ হয় নি বলেই মাথায় সিঁদুর ওঠে নি।

মহিলার স্বামী বললেন: চর্মরোগের ভয়ে অনেকেই আজকাল সিঁদুরের ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল কাতর ভাবে। আমি তাঁদের ভুল ভেঙে দিতে পারতুম। কিন্তু স্বাতির কাছে বারে বারে হেরে গিয়ে আমি তার শোধ নিলুম। বললুম: পুনায় আপনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

স্বাতি আমার দিকে কটমট করে তাকাল। কথার এই মোড় ফেরানোর জন্য তাঁদের ভুল ধারণা রয়েই গেল। কেন আমি সত্য কথা বললুম না, এর জন্য যেন আমিই দায়ী।

ভদ্রলোক বললেন: আমরা এই দেশেরই মানুষ। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, আজ ফিরে যাচ্ছি।

কথাটা পরিষ্কার হয় নি ভেবে বললেন: বাড়ি আমাদের শহরে নয়, গ্রামে। ট্রেন ধরতে পুনায় এসে এই মন্দিরে প্রণাম করে যাই।

কোথায় যাবেন?

আপাতত বম্বে, সেখান থেকে নাগপুরে যাব। নাগপুরেই চাকরি করি।

ভদ্রলোকের বেশবাস দেখে মনে হল যে আমার মতো তিনিও কোন সাধারণ কাজ করেন। পরে জেনেছিলুম যে নাগপুরের একটা কলেজে তিনি পড়ান। একটু বেশি সাধাসিধে বলে কেরানী বা স্কুলের মাস্টার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মহিলাটি স্বাতির মতোই। বয়সে কিছু বড় হলেও কথাবার্তায় একই রকম। বললেন: আপনারা?

স্বাতি বলল: আমরা কলকাতার লোক, বেড়াতে বেরিয়েছি। ডেকান এক্সপ্রেসে আমরাও বম্বে যাব।

আজ? তবে তো ভালই হল, আমরাও ঐ গাড়ি ধরব।

ঠিক এই সময়ে আমি মামীকে দেখতে পেলুম উপরে। তাঁর পিছনে মামা উঠলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। প্রসন্ন মুখে স্বাতি ছুটে গেল তাঁদের দিকে। আর মারাঠী দম্পতি আমার কাছে বিদায় নিয়ে নিচে নামবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। স্বাতির সঙ্গে মহিলাটির কী কথা হল, আমি তা শুনতে পেলুম না।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আবার সেই দম্পতির সঙ্গে দেখা হল। ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরি ছিল। স্বাতি চুপি চুপি বলল: গোপালদা, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব করলে নাগপুরের খবর পাওয়া যাবে।

কথটা এমন গম্ভীর ভাবে বলল যে তার ব্যঙ্গ আর চাপা রইল না। আমি কিন্তু সহজ ভাবেই উত্তর দিলুম: ভাল বলেছ। এস না, ভাব করি।

স্বাতি হাসল, কিন্তু আমি এগিয়ে গেলুম। আমি জানি, সেও এগিয়ে আসবে। জানবার আগ্রহ তার কম নয়, সে কথা শুধু প্রকাশ করতে চায় না।

আমাদের দেখতে পেয়েই মহিলাটি এগিয়ে এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনার বাবা-মাও বুঝি সঙ্গে আছেন?

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: আমার নয়, ওঁর।

বলে স্বাতিকে দেখিয়ে দিলুম। আমার মামা মামী বললে তাঁদের ভুল ভেঙে যাবার সন্দেহ ছিল। স্বাতি বোধহয় তাই চেয়েছিল, তাই আমার উত্তর শুনে চটে গেল, কোন কথা কইল না।

ভদ্রলোক একখানা সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন: পাহাড়ের নিচে রমনা দেখেছেন তো?

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। পার্বতীর মন্দির দেখে সবাই ফিরে আসেন, এ জায়গাটা কেউ দেখেন না। পেশোয়ারা সেখানে সারা ভারতের হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতেন শ্রাবণ মাসে।

বললুম: আমরা কিন্তু আপনার কাছে নাগপুরের গল্প শুনতে এসেছি।

ওঁর কাছে!

বলেই ভদ্রমহিলা হেসে উঠলেন।

আমি অপ্রস্তুত হবার ভান করলুম। আর মহিলাটি বললেন: উনি তো বাড়ি আর কলেজ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। কিছু জানবার থাকলে বরং আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

নাগপুরে দেখবার কী আছে, তাই জানবার ইচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন: বাজার সিনেমা—

মহিলাটি যোগ দিলেন: কলেজ—

আর কিছু আছে বলে তো জানি নে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে শুনি, গিন্নী হয় বাজারে গেছেন, নয় সিনেমায়। তৃতীয় কোন জায়গার নাম তো শুনি নি।

রাগত স্বরে মহিলা বললেন: বাইরে থেকে মানুষ কি বাজার করতে আসে, না সিনেমা দেখতে! নাগপুরের বিখ্যাত দুর্গ দেখ নি। ভোস্‌লার দুর্গ!

দেখেছি বৈ কি। সীতাবল্‌দি ও নাগপুরের যুদ্ধে ভোস্‌লা তাঁর রাজ্য হারিয়েছিলেন, আর এই গরিব সেইখানেই ক্যামেরাটা খোয়াচ্ছিল।

কী রকম?

সে কথা বলবেন না মশাই। দুর্গ তো সারা বছরই বন্ধ থাকে, কোন্‌ একটা পর্বে জনসাধারণের দেখবার জন্যে খুলে দেয়। তখন পিল পিল করে মানুষ পিঁপড়ের মতো পাহোড়ে উঠে দুর্গে ঢোকে। এঁর পাল্লায় পড়ে আমিও একবার ঢুকেছিলুম। পাহাড়ের উপরে দুর্গ তো! ইচ্ছে ছিল যে ঐ দুর্গ থেকে নিচের শহরের ছবি নেব। ক্যামেরাটা খুলতেই বিপদ, এক সৈন্য এসে ক্যামেরাটাই কেড়ে নিয়ে গেল।

কেন ?

দুর্গের ভিতরে ছবি তোলা নাকি মানা আছে। মিনতি করে বললাম যে সে হুকুম আমার জানা ছিল না, ঘাট হয়েছে, ক্যামেরাটা দয়া করে ফেরত দাও। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। অনেক শখের ক্যামেরা মশাই, দুর্গ দেখা আমার মাথায় উঠে গেল। অ্যাডজুটেণ্ট সাহেবের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলাম। বললাম, ফিল্মটা না হয় খুলেই রেখে দিন। অনেক খোশামোদে তাঁর মন গলল। ক্যামেরাটা আনিয়ে নিলেন, কিন্তু ফেরত দিলেন না। বললেন, এ তো দেখছি এক নম্বর ছবি। বললাম, তাও তুলতে পারি নি। তিনি বললেন, কী করে বুঝব যে তুলতে পারেন নি! বললাম, দিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে ক্যামেরাটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চটপট তাঁরই একখানা ছবি নিয়ে নিলুম। বললাম, এর পরেও যদি সন্দেহ থাকে তো দেওয়ালের একখানা ছবি তুলে ফেলুন। ফিল্ম আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, দামও অনেক। দণ্ডটা একখানা এক্সপোজারের উপর দিয়েই যাক।

পেলেন ফেরত ?

ফেরত না দিয়ে আর করবেন কী! গরিব মাস্টার যে শত্রুর চর নয়, সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি তাঁর ছিল

হেসে বললুম: তবে তো আপনি নাগপুরের সবই জানেন দেখছি।

গর্বিত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: নাগপুর কেন, ওয়ার্ধারও খবর রাখি।

বলেন কি!

ভদ্রলোক বললেন: গান্ধীজী যখন বেঁচে ছিলেন, তখনই প্রথম গিয়েছিলাম। বয়সে বালক না হলে তাঁর প্যারভিতে নিজের ব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে পারতাম।

প্যারভি!

কোনও ভাষায় এর প্রতিশব্দ নেই। সুপারিশ বলুন, রেকমেণ্ডেশন বলুন, প্যারভির কাছে কিছু নয়। এ দেশের সব কাজ এখন প্যারভিতে চলছে।

স্বাতি বলল : ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আশ্রম আছে বুঝি!

তাঁর কুঁড়ে ঘরখানি ঠিক তেমনি করে সাজানো আছে। স্টেশন থেকে মাইল কয়েক দূরে এই জায়গা।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : যে কুঁড়েতে মহাত্মাজী থাকতেন, যে বিছানায় শুতেন, আর যে খড়ম ব্যবহার করতেন, সে সবই সযত্নে রাখা আছে। তাঁর আদর্শেরও সম্মান আছে সেখানে। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁরা দিল্লীর দরবারে গিয়ে হারিয়ে যান নি।

আর সবাই কি হারিয়ে গেছেন?

ভদ্রলোক এ কথার উত্তর এড়িয়ে গেলেন, বললেন : এ তর্কের কথা। আমাদের কাজ নেই।

আরও কিছু আমাদের কথা হতে পারত, কিন্তু হল না। মামা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন।

স্বাতি বলল : ওঁরা বোধ হয় থার্ড ক্লাসে উঠবেন, আবার ওঁদের ধরতে হবে।

আমরা আজ বম্বে ফিরছি। এক দিন বম্বে থেকেও ফিরব। স্বাতিরা দিল্লী যাবে, আমি যাব কলকাতায়। অফিসে গিয়ে আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ দর্শাতে হবে। সে কারণ কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হলে চাকরিতে বহাল থাকব, নচেৎ নতুন করে ভাগ্যান্বেষণ। তার জন্য ভাবি না। এমন কিছু লোভনীয় বেতন নয় যে তার মোহ জন্মেছে। কাঁধে সংসারের জোয়াল থাকলেই সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়।

জো রায়ের সঙ্গে এইখানে আমার তফাত। তার ভাল কাজ,

মাইনে আরও ভাল। বম্বের সদর অফিসে পদস্থ অফিসার। হাওয়াই জাহাজে করে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের শাখা অফিস পরিদর্শন করে। তার চাকরিতে মোহ জন্মালে নিন্দার কারণ নেই। বরং তা না জন্মানোই অস্বাভাবিক।

জো রায়ের বিনয়-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গেছে। দ্বারকার ট্রেনে উঠে তার সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার সৌজন্য দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছে। মিঠাপুরে তার নামার কথা ছিল, নামে নি। আমাদের সঙ্গেই ওখা গেছে, এক নৌকোয় বেট দ্বারকা। ফিরেছেও এক সঙ্গে। স্বাতি অভদ্রতা করে নামিয়ে না দিলে সে সোমনাথেও এক সঙ্গে যেত।

জো রায়কে যে মামীর ভাল লেগেছে, তিনি তা অনেকবার প্রকাশ করেছেন। মামাকে তার বাবার নাম ঠিকানাও টুকে রাখতে বলেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবেন। এ দিকে জো রায়ও স্বাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, অগ্রসর হয়েছে মামীর চেয়েও বেশি। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে ইতিমধ্যেই হাত করবার চেষ্টা করেছে। আমার কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কিন্তু স্বাতির কাছে ঘেঁষতে পারে নি। স্বাতির একটা সুস্পষ্ট মতামত আছে, তা থেকে সে কোন মতেই বিচ্যুত হবে না। তার চোখে ধাঁধা লাগাতে পারে, এমন পুরুষ আমি আজও দেখি নি।

নিজের কথা ভাবতে আমার ভয় করে। আমাকে নিয়ে সে খেলা করছে কিনা এখনও বুঝতে পারি নি। এ কথাও ঠিক যে সে দিল্লীর রাণা ব্যানার্জিকে নিয়ে খেলা করে নি, বম্বের জো রায়কে নিয়েও না। কোন দিন কারও সঙ্গে খেলা করেছে বলেও আমি শুনি নি। তবু আমার ভয় যায় নি। তবু আমি ভরসা পাই নি। স্বাতিকে নিয়ে কোন সুখের স্বপ্ন দেখবার সাহস আমার আজও জন্মায় নি।

না-পাওয়ার একটা দুঃখ আছে। কিন্তু চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখ বড় মর্মান্তিক। এ আমার অভিজ্ঞতার কথা নয়, এমন অভিজ্ঞতার লোভ আমার নেই। যদি থাকত, তাহলে বেপরোয়া হতে পারতুম। প্রেমের ব্যাপারে নাকি বেপরোয়াই হতে হয়, স্পষ্ট ভাষায় দাবী জানাতে হয়। কেড়ে নিতে হয় নিজের হৃদয়ের ধন। ইতিহাসে উপন্যাসে নাটকে এমন বহু ঘটনা দেখেছি। দেখেছি পুরাণে আর রূপকথায়। প্রতি দিনের জীবনেও হয়তো এমন ঘটনা অনেক ঘটছে। কিন্তু আমি সাহস দেখাবার প্রেরণা পাই নে।

আমার সম্বন্ধে মামা যে কিছু ভেবেছেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষয় সম্পত্তি তাঁর প্রচুর ছিল। সরকার কেড়ে নিয়েছেন, খেসারত দিচ্ছেন অল্প অল্প করে। তাতে বহু টাকা পাওয়া যাবে। কলকাতায় নাকি খানকতক বাড়িও আছে, তার থেকে ভাড়া পান। জমিদারী সেরেস্তার জনকয়েক পুরনো কর্মচারীকে দিয়ে একটা ব্যবসাও চালাচ্ছেন, কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের অভাবে তার পুরো আয়টা পাচ্ছেন না। আমাকে ভার নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হতে পারি নি। স্বাতির প্রতি আমার কোন দুর্বলতা না থাকলে হয় তো আমি রাজী হতুম। এ কথা মামা বোঝেন। আরও বোঝেন যে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র তাঁর কন্যা। আর কারও কোন দাবী নেই। সে কন্যা যাকেই বিবাহ করুক না কেন, জলে সে কোন দিন পড়বে না। আমার মতো কোন দরিদ্রকে বিবাহ করলে হয়তো সাময়িক অভাব হতে পারে, কিন্তু ভয় পাবার মতো দুর্ঘটনা ঘটবে না। বয়সের সঙ্গে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে তিনি বিশ্বাস করেন যে অভাববোধ মানুষকে মাথা উঁচু করে বেশি দিন থাকতে দেয় না। নিজেদের জন্য নিচু না হলেও সন্তানের জন্য সবই করতে হয়। আর তার বেলায় তো হকের ধন। দু দিন আগে বা দু দিন পরে নেওয়া। তাঁর অবর্তমানে সবই তো তাঁর

মেয়েই পাবে। বিবাহের ব্যাপারে তাই তিনি স্বাতির পছন্দকেই মেনে নিতে চান।

এইখানে মামী সমাজ-সচেতন। বিবাহের পরে মেয়ে কষ্ট পাবে, তার চেয়ে বড় জামাতার প্রতিষ্ঠার কথা। প্রতিষ্ঠাবান জামাতা যদি উত্তর জীবনে মদ্যপ হয়, অত্যাচারী হয়, যদি সর্বস্বান্তও হয়ে যায়, তার জন্যে ভাবনা করা চলে না। সুখে লালিত মেয়ে বিবাহের পর থেকেই অভাবে দিনপাত করবে, এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রতিবিধান আছে, হয়তো একটা ব্যবস্থা করাও সম্ভব। কিন্তু একেবারে পরিচয়হীন একটা যুবককে কন্যা-দান করলে পাঁচজনে কী বলবে! বিত্ত নেই, কুল নেই, সমাজে একটা পরিচয় পর্যন্ত নেই। শুধু বিদ্যা আর বুদ্ধি দেখে কি কন্যাদান করা যায়! তাই তিনি এক বিলাত-ফেরত পাত্র পছন্দ করেছিলেন, তারপর দিল্লীর রাণা ব্যানার্জিকে। তার বাবা পুরনো আই. সি. এস., সে নিজেও কেন্দ্রে অফিসার হয়ে ঢুকেছে। জো রায়কেও চলতে পারে। সে দামী সুট পরে, ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে, হাওয়াই জাহাজেও ওড়ে।

আর আমি! আমার পরনের খদ্দর বড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। ট্রেনে দিনের পর দিন পরিচ্ছন্ন থাকা একটা সমস্যার ব্যাপার। নিজের পয়সায় আমি থার্ড ক্লাসেও এত ভ্রমণ করতে পারি নে। হালদার যা বলেছে, তা মিছে কথা বলেই মামী ভাবছেন। লটারিতে অত টাকা পেলে লোকের চালচলনই বদলে যেত। আর বই লেখা! বাঙলা দেশে লেখকের আজকাল অভাব নেই। পাঠক যত, লেখকও তত। লিখে যদি পেট ভরত, লেখকেরা তাহলে চাকরি করত না।

আমার উত্তরপাড়ার সংসার মামী দেখেন নি। দেখলে আরও ভয় পেতেন। একটি ভাড়াটে বাড়িতে নিচের তলার একখানি অন্ধকার ঘর। বিয়ে করলে ঐ একখানি ঘরেই আমাকে সংসার পাততে

হবে। বাড়িওয়ালা জানে, ঘরের ভাড়া আমার বাকি পড়ে, বাকি পড়ে হারানিধির হোটেলের পয়সা। প্রতি মাসে বাকি পড়ে না। মনের আনন্দে কোনখানে ঘুরে এলে সেই ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে।

গত পূজায় স্বাতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার পরে নিজের সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়েছি। কলকাতায় ফিরে অনেক ভাবনা ভেবেছি। লেখাপড়ায় তো কোন দিন খারাপ ছিলুম না, চেষ্টা করলে দিল্লীর পরীক্ষাতেও হয়তো উত্তীর্ণ হতে পারতুম। সে চেষ্টা করার ইচ্ছা কোন দিন হয় নি। মা বেঁচে থাকলে তাঁকে আমি ফাঁকি দিতে পারতুম না। অসময়ে মারা গিয়ে তিনি আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ দিয়েছেন। জীবনে বড় হবার যে প্রেরণা ছিল, তা তিনিই যোগাতেন। তিনিই তা সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন। কেরানীর জীবনে আমি সন্তুষ্ট হয়ে আছি।

গত বসন্তে দিল্লীতে আমার চোখ খুলেছে। দিল্লীতে প্রতিষ্ঠাকে মানুষ কত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আমি নিজের চোখে তা দেখেছি। কী আছে রাণা ব্যানার্জির! কিন্তু মামী তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আর চাওলা! বেচারা চাওলা! সমাজে সে মেকি বলে পরিচিত। খাঁটি জিনিসকে লোকে আজকাল মেকি বলে সন্দেহ করে। মেকির জৌলুস বেশি ; বর্তমান সমাজে তারই বেশি দাম। আমারও দাম হচ্ছিল। যদি আমি জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হয়ে একটা মাকাল ফলের মতো অন্তঃসারশূন্য জীবন যাপনে রাজী হতুম, তাহলে আমারও দাম হত। সাহেব আমলের ঝানু আই. সি. এস. মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর কন্যাকে আমার হাতেই সমর্পণ করে কৃতার্থ বোধ করতেন। কিন্তু জীবনকে আমি হারাতুম, হারাতুম তার চেয়েও বড় ঐশ্বর্য!

উত্তরপাড়ায় ফিরে এসে আমি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেছি। অনেক দরখাস্ত করেছি এধারে ওধারে।" দিল্লীতে পরীক্ষা দেবার

সময় আর নেই, বাসনাও নেই। সে সব চাকরিতে বন্ধন বড় বেশি, মোহও বেশি। জীবনটা কলের মতো হয়ে যায়, উন্নতির চেষ্টায় জীবনের আদর্শ যায় হারিয়ে। এ আমার নিজের ধারণা। হয় তো ভুল ধারণা। স্বাধীনতার লোভেই আমি কেরানী হয়েছিলুম। দায়িত্ব কম, নেই বললেই চলে। দশটা-পাঁচটা হাজরির পরে আমার নিজস্ব সময়। প্রাণ ভরে পড়াশুনো করা চলে। পড়িও আশ মিটিয়ে। এবারে কলেজে দরখাস্ত করেছি। দরখাস্ত করেছি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরির জন্যে। হঠাৎ কেন এই চেষ্টা এল, সে কথা ভাবতে গেলেই স্বাতির কথা মনে পড়ে। মামীর পছন্দ মতো একটা কাজ পেলে যেন আমি স্বাতির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব। দেশটা উদাসীন বলে সে সুযোগ আমার আসছে না। যদি আসে, হয়তো দেরিতেই আসবে। তখন না এলেও হয়তো আর কোন দুঃখ থাকবে না।

ট্রেন ছুটে চলেছে। মামী এবারে স্বাতিকে পাশে নিয়ে বসেছেন। আমি পিছনে বসেছি মামার সঙ্গে। মামী স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ওদের কোন ছেলে মেয়ে নেই ?

মামী কি সেই মারাঠী দম্পতির কথা জানতে চাইছেন! বোধহয় তাই। তাঁরা যে স্বামী স্ত্রী আমরাও এ কথা ধরে নিয়েছি। আর মামী ছেলে মেয়ের কথা ভাবছেন। তবে ঐ মারাঠী দম্পতির দোষ কী! নিজেদের মধ্যে বলাবলি না করে খোলাখুলি একটা কৌতূহল মেটাতে চেয়েছেন, এই তো! কিন্তু আমার মনে অন্য কথা এসে পড়েছিল। সে কথা আমি স্বাতিকে বলি নি। আমাদের আচরণে নিশ্চয়ই একটা স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতা ছিল, তাতেই তাঁরা ভুল বুঝেছেন। আমার চোখের সামনে সহসা সেই দৃশ্যটি ভেসে উঠল। দুজনে পাশাপাশি বসে আমরা পার্বতীকে প্রণাম করেছিলুম। মাথা তুলে হেসেছিলুম দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে। কেন হেসেছিলুম জানি নে, কী মনে হয়েছিল এখন মনে

নেই। মারাঠী দম্পতি আমাদের যে সম্বন্ধ সন্দেহ করেছেন, সে কথা কি আমাদের একবারও মনে হয় নি!

স্বাতি মামীর প্রশ্নের উত্তর দিল সংক্ষেপে, বলল : না।

মামা বললেন : গোপালকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে!

মুখ ফিরিয়ে স্বাতি বলল : বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে আবার।

ক্ষিধে!

বলে মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

স্বাতি বলল : চা খাবার পরে ছুটি দেব গোপালদাকে। ঐ মারাঠী ভদ্রলোকের কাছে যাবার জন্যই বোধ হয় মনে মনে ছটফট করছে।

আমি জানি যে স্বাতি নিজেও যাবে তাঁদের কাছে। সময় হলেই যাবে। বুফে কারের বেয়ারা এলে চায়ের অর্ডার দেবে, চা খেয়েই উঠে পড়বে এখানে থেকে। চুপ করে পথ চলতে তারও ভাল লাগে না।

কিন্তু তখনও আমি জানতুম না যে তার আরও একটা মতলব ছিল। সেই মতলবের কথা বুঝতে পেরেছিলুম বম্বে পৌঁছবার পরে।

৩২

চা শেষ করে স্বাতি আবার তার পুরনো প্রসঙ্গের অবতারণা করল। বলল: ঐ মারাঠী মহিলাকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছে গোপালদা?

বললুম: মহিলাদের সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনা নেই।

আমার কী মনে হয়েছে জান? মহিলা নিশ্চয়ই ভাল নাচতে জানেন।

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে। আর সে বুঝিয়ে বলল: দেখ নি, কেমন নেচে নেচে পাহাড় থেকে নামছিলেন।

বললুম: তুমিও তো অমনি করেই নেমেছিলে।

আমি!

স্বাতির কণ্ঠস্বরে আমি তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা শুনতে পেলুম। তার পরেই কেমন হল তার গলার স্বর। জিজ্ঞাসা করল: কোন্ গাড়িতে ওঁরা উঠেছেন দেখেছ?

বললুম: দেখেছি।

মামী ব্যস্ত হয়ে বললেন: যাবে নাকি ওদের কাছে?

স্বাতি বলল: মারাঠী নাচের সম্বন্ধে দু-একটি কথা জেনে আসব।

মামী কোন বাধা দিলেন না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলুম। বোধ হয় ভাবলেন যে মেয়েটা খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। কোন বারণ শুনছে না, বাধা দিলে তার জেদ বেড়ে যাচ্ছে। এ মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। বিবাহের ব্যাপারেও যদি এই রকম করে তাহলে তাঁর অশান্তির শেষ থাকবে না।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: গোপাল সঙ্গে থেকো।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমরা নেমে পড়লুম। ছুটে গিয়ে উঠলুম আর একটা গাড়িতে। বিদ্যুতের ট্রেন, বড় অল্প সময় থামে, চলতে শুরু করলেই দৌড়য়। তখন আর ওঠা সম্ভব নয়।

আমরা ঠিক গাড়িতে উঠেছিলুম। সেই মারাঠী দম্পতি আমাদের দেখে খুশী হলেন। একটু চেষ্টা করে আমাদের জন্যে বসবার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

স্বাতি নিজের কথাটিই তাড়াতাড়ি বলে ফেলল: মারাঠী নাচ গানের সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু জানতে এলাম।

মহিলাটি হেসে বললেন: আপনি কি আমাকে একজন শিল্পী সন্দেহ করে এ কথা জানতে এসেছেন?

তা করে থাকলে ভুল করেছি কি?

বিস্মিত হলেন সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকটি, বললেন: কেন এই সন্দেহ করলেন তা আগে বলুন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে গর্ব আর ধরে না। উত্তরটা আমিই দিলুন, বললুম: আপনার চলায় সে নাচের ভঙ্গি দেখেছে।

মহিলা স্বাতিকে বললেন: আপনিও তাহলে নাচতে জানেন?

স্বাতি বলল: জানি নে।

নিশ্চয়ই জানেন। তা না হলে এমন সন্দেহ কি সবাই করে, না সকলেই চায় নাচের কথা জানতে!

স্বাতি বড় বিব্রত বোধ করছিল। সত্য কথা জানা থাকলে উত্তরটা আমিই দিতে পারতুম। জানি না বলেই স্বাতিকে বললুম: বল না সত্যি কথা।

বেশ একটু দ্বিধা করে স্বাতি বলল: একটু আধটু শিখেছিলাম ছেলেবেলায়, এখন ভুলে গেছি।

বাঙলায় আমি বললুম: সত্যি! ফিরে গিয়ে এবারে তোমার নাচ দেখব!

স্বাতি বাঙলায় বলল : দেখাব ভাল করে।

ভদ্রলোক বললেন : লোকনৃত্যকে উনি লোকপ্রিয় করবার সংকল্প নিয়েছেন। এখন নিজে লোকান্তরিত না হন।

স্বাতি হেসে উঠল। আর আমি বললুম : কেন?

ভদ্রলোক বললেন : নাচতে নাচতে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন : নাচে পরিশ্রম আছে। এর চেয়ে ভাল শরীর চর্চা আর নেই।

আমি বললুম : আমার এক মারাঠী বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম যে মারাঠীদের নিজস্ব কোন নাচ নেই। যা আছে, তা বোধ হয় গুজরাত থেকে এসেছে। সেও একেবারে নিম্নস্তরের সমাজে।

ভদ্রলোক আমার কথাকে উড়িয়ে দিলেন না। বললেন : নৃত্য এমন জিনিস যে বেশি আনন্দ হলেই মানুষ নাচে। তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকতে পারে, নামও অনেক সময় থাকে না।

ভদ্রমহিলা বললেন : এ দেশে সত্যিই উচ্চাঙ্গ নৃত্য কিছু নেই। আমি কয়েকটি লোকনৃত্যের নাম জানি। লেজিম, দহিকলা বা দহিহাণ্ডি, নক্তা, কোলিয়ারা নাচ, দশাবতার, তমশা ও ফুলগদি। আমি লেজিম ও ফুলগদি নাচেরই সমর্থন করি।

স্বাতি একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল : একটু বুঝিয়ে বলবেন!

মুখে তো বোঝানো যায় না, নেচে দেখাতে হয়। আবার লোকনৃত্য এমন জিনিস যে একা নেচে কিছুই করা যায় না।

ভদ্রলোক বললেন : দোহাই তোমার, গাড়িতে আর ও চেষ্টা কোরো না, লোকে পাগল ভাববে।

সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে।

স্বামীকে এই জবাব দিয়ে স্বাতিকে বললেন : দহিহাণ্ডি একটা গ্রাম্য নাচ। কিন্তু সব জাতির মধ্যে সমান আদৃত। ঠাকুররাও

নাচে, আবার চিত্তপবন ব্রাহ্মণরাও নাচে। গোকুল অষ্টমীর পরের দিন কৃষ্ণের ননী চুরির কাহিনী স্মরণে এই নাচ।

ভদ্রলোক বললেন: গোকুল অষ্টমী বোধ হয় বাঙলায় নেই।

বললুম: বোধ হয় না।

মহারাষ্ট্রের এ একটা প্রধান উৎসব। গণেশ উৎসব হল সবচেয়ে বড়। ভাদ্র মাসে দশ দিন ধরে এই উৎসব হয়। এর জনপ্রিয়তা এনেছেন লোকমান্য তিলক। দশেরা দেওয়ালিরও উৎসব হয়। আর কৃষ্ণের জন্মদিনে হয় গোকুলাষ্টমীর উৎসব।

বললুম: বুঝেছি। আমরা বলি জন্মাষ্টমী। বাঙলা দেশেও উৎসব হয়।

ভদ্রমহিলা স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন: দহিহাণ্ডি কোন স্টেজের নাচ নয়। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ। মন্দিরের সামনে একটা দইএর হাঁড়ি ভেঙে ছেলেরা নাচতে বেরোবে। এক একটা বাড়ির সামনে গিয়ে গোবিন্দ বলে হাঁক দেবে। বাড়িতে একটা দইএর হাঁড়ি থাকে টাঙানো। প্রথম এক সারি ছেলে দাঁড়াবে, তাদের পিঠের উপরে আর এক সারি, তারপর কৃষ্ণ উঠবে সকলের উপরে। দইএর হাঁড়ি নামাবে, কিংবা ভাঙবে। তারপরে সেই ভাঙা হাড়ির কানা নিয়ে কাড়াকাড়ি। সেখান থেকে আর এক বাড়ি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এ আবার কেমন নাচ! এ তো খেলা, ধর্মের নামে খানিকটা আমোদ!

সব লোকনৃত্যই তো এই রকম। এর সঙ্গে যদি মেয়েরা বাজনা বাজায় আর দুলে দুলে নাচে, তাহলেই আপনি বলবেন, বেশ নাচ।

আমি বললুম: তারপর বলুন।

নকৃত্তা নাচ ঠিক উল্টো। এটা একটা হাসির ব্যাপার। কোলি আর কোলিন গান ও বাজনার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নাচবে। বিচিত্র পোশাক ও মুখোশ পরা নকৃত্তা প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি এমন বিচিত্র ভাবে করবে যে সবাই হাসবে। মাঝে মাঝে ছোট ছেলেদের ভয় দেখাবার

জন্যে কু-উ বলে চেঁচাবে, আর হাতের ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপের ভান করবে।

স্বাতি বলল : বেশ মজার নাচ তো!

ভদ্রমহিলা বললেন : জেলেদেরও একটা নাচ আছে। তার নাম কোলিয়াচা নাচ। জেলেরা দুধারে সারি বেঁধে দাঁড়াবে, তাদের হাতে একটি করে ছোট হাল। মাঝখানে দাঁড়াবে তাদের দলপতি তার বউকে নিয়ে—লাখাচি আর কোলিন। কোলিনের বাঁ হাত কোমরে, আর ডান হাতে একটা রুমাল। কোলিন সেই রুমাল দোলাবে এধার থেকে ওধারে, আর পা দুখানা বাজনার তালে তালে জুড়বে আর মেলবে। জেলেরাও স্থির হয়ে থাকবে না, হাল হাতে সামনে পিছনে এমন ভাবে এগোবে ও পেছোবে যে মনে হবে তারা সমুদ্রে নৌকো বাইছে।

স্বাতি বলে উঠল : চমৎকার আইডিয়া তো!

আমি বললুম : দলপতি কি দাঁড়িয়ে দেখবে?

না না, তা দেখবে কেন। তার কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। তার এক হাতে মদের বোতল, আর এক হাতে গেলাস। সে সেই মদ ঢালবে গেলাসে, আর কোলিনকেও এগিয়ে দেবে।

ভদ্রলোক বললেন : এই জেলেরা আজকাল বম্বে গিয়ে সভ্য হয়েছে। বলছে, এ নাচ তাদের নয়।

দশাবতার নৃত্য হয় মঞ্চের উপর। প্রথমে সূত্রধার এসে গণপতি ও সরস্বতীকে আহ্বান করবেন। তারপরে নৃত্যে নাট্যে দেখানো হবে বিষ্ণুর দশ অবতারের কাহিনী। রাম-রাবণের যুদ্ধ বা হিরণ্যকশিপু বধ খুবই জনপ্রিয় নাচ।

তমশা ঠিক নাচ নয়, এ একটা বাদ্য। পুরাকালে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের প্রেরণার জন্যে বাজানো হত। বৃটিশের আমলে এই তমশা এত কুৎসিত ও কদর্য রুচির ব্যাপার হয়েছিল যে বর্তমানে একে সভ্য করে পরিবেশনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হচ্ছে।

স্বাতি বলল : আপনিও কি এই চেষ্টা করছেন ?

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন : না। লেজিম ও ফুলগদি বলে ছুটো নাচ আছে, শরীর চর্চাতেও তাদের কাজে লাগানো যায়। লেজিম নাচে স্কুলের ময়দানে সমস্ত মেয়েকে এক সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া যায়। নাচের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি এতে আছে, লালিত্যও আছে। তাইতেই এর জনপ্রিয়তা।

ফুলগদি নাচ ছুজনে হয়। জায়গা থাকলে আরও অনেকে যোগ দিতে পারে। জোড়ায় জোড়ায় নাচবে। এই নাচের নানা বাহার। মেয়েরা মুখোমুখি হাত ধরতে পারে, জড়িয়েও ধরতে পারে। একজন স্থির থাকবে, আর একজন নাচবে, কিংবা ছুজনেই।

স্বাতি বলল : এ তো সাহেবদের বল নাচের মতো। সাহেব মেমের বদলে ছুটো মেয়ে।

অধ্যাপক ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, বললেন : ঠিক বলেছেন। কোনদিন হয়তো আমাদেরও নাচতে নামাবেন, কী বলেন ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি হেসে বললুম : ঐ কাজটি বোধ হয় আর পারব না।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : সরকার তোমাদের নাচাবে।

তারপরে বাঙলায় যোগ দিল : দড়ি আর ডুগডুগি আমি কিনে দেব।

আমিও বাঙলায় বললুম : গত পূজোয় তো কিনেছ শুনলুম। সরকারকে না দিয়ে সে তো নিজের হাতেই রেখেছ :

স্বাতি হাসল, কোন উত্তর দিল না।

ভদ্রলোকও উপভোগ করেছেন তার মন্তব্য, বললেন : সরকার নিজে যদি না নাচত, তাহলে ভাল হত।

রাজনীতির চর্চায় এসে পড়বার ভয়ে স্বাতি বলল : এ সব নাচ আপনি দেখেছেন ?

বলে ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল।

তিনি বললেন : কিছু দেখেছি, আর কিছু পড়েছি সরকারী বইএ।

সেই সঙ্গেই যোগ করলেন : এইবারে আপনাদের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

স্বাতি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : সর্বনাশ!

তার বাঙলা কথা তিনি বুঝলেন কিনা জানি না, কিন্তু মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে সে খুব বেকায়দায় পড়েছে।

আমি বললুম : আমাদের নাচ তো ধেই ধেই নাচ, যে নাচ শ্রীগৌরাঙ্গ নেচেছিলেন পুরীর সমুদ্র-তীরে।

অধ্যাপক বললেন : তাকে তো কীর্তন বলে শুনেছি।

স্বাতি বলল : রাইবিশে নাচ আমি দেখি নি। দেখেছি রবীন্দ্রনৃত্য।

মহিলা বললেন : সে আমিও দেখেছি।

আমি আরও কিছু বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী রাস দেখেছিলেন, দেখেছিলেন সাঁওতালের ঝুমুর নাচ। বাঙলা দেশের নাচের অভাব তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে গানের সঙ্গে নাচ শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে। গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী নাচের প্রবর্তন করেন। শুধু রাইবিশে নয়, কাঠি নাচও আছে বাঙলা দেশে, মালদহে গম্ভীরা আছে। কীর্তনের মতো বাউল আছে, যাত্রা আর কৃষ্ণলীলাও আছে।

কিন্তু এসব কথা বলে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমার ছিল না। সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত। ট্রেন বম্বে পৌঁছলেই আমাদের গল্পের শেষ। তার আগে মারাঠী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে হবে। নাচের প্রসঙ্গ সেই জন্যে বন্ধ হওয়া দরকার। বললুম : রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, শুধু বাঙলার নয়, বিশ্বের কবি। তাঁর কোনও কোনও গানের ভাবকে আমরা নাচে ফোটাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে চেষ্টা বাঙলার বাহিরে কতটা সার্থক হয়েছে, তা জানা যায় নি।

অধ্যাপক বললেন: রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা মনে হলেই আমি অভিভূত হয়ে যাই।

তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: দোহাই তোমার, গাড়িতে আর পাগলামি কোরো না।

হেসে বললুম: সাহিত্য বুঝি আপনার ভাল লাগে?

উত্তর তাঁর স্ত্রী দিলেন, বললেন: ভাল লাগা মানে! সারা দিন তো ঐ নিয়েই আছেন, তবু যদি নিজে কিছু লিখতে পারতেন!

স্বাতি তাঁর কথার ধরনে হাসল। কিন্তু আমি বললুম: আমার খুব লাভ হল।

কেন?

আপনাদের কাছে স্বাতি এসেছিল নাচের কথা জানতে। আর আমি সাহিত্যের কথা।

অধ্যাপক খুশী হয়ে বললেন: সত্যি নাকি!

তাঁর স্ত্রী বললেন: ভারি খুশী যে!

কেন হব না বল! জাতে মাস্টার তো, ছাত্র পেলেই আমাদের খুশী হওয়া উচিত।

বললুম: আমি খুব ভাল ছাত্র। যা বলবেন, সব মনে করে রাখব।

যে সব ভুলে যায়, তাকেও আমরা খারাপ বলি না। শোনবার সময় গোলমাল না করলেই ভাল ছাত্র বলি।

স্বাতি বলল: আমি কিন্তু চুপচাপ শুনতে পারি না। মাঝে মাঝেই আমার এটা সেটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।

ভদ্রমহিলা বললেন: শোনবার ধৈর্য আমার একেবারেই নেই।

ভদ্রলোক বললেন: বেশি নাচলে ঐ রকম হয়। স্থির হয়ে বসবার ধাত একেবারেই চলে যায়।

তাঁর স্ত্রী বললেন: বেশি নাচের জন্যে নয়। বেশি শোনার জন্যে। শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে।

এ স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। এর মধ্যে আমাদের কথা বলা উচিত নয়। আমি তাই নীরবে হাসলুম।

স্বাতি বলল: কেমন হাসছে দেখুন, নিজের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে।

কী করম?

ইতিহাসের গল্প শোনাবার সুযোগ পেলে এঁর খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না।

আপনি বুঝি—

না না, আমাকে মাস্টার ভাববেন না। চাকরিতে আমার কথা কইবার অধিকার নেই, আমাকে মুখ বুজে কলম পিষতে হয়।

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল: আপনি শুরু করুন, আর দেরি করলে সবটা হয়তো শোনাই হবে না।

আমি জানতুম, স্বাতি আমাকে থামতে বলবে। আমার কেরানীর কাজ সে অসম্মানের মনে করে। সে কেন, আরও অনেকে তাই মনে করে। শিক্ষিত যুবক তবু কেরানীর কাজ করে, মজুর হতে চায় না। লেখাপড়া শিখে মজুরি করার মধ্যে যেন অপমানের খোঁচা আছে, সারাক্ষণ বেঁধে। কিন্তু নিজের হাত দুটো কি ভগবান অন্যের কাজ দেখবার জন্য দিয়েছেন! কাজ করলে কেন জাত যাবে!

ভদ্রলোক বললেন: ভাষার ইতিহাসের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। শুনেছি মারাঠী অতি প্রাচীন ভাষা। বুদ্ধের জন্মের অনেক আগেও লোকে এই ভাষায় কথা বলত, আর মারাঠী ব্যাকরণও নাকি খ্রীষ্টের জন্মের

আগেই রচিত হয়েছিল। সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা বলেন যে দশম শতাব্দীর পর থেকে কিছু কিছু মারাঠী রচনা পাওয়া যায়। জনমনে সে সময়ে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল, তাই থেকেই সন্ত সাহিত্যের জন্ম। শিশুপাল বধ রুক্মিণী স্বয়ম্বর লীলা-চরিত্র তার উদাহরণ। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহানুভব নামে একটা সম্প্রদায় সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিলেন। সাহিত্যের উপরে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সময় থেকেই সাহিত্যের একটা ধারা দেখা যায়। জ্ঞানদেব জ্ঞানেশ্বরী নামে গীতার একটি ভাষ্য রচনা করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তারপর অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। গদ্যও লিখেছেন অনেকে। পেশোয়াদের আমলে চারণ কবির দেখা পাওয়া যায়, তাঁরা শাহিরী কবি নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই যুগটার শেষ হয়ে যায়।

ইংরেজ শাসনে সমাজের উপরে যে প্রভাব পড়ে, সাহিত্য তা থেকে রক্ষা পায় না। একটা রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকজন দিক্‌পালের আবির্ভাব ঘটে। উপন্যাসে হরিনারায়ণ আপ্তে, নাটকে দেবল, প্রবন্ধে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর। ভি. কে. রাজওয়াড়ে ইতিহাস লিখলেন, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ঝড় আনলেন বালগঙ্গাধর তিলক।

তিলকের নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত।

মহারাষ্ট্রের আঙিনা ছেড়ে তিনি ভারতের ময়দানে গিয়ে ঢুকেছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক ছিলেন। চিপলুনকর আগরকর ও তিলক—তিনজনেই পত্রিকা পরিচালনা করতেন।

কবিতার ক্ষেত্রে কেশব সূত প্রথম নাম। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিষয়বস্তুর বিস্তারে তিনি পুরনো যুগটাকে পিছনে ফেলে এলেন।

আজ যে মজুরদের নিয়ে আমরা এমন মাতামাতি করছি, তাদের দাবীর কথা কেশব সুত গত শতাব্দীতে লিখেছিলেন মজুরাবর উপাস মারীচী পালী।—

কাঁহীস সুগ্রাস সদয় তু দিলে,
সাধী আম্হা ভাকরহী ন কা মিলে ?

কাউকে তুমি সুগ্রাস সদয় দিলে, আমার ভাগ্যে কি মোটা রুটির একটা টুকরোও মিলবে না ?

কেশব সুত গীতি-কবিতাও প্রথম রচনা করেন। এবং তাঁর অনেকগুলি সার্থক গীতি-কবিতা আছে। রেভারেণ্ড তিলক দার্শনিক কবি, কবিতা লিখেছেন প্রকৃতি নিয়ে। বিনায়ক শুধু ঐতিহাসিক গাথা নয়, গানও লিখেছেন। সমালোচক মাধব জুলিয়ান কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আর চন্দ্রশেখরের কবিতায় আছে একটা ধ্রুপদী চাল। যশোবন্ত কুসুমাগ্রজ ও সাভারকর বিদ্রোহী কবি।

সাভারকর আমাদের পরিচিত নাম।

ভি. ডি. সাভারকর। ভারতবর্ষের লোকের কাছে তিনি বিদ্রোহী নেতা হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু মারাঠী সাহিত্যের তিনি একজন জনপ্রিয় কবি।

আরও অনেক কবি আছেন। গোবিন্দাগ্রজ করন্দিকর বালকবি 'বী' ভাম্বে গিরীশ পণ্ডিত টেকাড়ে। এঁরা সবাই একই ধারাকে অনুসরণ করেছেন। অনিল গদ্য কবিতার কবি, তবু তিনি এই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

কবিতার ক্ষেত্রে যাঁরা নূতন পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের নাম বি. এস. মার্ধেকর ও পি. এস. রেগে। মার্ধেকর অবক্ষয়বাদে ও রেগে দেহবাদে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। সার্থক কবিতার কথা হয়তো এখনও বলেন নি, কিন্তু নূতন ভঙ্গিতে নূতন কথা বলার চেষ্টা করছেন। শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ বিন্দা করন্দিকর ভাবে

মনমোহন—এঁদের সকলের কথা আমি জানি নে। ভঙ্গিসর্বস্ব দুর্বোধ্য লেখা বলে অনেকে এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন।

বললুম : বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রেও এই ধ্বনি উঠেছে। নবীনরা যে চেষ্টা করছেন, প্রবীণরা তাকে সমর্থন করছেন না। ভাল করে বিচার না করেই একটা কঠিন রায় দিয়ে দিচ্ছেন।

অধ্যাপক বললেন : তাতে ক্ষতি নেই। জন্মেই কোন কবি দেশকে চমকে দিতে পারেন নি। মানুষ সন্দেহের চোখে দেখেছে। বাহিরে অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু অন্তরে বিচার করেছে প্রতি দিন। যে দিন রসবোধ হয়েছে, সে দিন তাকে গ্রহণ করেছে অকুণ্ঠ প্রশংসায়। নূতনকে গ্রহণ করবার এই হল সনাতন রীতি।

তারপর নাটক।

মারাঠী সাহিত্যে নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এ অল্প দিনের নয়। শতবর্ষপূর্তির উৎসব অনেক বছর আগেই হয়ে গেছে। এই জনপ্রিয়তা সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। নাটকগুলি সগৌরবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। বম্বের সিনেমা অভিযান নাটকের গৌরব আজও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

বাঙলার রঙ্গমঞ্চের কথা আমার মনে পড়ল। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর ক্ষোভের কথা। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচিত হচ্ছে, সাহিত্যের প্রেরণায় নয়। কলকাতায় এখনও কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ চলছে। তার জন্যে ভাল নাটকের অভাব নাকি তীব্রভাবে অনুভব করা হচ্ছে। বাঙলার শক্তিমান লেখকেরা নাটকে মনোযোগ দিতে চাইছেন না। কিন্তু এ সব কথা বলে আমি অধ্যাপককে বাধা দিলুম না।

অধ্যাপক বললেন : মামা ওয়ারেরকরের নাম বোধহয় শুনেছেন?

শুনেছি বৈকি। তাঁকে চোখেও দেখেছি একবার। একটা

সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। মামা ওয়ারেরকর ও কাকা কালেলকর।

অধ্যাপক খুশী হয়ে বললেন: কাকা কালেলকর গুজরাতীতেই বেশি লিখেছেন। মারাঠী ভাষায় তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। মামা ওয়ারেরকরের লেখনী অক্লান্ত। উপন্যাস ও নাটকে তিনি সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম নাট্যকার নন। মারাঠী ভাষায় প্রথম নাটক লিখেছেন দেবল। শারদা তাঁর একখানি জনপ্রিয় নাটক। সমাজ সংস্কার তাঁর লেখার মূল সুর। খাদিলকর নাটক লিখেছেন পুরাণ বা ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে। তাঁর কীচক বধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। লর্ড কার্জনকে বালগঙ্গাধর তিলক আক্রমণ করেছিলেন, খাদিলকর এই কাহিনী পরিবেশন করেছিলেন কীচক বধে। কেলকর ও কবি গোবিন্দাগ্রজও কয়েকখানি ভাল নাটক লিখেছেন।

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন মামা ওয়ারেরকর। তাঁর দীর্ঘ জীবনে শ দেড়েক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার বেশির ভাগই নাটক। খুবই সমাজ-সচেতন সংস্কারবাদী নাটক। শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন। বাঙালী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ যে তিনি বাঙলার সমস্যা নিয়ে মৌলিক নাটক রচনাও করেছেন। তার নমুনা হাচমুলাচা চাপ ও পুরব বাঙ্গাল। প্রথমটায় তিনি বাঙলার পণপ্রথাকে ধিক্কার দিয়েছেন, আর দ্বিতীয়টায় এঁকেছেন প্রাক্-স্বাধীনতা দাঙ্গার কাহিনী।

মারাঠী ভাষায় নাট্যকারের অভাব নেই। কুসুমাগ্রজ দেশপাণ্ডে মুক্তাবাঈ দীক্ষিত কালেকর মনোহর। এঁদের অনেকে বিদেশী নাটকের অনুবাদও করেছেন।

গদ্য সাহিত্যের প্রথম নাম হরিনারায়ণ আপ্তে। তাঁকে কাদম্বরীর স্রষ্টা বলা যেতে পারে।

কাদম্বরী তো বাণভট্টের লেখা!

অধ্যাপক হেসে বললেন: উপন্যাসকে আমরা কাদম্বরী বলি।

সে কি!

শব্দটা বোধহয় বাণভট্ট থেকেই নেওয়া। উপন্যাস তখন কাদম্বরীর আদর্শেই লেখা হত। ছোট গল্পকে আমরা ছোট গল্প বলি না, বলি গোষ্ট। কেন বলি, তা জিজ্ঞেস করবেন না।

করব না। আপনি তার পরে বলুন।

হরিনারায়ণ আপ্তের কয়েকখানি উপন্যাস এখনও খুব জনপ্রিয় আছে। তার কারণ আমার মনে হয় ভাল উপন্যাসের অভাব। ফাড়কে ও খাণ্ডেকর অনেক উপন্যাস লিখেছেন। গুরুজী পেঁড্‌সে রেগে দেশাই চরঘরে শান্তারাম কালেকর মার্ধেকর এঁরাও উপন্যাস-লেখক। মহৎ উপন্যাস রচনার চেষ্টা সম্প্রতি কমে গেছে। নূতনত্বের চেষ্টায় এখন আঞ্চলিক উপন্যাসই বেশি রচিত হচ্ছে।

এর চেয়ে ছোট গল্পের পরিধি বড়। গল্পলেখকেরা শক্তিরও পরিচয় বেশি দিচ্ছেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিলকের নামই প্রথমে করা উচিত। তাঁর গীতারহস্য একখানি অমূল্য গ্রন্থ। পরাঞ্জপে জোগ কেলকর আলটেকর বেডেকর মার্ধেকর কুলকর্ণি শক্তিমান লেখক। ডক্টর কেটকর জ্ঞানকোষ রচনা করেছেন, তারখড় প্রথম ব্যাকরণ। রাজওয়াড়ে সরদেশাইএর নাম ইতিহাসে। সাহিত্যের ইতিহাসে পাঠক হর্শে নন্দপুরকর মুনথানকর প্রিয়লকরের নাম। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নামের শেষ নেই। এত নাম আপনাদের মনে থাকবে না।

স্বাতি বলল: সত্যিই থাকবে না।

আমি জানি, অনেকক্ষণ আগে থেকেই স্বাতির বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। যে কোন মেয়েই বিরক্ত হবে। বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকের নাম আমাদের কাছে বড় কথা নয়, বড় হল বৈশিষ্ট্যের কথা। পাণ্ডেরনাকের সঙ্গে আর কে কে উপন্যাস

লিখেছেন আমরা জানতে চাই না, কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্তে তিনি আজ সারা বিশ্বে খ্যাত হয়েছেন, সেই কথাই আমাদের কাছে আগ্রহের বিষয়। কালের তরঙ্গে যে নাম তলিয়ে যাবে, সে নাম নাই বা শুনলুম। যে রচনা কালজয়ী হবে আপন বৈশিষ্ট্যে, তারই কথা আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনব।

জানালার দিকে চেয়ে স্বাতি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল: এ কি, আমরা কি বম্বে এসে গেলাম!

অধ্যাপক হেসে বললেন: কল্যাণ তো আমরা অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। বম্বে পৌছতে আর দেরি নেই।

তবে?

তাতে ভাবনা কী!

বাবা মা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন।

অধ্যাপক হেসে বললেন: আপনি তো একা নন!

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে হাসলুম। তাঁরা কেন ভাবছেন, সে তো এঁরা জানেন না। স্বাতিও সে কথা বলতে পারল না।

তার পরে তার অন্ত কথা মনে পড়ল। বলে উঠল: ভালই হয়েছে।

কী ভাল হয়েছে?

সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই স্টেশনে আসবেন। আমরা দুজনে এক সঙ্গে নামব।

আমাদের বাঙলা কথা অধ্যাপক দম্পতি বুঝতে পারেন নি। ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম।

স্বাতি বলল: আমরাও।

ভদ্রমহিলা বললেন: ফেরার পথে নাগপুরে একবার নামবেন না?

অধ্যাপক বললেন: আমাদের ঠিকানা—

স্বাতি বলল : নাগপুর তো কলকাতার পথে। আমরা দিল্লী যাব।

এক মারাঠী বন্ধুর কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমরা এক সঙ্গে কাজ করতুম। হঠাৎ এক ওপরওয়ালা সাহেব এলেন, তিনিও মারাঠী। দুদিন পর থেকেই আমার মারাঠী বন্ধুকে বড় বিষণ্ণ দেখতে লাগলুম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে খুব বকুনি খাচ্ছে। তারপরে তারও মুখ খুলল। সে আমাদের সামনে ওপরওয়ালার সম্বন্ধে যা-তা বলতে লাগল। প্রত্যেকটি তাঁর দুর্বলতার কথা, যা আমরাও দেখতে পেতুম। শেষে আমরাও টিপ্পনি কাটতুম। তারপর আমাদের পালা। বন্ধুর উন্নতি হল, সাজা পেতে লাগলুম আমরা। মনোরঞ্জন গণনা করে বার করল যে আমাদের মারাঠী বন্ধু চরের কাজ করেছে। অফিসে তার বকুনি খাওয়াটা লোক দেখানো, সাহেবের বাড়ি গিয়ে ভালোমন্দ খেয়ে আসত। সেই থেকে মারাঠীদের উপরে আমার একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। আজ মনে হল যে এ আমার ভুল ধারণা।

হঠাৎ স্বাতির একটা প্রশ্ন আমার কানে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল : একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

কী কথা ?

মারাঠী মেয়েদের আমি কাছা দেওয়া ছবি দেখেছি।

ভদ্রমহিলা বললেন : ঠিকই দেখেছেন। শ্বশুরবাড়িতে আমরাও কাছা দিই। একটু গোঁড়া পরিবারে মেয়েরা আজও কাছা দিচ্ছে। কিন্তু বেশি দিন আর দেবে বলে মনে হয় না।

আমাদের ট্রেন একটার পর একটা আলোকিত স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক ভদ্রলোক তাঁর জিনিসপত্র দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ট্রেন এবারে থামবে। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালুম।

কাঁধের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস পেয়ে ফিরে দেখলুম যে স্বাতি আমার

গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখের পাশেই তার হাসিমুখ। আর দৃষ্টিতে কৌতুক যেন উপচে পড়ছে। ইচ্ছে হল যে তার কাঁধের উপর একটা হাত রাখি।

জো রায় সত্যিই স্টেশনে এসেছে। আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাদের গাড়ির দিকে অতি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। স্বাতি আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামল। জো রায়কে যেন দেখতেই পায় নি, এমনি ভাব।

আসুন।

বলে জো রায়কে আমি মামা মামীর কাছে নিয়ে এলুম। স্বাতি আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে রইল যে মামীর তা অশোভন বলে মনে হল। তিনি আমাদের মাঝখানে আসবার আগে আমি তফাতে সরে গেলুম।

জো রায় হেঁট হয়ে মামা মামীর পায়ের ধুলো নিল। মামীই প্রথম কথা কইলেন: পুনা যাওয়া এমন হঠাৎ স্থির হল যে তোমাকে জানাতে পারলাম না।

জো রায় যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তা তার উত্তরেই ধরা পড়ল। বলল: তাতে কী হয়েছে।

মামী বললেন: তোমাকে বললে তুমিও হয়তো সঙ্গে যেতে পারতে।

তা পারতুম। আমি দুদিন ছুটি নিয়েছিলুম।

তাই নাকি! দেখলে তো।

বলে মামী তাঁর অভিযোগ জানালেন মামাকে। মামা কিছুই বললেন না।

জো রায় বলল: আসুন।

মামা এবারে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় উঠবে এবারে?

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি তখন নিজেরই মনের রঙে তাকে রাঙা দেখছিলুম। ভেবেছিলুম যে জো রায়ের কথায় সে কৌতুক বোধ করেছে। আমার এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে সে অন্য কিছু ভাবতে পারে, বা অন্য কিছু ভাবা তার পক্ষে সম্ভব। কী

পরামর্শ দেব তা ভেবে পাবার আগেই জো রায় বলল : আমার ফ্ল্যাটে আসুন।

খুশী হয়ে মামী মামার দিকে তাকালেন। কিন্তু স্বাতি বলে উঠল : বম্বের রিটায়ারিং রুম খুব ভাল শুনেছি।

সে কি, রিটায়ারিং রুমে উঠবেন কেন ?

স্বাতি তৎপরভাবে জবাব দিল : আপনাদের ফ্ল্যাটে ওঠা তো নিয়মবিরুদ্ধ শুনেছি। এসো গোপালদা।

বলে স্বাতি হনহন করে এগিয়ে চলল।

মামা বললেন : রিটায়ারিং রুমে জায়গা পেলে আমরা অন্যত্র যাব না।

ডবল বেড রিটায়ারিং রুম পাওয়া গেল একখানা, আর একখানা সিঙ্গল বেড। কিন্তু তা পাশাপাশি নয়। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের দোতলায় অতি সুন্দর ঘর, আধুনিক ফার্নিচারে সাজানো। এমন আরামপ্রদ বড় ঘর ও বাথ-রুম কোন স্টেশনে নেই। কিন্তু পরে সিঙ্গল বেড ঘর দেখে লজ্জা হল। একেবারে অন্য ধারে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং হলের সঙ্গে লাগোয়া কয়েকখানি ছোট ঘর পাশাপাশি। বাথ-রুম অ্যাটাচ্‌ড নয়, বাইরে গোটা দুই বাথ-রুম সকলের ব্যবহারের জন্য। ওয়েটিং হলের যাত্রীরাও ব্যবহার করছে। আমাকে পৌঁছতে এসে স্বাতি আবিষ্কার করেছিল যে খাটের পায়া নড়বড় করছে। ডানলোপিলোর গদি মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিল সে-ই। বেয়ারাকে ডেকে অনুযোগ করেছিল, খাট ভেঙে মানুষ পড়ে যাবে যে। আর বেয়ারা নির্বিচারভাবে বলেছিল, খাট না ভাঙলে বদল হবে না।

রিটায়ারিং রুমে আমাদের পৌঁছে দিয়ে জো রায় ফিরে যায় নি। মামীর অনুরোধে তেতলার রেস্তোরাঁয় খেল আমাদেরই সঙ্গে। তারপর সকালেই আবার আসবে বলে ফিরে গেল। দিল্লীর রাণার মতো শহর দেখাবার ভার নিল বম্বের জো রায়।

পরদিন ভোর বেলায় বন্ধ দরজার উপরে করাঘাতের শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। তার পরেই শুনতে পেলুম স্বাতির কণ্ঠস্বর : আর কত ঘুমোবে বল তো।

বারান্দায় বেরিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আকাশে একটু আলো ফুটেছে বটে, কিন্তু বারান্দায় এখনও অন্ধকার আছে। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

তোমার কাণ্ড দেখে।

পড়ে পড়ে শুধু ঘুমোবে, কেউ ডেকে দিলেই দোষ।

মানুষ মাত্রেই রাতে ঘুমোয়। যারা শুওড়া গাছে থাকে, তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

স্বাতি রাগের ভান করে বলল : ঘাড় মটকাব। বেরোবার জন্যে চট করে তৈরি হয়ে নাও।

সে কি!

সে কথা পরে হবে।

বলে আমাকে বাথ-রুমের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে বসে পড়ল আমার ঘরে। আমি জানি যে তার সংকল্পে দৃঢ়তা আছে। বেরোবার ইচ্ছা হলে কারও কথাই সে মানবে না। মামা আপত্তি করবেন না, আর মামী এক-আধবার বলেই ক্ষান্ত হবেন। স্বাতি বেরিয়ে যাবার পরে তিনি মামাকে দায়ী করবেন তাঁর শাসনের অভাবের জন্য। যথাসম্ভব অল্প সময়েই আমি মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে এলুম।

স্বাতি আর দেরি করল না। ঘরে তালা দিয়ে বলল : চল।

বললুম : বেরোবার হুকুম পেয়েছ তো!

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দোতলা থেকে আমরা নিচে নামলুম। ওধারে লিফ্‌ট্‌ ছিল এধারে নেই। ওধারে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম, এধারে থার্ড

ক্লাস ওয়েটিং হল। এধারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চারি দিক, এধারে আবর্জনায় অপরিচ্ছন্ন সব কিছু। কিন্তু স্টেশনের বাইরে সেই একই রাস্তা। বরি বন্দর।

প্রভাতের সূর্যকিরণে পথ তখন ঝকঝক করছে। স্বাতির পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার সন্দেহ রইল না যে তার মনও ঐ আলোর মতো ঝকঝক করছে। বললুম: আজ এ কী খেলা হল?

খেলা আবার কিসের! এক দিন লুকিয়ে বেরিয়েছিলাম, আজ না হয় জানিয়েই বেরোলাম।

মনে পড়েছে। মাদ্রাজে সে দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল। রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, আর সকালটি মিষ্টি ছিল আজকের মতোই। ধীরে ধীরে আমি কয়ুম নদীর পুলের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। স্বাতি যে আমাকে অনুসরণ করেছিল, আমি তা জানতেও পারি নি। তার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। বললুম: সে দিন লুকিয়ে এসেছিলে সত্যি। ধরা পড়ে গেলে একটু লজ্জা পেতে। কিন্তু তোমার আজকের-কাজের পরিণাম নিষ্ঠুর হতে পারে। বিয়েটাই হয়তো আটকে যাবে।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: যদি বলি, মতলবটা ঐ রকমই কিছু।

তাহলে আমি তা কোন্ ভাগ্যবানের জন্যে তা জানতে চাইব।

সে থাকে তাল গাছের মাথায়, কারিয়া পিরেত বা।

জিভ কেটে আমি উত্তর দিলুম: আরে মুংরি, তেরা সরম নেহি বা!

দুজনেই হাসলুম অনেকক্ষণ ধরে। তার পর জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় নিয়ে যাবে?

স্বাতি বলল: অমন নীরস কথা আজ ভাল লাগছে না।

তবে কবিতায় বলি—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?

বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

স্বাতি বলে উঠল : নিরুদ্দেশে।

সে আবার কোথায় ?

ঐ তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বলে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ল। চাট ফুচ্‌কা গোলগাপ্পার দোকান। গরম গরম ভাজছে এই সকাল বেলায়। খদ্দেরও জুটেছে। আমরাও জুটে গেলুম। বেশ জাঁকিয়ে বসে স্বাতি বলল : আজ আর পরিজ আর পাঁউরুটি নয়, ডিমের পোচ বা ওমলেটও না। আজ তোমাকে ফতুর করে দেব।

ফতুরকে আর ফতুর করবে কি !

এইখানেই বিপদের শেষ ভাবলে ভুল করবে। দু পা এগিয়েই আবার খেতে চাইব।

বললুম : রাজভোগ খেতে চাইলে ভয়ের কারণ ছিল। তুমি তো আমারই মতো বাদশাহ, ঘুগনি আর পকৌড়া পেলে কোপ্তা আর কালিয়া মুখে রোচে না।

স্বাতি বলল : সারা দিন গাড়ি চড়ব।

বললুম : গরুর গাড়ি নয় তো।

খেয়েদেয়ে যখন পয়সা দিচ্ছিলুম, স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তোমার পকেটে আজ কত পয়সা আছে গোপালদা ?

বললুম : আছে কয়েকটা ফুটো পয়সা।

পকেটটা ফুটো নয় তো ?

বলে স্বাতি হাসতে লাগল। তার এমন ছেলেমানুষি আমি কোনদিন দেখি নি। মনে হচ্ছিল, কোন স্কুলের মেয়ে আজ স্কুল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তাই তার আনন্দের সীমা নেই। বললুম : জুহু যাবে ?

স্বাতি বলল : আমাদের তো স্নানের জামা নেই, বালির

উপরে বসে অন্যের স্নান দেখতে হবে। লোকে অসভ্য বলবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। জুহুর সমুদ্রবেলায় প্রায়-নিরাবরণ নরনারী উন্মত্ত হয়ে স্নান করে, ঢলাঢলি করে বালির উপরে: সেই সব ছবিই আমাদের চোখে অশোভন লাগে। তর্কের খাতিরে তবু বললুম: সেই তো সভ্যতা। যে যত অসভ্য হতে পারে, সভ্যতার গর্ব তারই তত বেশি।

স্বাতি বলল: এ তোমার প্রগতি-বিরোধী মন। মনকে সংস্কার-মুক্ত রেখো সারাক্ষণ। এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়েই স্বাতি বলল: ওঠো ওঠো।

বলে আমাকে ঠেলে দিয়ে নিজেও উঠে বসল। ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকাতেই হুকুম দিল: চৌপাঠী।

আমি তার দিকে তাকাতেই হেসে বলল: বালির ওপরে বসে সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা হয়েছে তো, চৌপাঠী তোমার ভাল লাগবে।

বরি বন্দর থেকে আমরা মেরিন ড্রাইভে এলুম। তারপরে এগোলুম চৌপাঠীর দিকে। নিজের কথাই আমার মনে আসছিল। মনে হচ্ছিল যে একলা চলার জন্য মানুষের জন্ম হয় নি। কিন্তু তবু মানুষ ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। অর্থের প্রয়োজন মানুষকে নিঃসঙ্গ থাকতে প্রবৃত্ত করছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম মানুষও সেদিন নিঃসঙ্গ থাকতে চায় নি। নিঃসঙ্গ জীবন তার বিধাতার অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজকের মানুষ এই অভিশাপ নিচ্ছে মাথা পেতে।

দূর থেকে চৌপাঠী দেখতে পেয়েই স্বাতি বলে উঠল: রোকো রোকো।

গাড়ি থামতেই ঝুপ করে নেমে পড়ল সে। আমি ভাড়া মিটিয়ে দিতেই বলে উঠল: তোমার পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম।

তারপর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল।

প্রভাতের প্রসন্ন রোদ পায়ের নিচে চিক চিক করছে। বাতাস বইছে অল্প অল্প। দেহ হালকা লাগছে, আর মনের পাখা মুক্ত হয়েছে অনেকক্ষণ। স্বাতি বলল: চলতে চলতেও কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে।

বললুম: কিছু ভাবব না, এই কথাই সারা দিন ভাবি।

এও যে একটা ভাবনার কথা। কিন্তু আমি ভাবতে পারব না।

তাহলে তপস্যা কর, কোন মন্দিরে গিয়ে তপস্যা।

স্বাতি বলল: রক্ষা কর, তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি নে।

বললুম: বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাই নে, তাই হেঁয়ালি, মহাপুরুষদের কথা শোন নি!

তুমি কি আজকাল নিজেকেও মহাপুরুষ ভাবছ?

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পিছনে টান আছে বলে পারছি না।

তোমার আবার কিসের টান?

গম্ভীর ভাবে বললুম: নক্ষত্রের।

স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল: বোসো তাহলে, চলতে চলতে টানাটানি ভাল নয়।

কথায় কথায় আমরা চৌপাঠীতেই পৌঁছে গিয়েছিলুম। একটুখানি নিরিবিলিতে গিয়ে বসে পড়লুম দুজনে। খানিকটা শুকনো বালি টেনে নিয়ে স্বাতি বলল: এস, এই বালি দিয়ে একটা মন্দির গড়ি, সেই মন্দিরে আমরা দুজনে তপস্যা করব।

বালির মন্দিরের নামে আমার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। কিন্তু স্বাতি যে তা শুনতে পাবে, আমি সে আশঙ্কা করি নি। বলল: কী হল?

আমি সত্য কথাই বললুম: বালির মন্দির আমরা আর কতকাল গড়ব?

স্বাতি হেসে বলল: সমুদ্রের তীরে যে শুধু বালি, পাথর আছে

পাহাড়ের ওপরে। এর পরে আমরা হিমালয়ে যাব, হিমালয়ে। হিমালয়ের মন্দির কোনদিন ভাঙে না।

আমাদের মতো আরও অনেকে এই সুন্দর সকালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করতে বসেছে। বালির উপরে শুয়ে পড়েছে কেউ, কেউ বা ঘনিয়ে বসেছে। কারও মুখে কৌতুকের হাসি, কারও মুখ থম থম করছে আষাঢ়ের মেঘের মতো। লম্বা আঙুল দিয়ে স্বাতি বালি টেনে টেনে এক জায়গায় জড়ো করছিল। আমি তার আঙুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। মনে পড়ল যে দিল্লীতে এক দিন সে এই আঙুলে আমাকে সেতার বাজিয়ে শুনিয়েছিল। আমি দূর থেকে সেই বাজনা শুনেছিলুন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, বলল: আবার কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে।

বললুম: তোমার ঐ আঙুলের দিকে চেয়ে আমার একটা পুরনো কথা মনে পড়ছে।

কী কথা?

তোমার সেতার বাজানোর কথা।

স্বাতি যেন চমকে উঠল: সে কথা তোমার মনে আছে?

আছে বৈকি। তুমি সেদিন বেহাগ শুনিয়েছিলে। বসন্তের কোন রাগিণী শোনাতে চাও নি গত ফাল্গুনে।

স্বাতি ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল: কেন?

তুমি ভুলে গেছ!

স্বাতি বলল না যে ভুলে গেছে, মনে আছেও বলল না। শুধু তার নির্বাক দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম: বলেছিলে, তোমার বসন্ত গেছে শেষ হয়ে, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

স্বাতির মুখ বুঝি আরক্ত হল, বলল: তুমি অনেক বাজে কথা মনে রাখ।

আমি জানতুম যে ও তোমার বাজে কথা। বসন্ত এসেছে দ্বারে, তাকে তুমি গ্রহণ করতে পারছ না।

আঙুল দিয়ে বালির পাহাড়টা স্বাতি সহসা ভেঙে দিল। বলল: দেখলে তো, তোমার বসন্তের বাতাসে আমার মন্দিরটাই গেল ভেঙে।

বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল: সারাদিন আজ আমি এইখানে শুয়ে থাকব।

ক্ষিধে পেলে?

উঠব না।

বালি তেতে উঠলে?

উঠব না।

কিন্তু পরক্ষণেই উঠে বসে বলল: একটা কথা জানতে চাইলে তুমি রাগ করবে না তো?

বললুম: খুশী হব।

তবে তোমার ছেলেবেলার কথা বল।

স্বাতিকে আজ বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কিন্তু সে যে এমন একটা প্রশ্ন করে বসবে, এ কথা আমি ভাবতে পারি নি। এর জবাব দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। সমস্ত প্রশ্নের জবাব যারা তৈরি হয়ে দেয়, আমি তাদের দলে নই। আমি আমার মানসিক প্রস্তুতির কথা ভাবছি। আমার শৈশবের কথা কোন দিন কেউ জানতে চায় নি, স্বপ্নেও ভাবি নি যে কেউ কোন দিন জানতে চাইবে। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হল।

স্বাতি বলল: তুমি তো খুশী হবে বলেছিলে!

খুশী! হ্যাঁ, খুশী হয়েছি বৈকি। যে কথা কেউ কোন দিন জানতে চায় নি, সেই কথা আজ তুমি জানতে চাইলে। আমার খুশী হবারই কথা।

স্বাতির চোখে একরকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখলুম। মনে হল,

আমিও এমনি একটি মুহূর্তের অপেক্ষা করেছি অনেক দিন ধরে। চেয়েছি এমনি একটি মানুষ যে আমার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বেঁধে দেবে স্নেহে ও প্রশ্রয়ে, জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে।

স্বাতি বলল: বল।

বললুম: বলব। শৈশবের কথা আমার মনে আছে। মা কোন দিন সে কথা ভুলতে দেন নি। প্রথম যেদিন কথা কইতে শিখলুম, সেই আধো আধো গলায় সুর মিলিয়ে স্তোত্র পাঠ করতুম বাবার সঙ্গে। মানে বুঝি নি। কিন্তু মনে মনে গাঁথা হয়ে গেছে। পরে সেই সব শ্লোকের মানে বুঝলুম রবীন্দ্রনাথ পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পড়ে যে উপনিষদে হাতে খড়ি হয়, সে শিক্ষা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছিলুম।

তারপর হাতের লেখা লিখতে শুরু করলুম। ঐক্য বাক্য মাণিক্য নয়, লিখলুম জল পড়ে পাতা নড়ে। লিখলুম, মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে। কটা বছর যেতে না যেতেই লিখলুম, এ পাখার বাণী দিল আনি···পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ। আমার অন্তরেও এল আবেগ। ওড়বার নয়, পড়বার। আমি প্রাণ ভরে পড়লুম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করে মনে হল, আমার সব পড়া হয়ে গেছে। বাবাকে সেই কথা বলতেই তিনি হেসে বললেন, সব মনে রাখতে পারলেই সব পড়া হয়েছে। তাঁর সেই হাসিটি আমার আজও মনে আছে।

বাবা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই জাতের লেখক। যাঁকে পড়লে দুনিয়ার অনেক লেখা পড়া হয়ে যায়। তবু আমি দুনিয়ার অনেক লেখকের লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি। কিছুই আসে যায় না তাতে। বাবা বলতেন, বুদ্ধির পিছনে আছে একটা ঘুমন্ত মন। আজ যা বোঝা গেল না, এক দিন সেই না-বোঝা কথা নিজের কথা হয়ে বেরিয়ে আসবে। তপস্যা তো

শরীরের কসরৎ নয়, বুদ্ধির বিকাশ। যতটুকু জানা আছে, তার পরের কথা জানবার জন্য সাধনা।

নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। তাঁর ধ্যান জ্ঞান পরম তপ ছিল ছাত্র। বিদ্যালয়ের বাইরে যে জগৎ, সেখানে ভয় সঙ্কোচ প্রভৃতি পদক্ষেপে তাঁকে অস্থির করেছে। নিজের গৃহকেও তাই বিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই নিয়েই বিয়াল্লিশটা বছর বেঁচে ছিলেন। যে বারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব, সেই বারে তিনি মারা গেলেন।

একজন শিক্ষকের গল্প পড়েছিলুম একখানা ইংরেজী বইএ। কবি ম্যাথু আর্নল্ডের পিতা ডক্টর টমাস আর্নল্ডের কথা। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখনও তাঁর ছাত্রদের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, ওরে, সন্ধ্যে যে হয়ে এল, এবারে তোরা ঘরে যা। সে-ই তাঁর শেষ কথা। বাবার মৃত্যুর ক্ষণটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'মাই বয়েজ' বলে তিনি ছাত্রদের ডাকেন নি সত্য, কিন্তু নির্বাক চোখে খুঁজেছিলেন অনেককে, শুধু আমাকে দেখেই তৃপ্ত হন নি। তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ না হয়ে বাষট্টি হলে হয়তো 'মাই বয়েজ' বলেই ছাত্রদের ডাকতেন।

এর পরে অনেকক্ষণ আমি কথা কইতে পারলুম না। স্বাতিও কোন প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত করল না।

ম্যাথু আর্নল্ড আমি কোন দিন হতে পারব না। কিন্তু সেই উচ্চাশা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বললুম: পৈতৃক ভিটে আর সামান্য কিছু জমিজমা ছাড়া আর কিছুই বাবা রেখে যান নি। দরকারও হয় নি। ম্যাট্রিকের ফল দেখে কলকাতার অনেকগুলো কলেজ আমাকে ডেকে পাঠাল। কলেজের ফী লাগল না, হস্টেলের খরচও দিতে হল না। বৃত্তির টাকা পাঠাতুম মায়ের কাছে। এক বেলা ছাত্র পড়িয়ে আরও কিছু টাকা পেতুম। এতে মার গভীর আপত্তি ছিল। তাঁর আপত্তির কারণ আমি

জানতুম। আই.এ. পরীক্ষার ফল খারাপ হলে আমার বৃত্তি বন্ধ হবে, তাহলে আর পড়া হবে না। কিন্তু আমার জীবনের ওপর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ছিল কারও। সব কটা পরীক্ষা আমি সসম্মানে পাস হয়ে গেলুম।

মায়ের মৃত্যু হল এই সময়ে। তিনি বেঁচে থাকলে আমার জীবন অন্য রকম হত। অন্তত অন্য রকম করবার চেষ্টা করতে হত। তাঁর ছেলে জজ হবে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট, এই রকমের আশা ছিল তাঁর মনে। অনেকবার তাঁর মুখে এ কথা শুনেছি। বলতেন, গোপাল, দিল্লীতে গিয়ে তোকে পরীক্ষা দিতে হবে। ওপর থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ করবেন।

কেন আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করলুম না, সে কথা ভাল করে ভেবে দেখি নি। পরীক্ষার ভয় ছিল না তা জানি। খরচও জুটিয়ে নিতে পারতুম। তবু কেন সে দিকে গেলুম না? এক দিন মনে হয়েছিল যে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ, সে আমার নয়। আমার অন্য পথ। কিন্তু সেই পথ কি আজও খুঁজে পেয়েছি?

এই ভাবটি যে বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম, তাতে আজ আমার সন্দেহ নেই। তিনি অহংকারী ছিলেন না, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। সেটাই লোকে তাঁর অহংকার বলে ভুল করত। মামাও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। বাবার সঙ্গে কোন রেষারেষির কথা আমি মায়ের কাছে শুনি নি। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বাবা যে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, পরে আমি তা জানতে পেরেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, জীবনে দুর্যোগ আসে অনেক, কিন্তু ওপরে ভগবান আছেন। দয়ার জন্য মানুষের দ্বারস্থ যেন আমরা না হই। বাবার এই অনুরোধ মা তাঁর আদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মামার সমস্ত সাহায্য তিনি কঠিন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ সব আমি জানতুম না। কিছু দিন আগে মামা নিজেই এ কথা

বলেছিলেন। তবু যে তাঁর স্নেহ আমি হারাই নি, এ কথা ভাবতে ভাল লাগছে।

আস্তে আস্তে স্বাতি বলল: বাবার কাছে এ কথা আমিও শুনেছি। তোমার মা ছিলেন বাবার পাতানো বোন। নিজের বোন হলে নিশ্চয়ই এমন হত না।

থাক সে কথা। এস আজ অন্য কথা বলি।

কিন্তু নতুন কথা কিছুই মনে এল না, স্বাতিরও না। সমুদ্রের দিকে চেয়ে আমরা নীরবে বসে রইলুম, আর তার গান শুনতে লাগলুম দু কান ভরে।

অকস্মাৎ জো রায়ের কণ্ঠস্বরে আমাদের ধ্যান ভাঙল। পিছন থেকে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠল: আপনারা এখানে! আর আমি সমস্ত বোম্বাই শহর আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি!

দুজনেই আমরা চমকে উঠলুম। জো রায় আমার হাত ধরে টানল, আর স্বাতিকে বলল: উঠে পড়ুন।

কথা না বলেই আমরা জো রায়ের গাড়িতে এসে বসলুম। ঝকঝকে বিদেশী গাড়ি। স্টার্ট দিয়ে বলল: অ্যাম্বাসাডারে আজ আমরা লাঞ্চ খাব।

অ্যাম্বাসাডার নিশ্চয়ই তাজমহলের মতো বড় হোটেল। কিন্তু স্বাতির দিকে তাকিয়ে সে কথা বলবার সাহস আমার হল না।

৩৫

জো রায় আমাদের স্টেশনে টেনে আনল। বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে মামা মামী রিটায়ারিং রুমেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দুজনকে দুদিকে নিয়ে বীরের মতো জো রায় মঞ্চে এল। বলল : দেখলেন তো!

গভীর মনোযোগে মামা পাইপ টানছিলেন, বললেন : দেখলুম বই কি!

প্রশংসা করলেন না উপহাস করলেন, তা বোঝা গেল না। জো রায় কিন্তু খুশী হয়ে বলল : জো রায়ের চোখে লুকনো যায়, এমন জায়গা বোম্বাই শহরে নেই।

আমি হেসে বললুম : কোথাও আছে কি?

কিন্তু বলেই দেখলুম যে স্বাতির চোখে বিরক্তি উঠেছে ফুটে। তাই আর কথা বলবার সাহস পেলুম না।

স্বাতি বসে পড়ল মামার পাশে। আর তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু খেয়েছ তোমরা?

স্বাতি বলল : হ্যাঁ।

কিন্তু মামী বললেন : ছাই খেয়েছে।

মামা সস্নেহে বললেন : ওপরে গিয়ে কিছু খেয়ে এস।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে সত্যিই আমরা খেয়েছি। কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেলুম। স্বাতি বলল : এস গোপালদা।

মামীর অসন্তোষ উপেক্ষা করেই সে দরজার দিকে এগোল। আর তার সাহস দেখে বিস্ময়ের আমার অন্ত রইল না। জো রায়ের

দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। স্বাতি তাকে ডাকল না। নিজে থেকে এগিয়ে যাওয়াও চলে না। ঠিক এই মুহূর্তে মামী তাকে উদ্ধার করলেন, বললেন: চল, আমরাও কিছু খেয়ে আসি।

ট্রেনের সেই অপমানের কথা জো রায় ভুলে গেছে কিনা জানি না, বলল: আমি তো ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি!

কিন্তু বড় বড় পা ফেলে স্বাতির পাশে এসে পৌঁছতেও বিলম্ব করল না। আমি পিছিয়ে এলুম মামীর কাছে। মামী বললেন: এমন করে তোমরা বেরিয়ে গেলে—

বললুম: খুবই অন্যায় হয়েছে।

নতুন জায়গায়—

বললুম না যে নূতনকে আমরা ভয় পাই নে, ভয় পাই পুরাতনকে।

লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে জো রায় স্বাতিকে বলল: আপনি বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস!

স্বাতি বলল: গোপালদার মতো নই।

তাই নাকি!

স্বাতি বলল: আজ এখানে, কাল শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই না গোপালদা?

বলে আমার দিকে ফিরে তাকাল।

আমার মনে হল যে স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে।

একটু আগে আমারও এই কথা মনে হয়েছে। আমি ফিরে গেলে মামী নিশ্চিন্ত হবেন, খুশী হবে জো রায়। কিন্তু স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। এইবারে বলে ফেললুম: ভাবছি—

স্বাতি বলল: আজই ফিরবে?

আমি চমকে উঠলুম। বুকের ভিতরটায় একটা বেদনা মুচড়ে

উঠল। কিন্তু কেন এমন হল, সে কথা ভেবে দেখবার আগেই বললুম : আজই।

জো রায় আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু মামী কথা কইলেন শান্ত ভাবে, বললেন : তোমার ছুটি বুঝি ফুরোল ?

ছুটি আমার অনেক দিন আগেই ফুরিয়েছে। ছুটির কথা কোন দিন আমি ভাবি নি। আজও সে কথা মনে হয় নি। তবু বললুম : আর দেরি করলে চাকরিটা যাবে।

জো রায় বলল : চাকরির আর চিন্তা কী! আমার চাকরি রোজ যাচ্ছে, রোজ হচ্ছে।

মামী বললেন : কী রকম ?

এই ধরুন না সেবারের কথা। কয়েক দিন ডুব মেরেছিলুম, ফিরে আসতেই হুকুম পেলুম এক গুদাম পাহারা দিতে হবে। নতুন পোস্ট। একটা দারোয়ানের বদলে একজন সিনিয়ার কভেনেন্টেড অফিসার বসবে। আপনিই বলুন, এ অপমান সহ্য করা যায়! তখনি চাকরি ছেড়ে দিলুম।

মামী বললেন : কী সর্বনাশ!

জো রায় সোৎসাহে বলল : সর্বনাশ কিছুই নয়। দু-চার দিনের চেষ্টাতেই এই নতুন চাকরিটা পেয়ে গেলুম।

চা খেয়ে আমরা শহর দেখতে বেরোলুম। দেখলুম অনেক কিছু। কিন্তু সমস্ত দেখা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কোন কড়া নেশায় বুদ্ধি আমার বুঁদ হয়ে আছে। দেখেও যেন দেখছি না, শুনেও যেন ভুলে যাচ্ছি।

পিছন থেকে স্বাতি বলল : গোপালদা কি ঘুমোচ্ছ ?

গাড়ি চালাতে চালাতে জো রায় বলে উঠল : আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মামী বললেন : গোপাল আজ চলে যাচ্ছে। অনেক দিন আমরা এক সঙ্গে ছিলুম।

মামা কোন কথা কইলেন না, শুধু বললেন : হুঁ।

দিল্লীর রাণা ব্যানার্জির মতো জো রায় আমাদের সব দেখাচ্ছিল। কতক আমাদের দেখা জায়গা, কতক দেখা হয় নি। জো রায় বলতে লাগল : এই হল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, আর এই বাড়িটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসন।

তারপর একে একে জেনারেল পোস্ট অফিস, কতকগুলো ডক, ব্যালার্ড এস্টেট, গভর্নমেন্ট মিণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া দেখাল। দেখাল এলফিনস্টোন সার্কল, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি। বাহিরে তার সোপানের শ্রেণী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই, আর ভিতরে যে একটা জাদুঘর আছে, আর বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি চ্যান্ট্রির তৈরি কতগুলো মূর্তি, অনেকেই তা জানে না।

বম্বের প্রাণকেন্দ্র হল ফ্লোরা ফাউণ্টেন। তিনটি বড় রাস্তা এসে এখানে মিলেছে—মহাত্মা গান্ধী রোড, হর্নবি রোড আর চার্চ গেট স্ট্রীট। এই সব রাস্তার নাম পাল্টে গেছে। হর্নবি রোডের নাম হয়েছে দাদাভাই নওরোজি রোড, আর বীর নরিম্যান রোড নাম হয়েছে চার্চ গেট স্ট্রীটের। মেরিন ড্রাইভের নাম হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড।

বম্বের সেক্রেটারিয়েট হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় সবই এর কাছাকাছি। এ দিকের সৌধগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন হাইকোর্ট, তার মাথায় জাস্টিস ও মার্সির দুটি স্ট্যাচু। ভিনিসিয়ান গথিক শৈলীতে তৈরি উনবিংশ শতাব্দীতে। পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ঠিক একই শৈলীতে তৈরি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গথিক শৈলীর সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর ফরাসী শৈলী কিছু মিলেছে। প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়াম ইণ্ডো সেরাসেনিক শৈলীতে তৈরি। তার মাথার উপরে যে বিরাট গম্বুজ, সেটি একটি পঞ্চদশ শতাব্দী

পশ্চিম ভারতীয় শৈলীর নমুনা। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া একজন ইংরেজ স্থপতি তৈরি করেছেন গুজরাটী শৈলী অবলম্বন করে।

জো রায় এইখানে এসে গাড়ি থামাল। টেনে নিয়ে গেল সমুদ্রের ধারে।

ইণ্ডিয়া গেটের ওধারে তাজমহল হোটেলটি আমি দেখতে পেলুম। বিরাট বাড়ি, বৃহৎ ব্যাপার। কেন জানি না, এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আমার একটা অদ্ভুত ভাবনা এল। মনে হল যে মামা মামী অনায়াসেই এই হোটেলে উঠতে পারেন, ইচ্ছা করলে জো রায়ও পারে। কিন্তু আমি পারি না। আমার সমাজের গণ্ডি টানা আছে, তার বাহিরে বেরোবার অধিকার আমার নেই। এই গণ্ডি ভাঙবার জন্যে শক্তি চাই, সাহসও চাই। কিন্তু একজনকে শক্তি সঞ্চয় করতে দেখলে অন্য শক্তি এসে টুঁটি চেপে ধরে, কিংবা লোভ দেখায়। সেই লোভে হয় পদস্খলন।

আমি দূরে সরে গিয়েছিলুম। স্বাতি কাছে এসে বলল: এমন ভাবনা তুমি কবে থেকে ভাবছ?

চমকে উঠলুম আমি। কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল: সাহসের অভাব?

বললুম: সাহসের অভাব নয়, অপ্রিয় সত্য বলার নিষেধ আছে শাস্ত্রে।

তবু শুনি।

বললুম: রথ চলে রাজপথ দিয়ে, তার ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক মুখর হয়। যে মাটির বুকে তার দাগ কেটে পড়ে, তার কান্না কি কেউ শুনতে পায়! পায় না। এ যুগের সভ্যতার রথ মানুষের বুকের উপর দিয়ে চলেছে।

স্বাতি বলল: আর একটু বুঝিয়ে বল।

বললুম: এই দেশের কথাই মনে কর। ঋচীক মুনি মহারাজ গাধীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, আপনার কন্যা সত্যবতীকে

আমি বিবাহ করব। গাধী ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজা, ঋচীক একজন সামান্য তপস্বী ব্রাহ্মণ। সেদিন কোন বর্ণের প্রশ্ন ওঠে নি, ওঠে নি অর্থের প্রশ্ন। আবাল্য প্রাচুর্যে পালিতা যুবতী রাজকন্যা এল এক ঋষির অরণ্য-আশ্রমে পরিচর্যার ভার নিয়ে। এমনি করেই লোপামুদ্রা এসেছিল অগস্ত্যের আশ্রমে। আরও অনেকে এসেছিল, এ দেশের বিস্মৃত ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ আছে, কিন্তু আজ ?

গভীর দৃষ্টিতে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর সাহস পেয়ে আমি বললুম : এ যুগের রাজকন্যা এসে ঐ তাজমহল হোটেলে উঠবে, আর ঋষিকে গলা ধাক্কা দেবে হোটেলের দারোয়ান।

স্বাতি বলল : দোষ কি ঋষির, না রাজকন্যার ?

দুজনের কারও দোষ নয়, দোষ সভ্যতার। সভ্যতার মানদণ্ডে আজ আধ্যাত্মিক চেতনার ওজন নেই। ওজন শুধু আর্থিক কৌলিন্যের। জো রায় এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : কী কথা হচ্ছে আপনাদের ?

স্বাতি বোধহয় এই প্রশ্নকে অভদ্র মনে করে বিরক্ত হল। কিন্তু আমি তৎপর ভাবে উত্তর দিলুম : বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে লোকে আজকাল ভানুমতীর খেল বলছে কেন বলতে পারেন ?

জো রায় হকচকিয়ে গেল খানিকটা, তারপরেই বলল : সত্যি যদি ভানুমতীর খেলা দেখতে চান তো চলুন ঐ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ মিউজিয়ামে। শিল্প প্রাকৃতিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বিভাগগুলি নাকি দেখবার মতো।

আপনি দেখেন নি ?

আমি! আমার সময় বড় কম। তবে তার পাশে আর্ট গ্যালারিতে এক্সজিবিশন দেখতে গিয়েছি কয়েকবার।

গাড়ির দিকে চলতে চলতে বলল : এখানে আরও জাদুঘর

আছে। শহরের ঠিক মাঝখানে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্স্। প্রায় এক শো বছরের পুরনো বাগান। এই বাগানের ভিতর বম্বের চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর। একটা নয়, দুটো। ভিক্টোরিয়া আর অ্যালবার্ট মিউজিয়াম। দ্রষ্টব্য বেশির ভাগই শিল্প ও কৃষি বিষয়ের। এলিফেণ্টা কেভ থেকে আসা একটা পাথরের বিরাট হাতি আছে। আর ছেলে মেয়েরা মহানন্দে উটের পিঠে চড়ে বেড়ায়।

ভদ্রলোক এবারে আমাদের গাড়িতে তুলে দক্ষিণ দিকে চলল। কোলাবা কজওয়ে ধরে আমরা আফগান চার্চের দিকে গেলুম। এর শেষ মাথাটি সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। তার নাম কোলাবা পয়েণ্ট। সেখানে একটি মানমন্দির, লাইট হাউস আর গির্জা, তারই নাম আফগান চার্চ। এ নাম কেন হল জো রায় তা বলতে পারল না। আফগান যুদ্ধে নিহত ইংরেজ সৈন্যের স্মৃতির জন্যে এই নাম হয়েছিল।

কিন্তু গাড়িতে আজ কেউ কথা কইলেন না। নেপথ্যে একটা বেসুরো গান বাজছে। সে গানে কোন কথা নেই। শুধু একটা বেদনা গুমরে গুমরে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করছে।

ফেরার পথে আমরা ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম দেখলুম বাহির থেকে। তারপরে মালাবার হিল দেখতে পেলুম দূরে। স্বাতি এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করল: বম্বের পাহাড়ের নাম মালাবার হিল হল কেন? মালাবার তো কেরালায়!

জো রায় বলল: কঠিন প্রশ্ন, এ রকম প্রশ্ন কেউ করতে পারে না।

মামা বললেন: গোপাল উত্তর দিচ্ছ না যে!

নিতান্ত অনিচ্ছাতেই বললুম: পুরাকালে মালাবারের বণিকরা এখানে বাণিজ্য করতে আসত, ঘর বাড়ি করে তারা বসবাস করত ঐ এলাকায়। তাদের নামেই পাহাড়ের নাম হয়েছে মালাবার।

জো রায় হঠাৎ বলল: আপনি চলে না গেলে বেশ ভাল হত।

বম্বের আশেপাশে কয়েকটা দিন ঘোরা যেত। জুহু বীচ, পোয়াই আর টনসা লেক, বেসিন। বেসিনও একটা ঐতিহাসিক স্থান। আপনার ভাল লাগত।

বলে পিছনের দিকে চাইল।

আমি সাহস করে বললুম : তার জন্মে ভাবনা কী! সবাই তো রইলেন।

জো রায় খুব ভরসা পেল না। ভরসা পাবার কথা নয়। তার সঙ্গে স্বাতির ব্যবহার তো আমি দেখতে পাচ্ছি! আমার যেটুকু অপমান-বোধ আছে, সেটুকু নিয়েই আমি পিছিয়ে যেতুম, এমন নির্লজ্জের মতো বার বার এগিয়ে আসতুম না। জো রায়ের দুর্বলতা যে স্বাতি জেনে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জো রায় তা বুঝছে না কেন! বলল : তা বটে।

পরক্ষণেই আমার মনে পড়ল, স্বাতি আমাকেও তাড়িয়ে দিচ্ছে। সোমনাথে যাবার পথে জো রায়কে যেমন করে নেমে যেতে বলেছিল, কতকটা তেমনি করেই আজ আমাকে ফিরে যেতে বলেছে। জো রায় বুঝতে না পেরে গাড়ি থেকে নামতে দেরি করেছিল, আমি তার ইঙ্গিতটাই ধরতে পেরে নিজেই ফিরে যাবার প্রস্তাব করতে পেরেছি। মামা মামীর কাছে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু স্বাতির কাছে?

স্বাতি আমাকে মূর্খ ভাববার অবকাশ পায় নি। কিন্তু বুদ্ধিমান ভাবতেও পেরেছে কি? এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে পুরুষের অহংকার করবার যদি কিছু থাকে তো সে তার বুদ্ধি। অর্থ নয়, সামর্থ্য নয়, চরিত্রবলও বুঝি নয়। বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত লুকনো যায়। কিন্তু বুদ্ধির অভাব লুকনো যায় না কিছু দিয়ে। পুরুষের বুদ্ধিই তার শক্তি। পশুর শক্তি দেহে। পৃথিবী আজ যে শক্তির বড়াই করছে, তা পাশবিক। এর সঙ্গে বুদ্ধির যোগ না হলে তা ধ্বংস হবে।

জো রায় আজ একটা হোটেলে আমাদের খাওয়াবে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সেখানে নিয়ে এল। আমরা যদি জাদুঘর দেখতে নামতুম, কিংবা চিড়িয়াখানা দেখতে, তাহলে এখানে সময় মতো পৌঁছতুম না। মামীকে নিয়ে জো রায় এগিয়ে গেল। স্বাতি তাঁদের অনুসরণ করল। মামা পথের উপরে তাঁর পাইপ ঝেড়ে নিলেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। পাইপটা পকেটে পুরে মামা বললেন : কিছু বলবে ?

আজ্ঞে না।

তবে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

বলুন।

আর দুটো দিন কি তোমার থাকা চলে না ?

বুকের ভিতরে আমি একটা যন্ত্রণা বোধ করলুম। দুদিন কেন, আমি চির দিন থাকতে পারি। কিন্তু স্বাতি যে আমায় চলে যেতে বলেছে। কোন্ সাহসে আমি তার আদেশ অমান্য করি ! বেদনার্ত কণ্ঠে বললুম : আমাকে ক্ষমা করুন।

একটা দিন ?

অনুরোধে মামার স্বর সিক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি হয়েছি নিষ্ঠুর। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন : কাল আমরাও তোমার সঙ্গে ফিরতে পারি।

আজ ?

তোমার মামীর কিছু কেনাকাটা ছিল। আর—

বাকিটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বাতি ফিরে এসেছিল। বলল : এস।

মামা আমার উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। আমার অন্তর তখন কাঁদছে।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে কলকাতার গাড়ি ছাড়ছে। ক্যালকাটা মেল ভায়া এলাহাবাদ। সোয়া সাতটায় ট্রেন ছাড়বে। স্বাতি নিজে গিয়ে টিকিট কেটে এনেছিল।

মামা বললেন: ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছ তো?

স্বাতি বলল: না, গোপালদাকে আর শাস্তি দিতে চাই নে।

বলে আমাকে একটা থার্ড ক্লাসে তুলে দিল। একটুখানি জায়গা সংগ্রহ করে আমি আবার নিচে নেমে এলুম।

মামা মামী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আমি তাঁদের প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে গাড়ির দরজার কাছে চলে এল, তারপর প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি দূরে সরে গেলুম, আর মুখ তুলে স্বাতি হাসল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গেল। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে, গার্ডের বাঁশি বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও আমি শুনতে পেলুম: নিজের ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জানো না গোপালদা, তাই এমন ভয় পাও। তোমার সম্পত্তি কি কেনা হয়ে যায় নি!

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। হাতল ধরে আমি উঠে পড়লুম। তারপরে ফিরে দেখলুম স্বাতিকে। তার দু চোখের দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়েছে। নিশ্চয়ই আমি তার কথা ভুল শুনি নি। আমার অতীত আর বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চাইল।

কিন্তু আর আমার কোন ভয় নেই। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতি যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াক। তার মন নিশ্চয়ই আমার মনে বাঁধা পড়ে গেছে। জগতের সেরা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। হোক কথা, হোক কল্পনা, জীবনের চেয়ে স্বপ্নেই যে সুখ বেশি। সে সুখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে দিলুম।

কোঙ্কণ পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্ম ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্যে লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এ গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গল-গিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর কেরল পর্বে তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাংচুয়ারি। যমজ শহর এর্নকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটের সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে কালিন্দী পর্বে। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন

মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক স্বাতি তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ্ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও

পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কথা এবং এই সব স্বল্পপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দু বেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে: ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব ··

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভূটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল। এই প্রসঙ্গেই সমগ্র হিমালয়ের কথা বিবৃত হয়েছে।

তারপর?

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের পর যেমন খিলপর্ব হরিবংশ, তেমনি রম্যাণি বীক্ষ্যর উনবিংশ পর্ব **মরুভারত**। ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপর আরব সাগরের তীরে মরু রাজ্য কচ্ছের প্রধান শহর ভূজে উদ্বাস্তু সিন্ধীরা নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। গান্ধীধাম, পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য ফেঁপে উঠছে কান্দ্‌লা বন্দরে। মরুভারত পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক